মায়াময় মেঘালয়

(গারো পাহাড় পর্ব)

শঙ্কু মহারাজ

পরিবেশক

নাথ ব্রাদার্স ॥ ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ॥ কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম (নাথ) সংস্করণ
আষাঢ় ১৩৬৬

প্রকাশক
সমীরকুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং
২৬ বি পণ্ডিতিয়া প্লেস
কলকাতা ৭০০০২৯
মুদ্রক
সনাতন হাজরা
প্রভাবতী প্রেস
৬৭ শিশির ভাদুড়ী সরণী
কলকাতা ৭০০০০৬
প্রচ্ছদশিল্পী
গৌতম রায়

কুড়ি টাকা

আমার কাকা

শ্রীহৃষীকেশ ঘোষ দস্তিদার-কে

লেখকের কয়েকখানি জনপ্রিয় ভ্রমণকাহিনী

মায়াময় মেঘালয় (খাসি পাহাড় পর্ব)

যদি গৌর না হ'ত

সুন্দরের অভিসারে

অমরাবতী আসাম

চিত্রকূট

লাদাখের পথে

অমরতীর্থ অমরনাথ

কুম্ভমেলায়

পঞ্চবটী

হিমালয় (অমনিবাস, প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব)

মধু-বৃন্দাবনে, (ব্রজ, বন ও মহাবন পর্ব)

পঞ্চ-প্রয়াগ

লীলাভূমি-লাহুল

গঙ্গা-যমুনার দেশে

সোনা সুরা ও সাকী

গঙ্গাসাগর

তমসার তীরে তীরে

রাজভূমি-রাজস্থান

ও

মন-দ্বারকায়

সংসারে সবচেয়ে বড় কাম্য কি? অর্থ বিদ্যা খ্যাতি কিম্বা ভালবাসা?

আমি উত্তর দেব—ভালোবাসা। ভালোবাসার ভিখারী আমি। আর আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করেন, ভারতের কোথায় আমি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা পেয়েছি? দ্বিধাহীন চিত্তে জবাব দেব, আসাম ও মেঘালয়ে—আমার 'অমরাবতী আসাম' ও 'মায়াময় মেঘালয়ে'।

'বঙাল খেদা' বা 'বিদেশী বিতাড়ন' আন্দোলনের কথা মনে রেখেও আমি বলছি, আসাম ও মেঘালয়ের মানুষ ভালোবাসেন আমাকে, ভালোবাসেন বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যকে।

তাঁদের কেউ যে মাঝে মাঝে সংকীর্ণতার শিকার হন, একথা মিথ্যে নয় কিন্তু সেই সঙ্গে মিথ্যে নয় প্রগতি ও শোভনা। এবং শেষের এই সত্যটি শেষ পর্যন্ত শাশ্বত-সত্য রূপে স্বীকৃত হবে।

আমি জানি মুষ্টিমেয় স্বার্থপরদের অপচেষ্টা কখনও সফল হয় না। ভারতের অমর আত্মা এবং অক্ষয় সংস্কৃতির শুভপ্রভাবে আঞ্চলিকতার অবসান ঘটবে, প্রেমের অমৃতধারায় নিভে যাবে হিংসার আগুন। আমি যে বাংলার গঙ্গাসাগর আর গুজরাতের বেট-দ্বারকায় দাঁড়িয়ে একই স্নানার্থীকে দেখেছি। গোয়ার ব্যাসিলিকা (গীর্জা) ও কাশ্মীরের হজরাতবাল মসজিদে একই পুণ্যার্থীকে দেখেছি। আসামের কামাখ্যা মন্দিরে, বিহারের পরেশনাথ শিখরে, অমৃতসর স্বর্ণমন্দিরে আর লাদাখের হেমিস গুম্ফায় দাঁড়িয়ে বারবার আমার ঐক্যবদ্ধ ভারতের কথাই মনে হয়েছে। মনে হয়েছে আমরা হিন্দু নই মুসলমান নই শিখ নই, আমরা বাঙালী নই অসমীয়া নই খাসিয়া কিম্বা গারো নই, আমি আটায়ে ভারতীয়—আমরা সবাই ভারতীয়।

যাক্ গে, যেকথা ভাবছিলাম। আসাম আর মেঘালয়ের মানুষ ভালোবাসেন আমাকে। তাই আজ আমি আবার আসামে এসেছি, চলেছি মেঘালয়ে—গারো পাহাড়ে। তবে এবারে জোড়হাট নয় গোয়ালপাড়া, শিলং নয় তুরা। তার মানে বিমানপথে যাত্রা করিনি, রেলযোগে রওনা হয়েছি। এবং আমি একা নই, পুত্র গৌতম আমার সঙ্গে চলেছে।

এর আগে গৌতম আর এদিকে আসে নি, ফলে আমাকে থামতে থামতে পথ চলতে হচ্ছে। প্রথম থেমেছি শিলিগুড়ি। ওর মামা অমলের কোয়ার্টারে

একদিন থেকে চলে গিয়েছি দার্জিলিং। সেখানে 'হোটেল কুণ্ডুস'-এ দিন চারেক বহাল তবিয়তে কাটিয়ে নেমেএসেছি জলপাইগুড়ি। উঠেছি বয়োকনিষ্ঠ ডাক্তার আশিস আচার্যের বাড়িতে। আশিস এখন মালদহে পোস্টেড, কিন্তু তার মা-বাবা ভাই-বোন ও দিদি অনিতা আমাদের বুঝতে দেয় নি তার অনুপস্থিতি। অনিতা আমাকে নিয়ে গিয়েছে প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত চারুচন্দ্র সান্যালের কাছে। চারুবাবু বৃত্তিতে ডাক্তার, তিনি জলপাইগুড়ির মানুষ। সুদীর্ঘকাল ধরে তিনি জলপাইগুড়ি-কুচবিহার অঞ্চলের রাজবংশী সম্প্রদায়ের ভাষা ধর্ম লোকাচার লোকবিশ্বাস ও জীবনযাত্রা প্রণালী সম্পর্কে নিবিড় অনুসন্ধান ও তথ্য সমীক্ষা করেছেন এবং তাদের লোকজীবন প্রণালী বিষয়ে বিস্ময়কর গবেষণা করেছেন। তাঁর এই গবেষণা পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের সীমান্ত বসবাসকারী রাজবংশীদের প্রথম তথ্যসমৃদ্ধ ও আধুনিক নৃতত্ত্ববিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানসম্মত বিস্তৃত আলোচনা। এই আলোচনা শ্রীসান্যালকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি এনে দিয়েছে এবং এই গ্রন্থের জন্য তিনি রবীন্দ্র-পুরস্কার পেয়েছেন।

অনিতা আমাদের দেখিয়েছে জলপাইগুড়ির যাবতীয় দ্রষ্টব্য এবং খুঁজে বের করেছে আমার প্রফুল্লমামার বাড়ি। দেখা করেছি 'ডানপিটেদের আসর'-খ্যাত শিশুসাহিত্যিক ডাঃ সরোজিৎ বাগচীর সঙ্গে।

গতকাল দুপুরে জলপাইগুড়ি থেকে কুচবিহারে এসেছি। একটা হোটেলে উঠেছি। বিকেলে আমার পাঠিকা-বোন পারুল মণ্ডল তার একটি বান্ধবী ও বন্ধু মুকুল হুদাকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে হাজির হয়েছে। গৌতমকে হোটেলে রেখে আমাকে যেতে হয়েছিল ওদের গাঁয়ে—দিনহাটা ছাড়িয়ে সাহেবগঞ্জে। গাঁয়ের মানুষের অজস্র ভালোবাসা কুড়িয়ে রাত দশটায় হোটেলে ফিরেছি।

আজ সকালে রাজবাড়ি ও মন্দির দেখেছি। তারপরে একটা ট্যাক্সি করে নিউ কুচবিহার রোড স্টেশনে এসেছি। ভাগ্যিস পারুল ও মুকুল স্টেশনে এসেছিল। কথাবার্তা বলে সময়টা কাটানো গেছে। নির্দিষ্ট সময়ের দু-ঘণ্টা পরে ট্রেন এসেছে। সেই একই ট্রেন—কামরূপ এক্সপ্রেস।

দু-ঘণ্টা স্টেশনে বসে থেকেও ভাত খেয়ে নিতে পারি নি। কারণ রঞ্জনবাবুকে লিখেছি, আমরা বঙাইগাঁও গিয়ে মধ্যাহ্নভোজন সারব। আর কেনই বা লিখব না, বেলা সাড়ে বারোটায় আমাদের নিউ বঙাইগাঁও পৌঁছবার কথা।

সাড়ে বারোটায় আমরা মোটে আলিপুর-দুয়ার পৌঁচেছি। এখন বেলা পৌনে দুটো। গাড়ি এইমাত্র ফকিরাগ্রামে পৌঁছল। তার মানে তিনটের

আগে আমরা নিউ বঙাইগাঁও পৌঁছব বলে মনে হচ্ছে না। তার মানে সোয়া শ' কিলোমিটার পথ যেতে আমাদের সোয়া পাঁচ ঘণ্টা সময় লাগছে। এবং আমরা এক্সপ্রেসের ভাড়া দিয়েছি। অতএব ভারতীয় রেল—জিন্দাবাদ।

বঙাইগাঁও পৌঁছতে এখনও কিছু দেরি আছে। সুতরাং সেকথা থাক। তার চেয়ে ফকিরাগ্রামের কথা হোক। ফকিরাগ্রাম একটি জংসন স্টেশন। ধুবড়ি যেতে হলে এখানে গাড়ি বদল করতে হয়। ধুবড়িতে ব্রহ্মপুত্র পেরিয়ে বাসে তুরা যাওয়া যায়। এবং সেটাই নাকি কলকাতা থেকে তুরা যাবার সবচেয়ে সহজ পথ। আমরা যাচ্ছি গোয়ালপাড়া হয়ে।

কিন্তু আমাদের কথা পরে হবে, এখন ফকিরাগ্রাম-ধুবড়ি রেলপথের কথা বলে নিই। এই রেলপথের ওপরে এখান থেকে মাত্র মাইল পাঁচেক দূরে সাপটগ্রাম নামে একটি প্রাচীন জনপদ রয়েছে। সেখান থেকে 'Assam Observer' ও 'North Eastern Herald' নামে দুটি ইংরেজী পাক্ষিক ও ত্রয়োমাসিক পত্রিকা এবং 'হক কথা' নামে একটি অসমীয়া বাংলা ত্রয়োমাসিক প্রকাশিত হয়। পত্রিকা তিনটির সম্পাদকের নাম নারায়ণ রায়। ভদ্রলোক মাঝে মাঝে আমাকে তাঁর পত্রিকা পাঠান। ফলে আমি এ অঞ্চলের কিছু খবরাখবর পেয়ে থাকি।

আরও একটি কারণে সাপটগ্রাম সুবিখ্যাত। সাপটগ্রাম সাধক নীলানন্দ ঠাকুরের বাল্যলীলা নিকেতন। নীলানন্দ পাগলাবাবা বলে বেশি পরিচিত। তাঁর মঠ ও মন্দির বর্তমান বৃন্দাবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। তাঁর আশীর্বাদ লাভের সুদুর্লভ সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তাই আমার বার বার সাপটগ্রামের কথা মনে পড়ছে।

এই রেলপথে ধুবড়ির মাইল পাঁচেক আগে গৌরীপুর। প্রখ্যাত পরিচালক ও অভিনেতা কুমার প্রমথেশ বড়ুয়ার জন্মভূমি। গৌরীপুরের পূর্বনাম রাঙামাটি। রাঙামাটির জমিদাররা বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক। কুমার প্রমথেশের পিতা রাজা প্রভাতকুমার অতিশয় সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। প্রমথেশের ছোট ভাই প্রকৃতিশের প্রধান পরিচয় তিনি খুব বড় শিকারী। হাতি শিকারের জন্য তিনি উত্তর-পূর্ব ভারতে বিশেষ খ্যাতিমান। তিনি বিধানসভার সদস্য ছিলেন। কিন্তু সাহিত্য সংস্কৃতির প্রতি তাঁর আগ্রহ কিছু কম নয়। ভূপেন হাজারিকার 'মাহুত বন্ধু রে!' ছবির তিনি প্রধান উদ্যোক্তা।

"কোকরাঝাড়!"

গৌতমের কথায় গৌরীপুরের ভাবনা থেমে যায়। তাড়াতাড়ি তাকিয়ে

দেখি, সে ঠিকই বলেছে। কোকরাঝাড় এসে গিয়েছে। জায়গাটি আমার চেনা। প্রমথর পীড়াপীড়িতে গত বছর জোড়হাট যাবার পথে আমাকে নামতে হয়েছিল এখানে। তারপরে সে এক অবিশ্বাস্য কাণ্ড। শতাধিক ছেলে-মেয়ে ও নারী-পুরুষ আমাকে স্বাগত জানিয়েছিল ব্যাণ্ড বাজিয়ে ও মালা দিয়ে। তারা শোভাযাত্রা সহকারে আমাকে নিয়ে গিয়েছে প্রমথর বাড়িতে। বিকেলে স্থানীয় স্কুলে সংবর্ধনা জানিয়েছে—মানপত্র ও অন্যান্য উপহার দিয়েছে।

আজও প্রমথ স্টেশনে এসেছে, তবে ব্যাণ্ডপার্টি সঙ্গে নিয়ে আসে নি। অধ্যাপক সুবোধ বাগচী কেবল তার সঙ্গে এসেছেন। সুবোধবাবু শুধু সাহিত্য-সুরসিক নন, তিনি নিজেও একজন সুলেখক। প্রমথ অ্যাড্ভোকেট, তার পুরো নাম প্রমথচন্দ্র ভাওয়াল।

কোকরাঝাড় গোয়ালপাড়া জেলার একটি মহকুমা সদর। বেশ বর্ধিষ্ণু জায়গা। নূতন শহর তবু অধিকাংশ পথ অপ্রশস্ত। কয়েক বছর আগে একটি রেলওয়ে ওভারব্রিজ নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছিল। কিন্তু কোন কারণে কাজটি বন্ধ হয়ে যায়। গতবছর যে অবস্থায় দেখে গিয়েছি, এখনও সেই অবস্থাতেই রয়েছে। অথচ কোকরাঝাড়ের উন্নয়নে এই ওভারব্রিজ অপরিহার্য।

গাড়ি চলতে শুরু করেছে, আমরা তাড়াতাড়ি উঠে পড়ি গাড়িতে। হাত নেড়ে নিজেদের জায়গায় এসে বসি। যাত্রার যতি আসন্ন। পরের স্টেশনই নিউবঙাইগাঁও।

গাড়ি আড়াই ঘণ্টা লেট। প্রমথদের প্রায় তিন ঘণ্টা স্টেশনে অপেক্ষা করতে হয়েছে। ওরাও না খেয়ে বসেছিল এতক্ষণ। কিন্তু ওদের জন্য আমি তেমন ভাবছি না। কারণ ওরা আমার সুপরিচিত। খারাপ লাগছে রঞ্জনবাবুর কথা ভেবে। গোয়ালপাড়ার এস. ডি. ও. শ্রীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। আই. এ. এস. অফিসার, ওঁদের সকাল থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত প্রাণপাত পরিশ্রম করতে হয়। তাঁর পক্ষে কারও জন্য তিন ঘণ্টা রেলস্টেশনে অপেক্ষা করা··· !

রঞ্জনবাবুকে আমি এখনও দেখি নি। তাঁর বয়স কত, তাও জানি না। আসাম সরকারের অর্থসচিব শ্রীদিলীপকুমার গঙ্গোপাধ্যায় আমার অকৃত্রিম সুহৃদ। তাঁকে লিখেছিলাম—একবার গারো পাহাড়ে যেতে চাই। কিভাবে ও কোন পথে যাওয়া উচিত হবে···ইত্যাদি।

উত্তরে দিলীপবাবু লিখলেন, 'কলকাতা থেকে ট্রেনে এলে গারো পাহাড়ের পথ গোয়ালপাড়া হয়ে। আপনাকে বঙাই (বন+গাই=Wild Cattle)

গাঁও-য়ে নামতে হবে। বঙাইগাঁও থেকে মোটরে যোগীঘোপা, তারপরে ফেরীতে ব্রহ্মপুত্র পেরিয়ে পঞ্চরত্ন, সেখান থেকে গোয়ালপাড়া হয়ে তুরা—গারো পাহাড়ের প্রাণকেন্দ্র।

'এককালে আমি গোয়ালপাড়ার এস· ডি· ও· ছিলাম। গোয়ালপাড়ার বর্তমান এস· ডি· ও· শ্রীমান রঞ্জন চট্টোপাধ্যায় জোড়হাটে আমার সহকারী ছিল। আপনার সঙ্গে সেবারে তার পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় নি কিন্তু সে আমার অনুজপ্রতিম। সে আপনাকে নিউবঙাইগাঁও স্টেশনে অভ্যর্থনা জানাবে।

'গোয়ালপাড়া ও তুরায় সার্কিট হাউস রয়েছে। আপনার কোন অসুবিধে হবে না। প্রোগ্রাম জানালেই সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।…'

রেলের টিকেট কেটে দিলীপবাবুকে ভ্রমণসূচী জানিয়ে দেবার পরেই রঞ্জনবাবুর চিঠি এসেছে—

"…This letter is just to reassure you that for these small things you need not have any anxieties at all. You can be rest assured that there shall be no difficulty at all regarding the whole trip.…

I am eagerly looking forward to meet you at new Bongaigaon station. To facilitate identification, I shall plant myself near the tea-stall on the platform…"

সুতরাং মহকুমা শাসক সাড়ে বারোটা থেকে সেই চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ভাবতেও খারাপ লাগছে! অথচ আমি কীই বা করতে পারি? যাত্রীর ইচ্ছেয় রেল চলে না।

শেষ পর্যন্ত বেলা ঠিক তিনটের সময় হাওড়ার কামরূপ এক্সপ্রেস নিউ বঙাইগাঁও স্টেশনে যাত্রা শেষ করল। এখানেই ব্রডগেজ লাইন শেষ হয়ে গেল। যাঁরা এর পরে যাবেন, তাঁরা এখান থেকে মিটার গেজ গাড়িতে সওয়ার হবেন। অতএব তাঁদের আগে নামার সুযোগ দিতে হল।

প্লাটফর্ম লোকে লোকারণ্য। কোনদিকে যাবো, কোথায় সেই চায়ের দোকান?

গৌতম বলে, "ওভারব্রিজের দিকে চলো, টি-স্টল ওখানেই হওয়া উচিত।"

তাই চলি এবং একটু বাদেই বুঝতে পারি, ওর অনুমান মিথ্যে নয়। ওভারব্রিজের সিঁড়ির সামনেই চায়ের দোকান। তাড়াতাড়ি পা চালাই।

সহসা গৌতম বলে ওঠে, "আমাদের সঙ্গে এই ট্রেনে নিশ্চয়ই কোন মন্ত্রী অথবা নেতা এলেন।"

"কেমন করে বুঝলি ?"

"ঐ দেখচ না, স্কুলের ছেলে-মেয়েরা উনিফর্ম পরে মালা হাতে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে ···।"

সে ঠিকই দেখেছে। তবে শুধু ছেলে-মেয়েরা নয়, কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিও রয়েছেন মনে হচ্ছে। সাধারণতঃ মন্ত্রী অথবা নেতা এলেই আজকাল এমন অভ্যর্থনার আয়োজন করা হয়।

বিপদে পড়া গেল। মন্ত্রী এলে তো রঞ্জনবাবু আমার দিকে নজর দিতে পারবেন না। তিনি যে এখানকার এস. ডি. ও. তাছাড়া এত মানুষের মধ্যে তাঁকে কেমন করে চিনে নেবো ? নিরুৎসাহিত পদক্ষেপে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলি।

টি-স্টলের এক কোণে একাকী একজন যুবক দাঁড়িয়ে রয়েছেন। মাঝারী গড়ন, ফর্সা ও সুন্দর। বয়স বছর পঁচিশ, ভারী স্মার্ট চেহারা। পরনে প্যাণ্ট ও বুশ সার্ট। এটাই আই. এ. এস. অফিসারদের প্রিয় পোশাক।

ইনি রঞ্জনবাবু হতে পারেন। কিন্তু মন্ত্রীরা এলে তো ওঁরা সাধারণতঃ কোট-টাই ইত্যাদি পরে থাকেন। তাছাড়া তিনি একা-একাই বা দাঁড়িয়ে থাকবেন কেন ?

তবু তাঁরই দিকে এগিয়ে চলি। ভদ্রলোকও আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন। তিনি এগিযে আসছেন। তাহলে কি আমার অনুমান মিথ্যে নয় ?

সামনে এসেই ভদ্রলোক দুহাত জড়ো করে আমাকে নমস্কার করেন। আমি প্রতি-নমস্কার করি। তারপরে কিছু বুঝে উঠতে পারার আগেই আমার হাত থেকে কিটব্যাগটা প্রায় ছিনিয়ে নেন। আমি অসহায় দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকাই। তিনি সহাস্যে বলেন, "চলুন। খুব কষ্ট পেয়েছেন, গাড়ি আড়াই ঘণ্টা লেট।"

এই কথাটি তো আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করব ভেবেছিলাম। না, আর সে সুযোগ পাওয়া গেল না। বরং উত্তর দিতে হয়, "না, না। কষ্টের কি আছে ?"

ভিড়ের ভেতর থেকে কয়েকজন ছুটে আসেন। তাঁদের দুজন রঞ্জনবাবুর

হাত থেকে কিট্‌ব্যাগ ও গৌতমের কাছ থেকে স্যুটকেশ নিয়ে নেন।

রঞ্জনবাবু সেই ছাত্র-ছাত্রীদের দিকে ইসারা করে বলেন, "চলুন!"

আমি তাকে অনুসরণ করি। কিন্তু ভাবি—ওদিকে যাচ্ছি কেন? আবার মন্ত্রীমহাশয়ের সঙ্গে আলাপ করতে হবে নাকি!

কথাটা জিজ্ঞেস করি রঞ্জনবাবুকে। তিনি হেসে দেন। তারপরে পাশের ভদ্রলোককে দেখিয়ে বলেন, "ইনি উদয়বাবু, উদয়শঙ্কর দাসচৌধুরী, এখানকার রেলওয়ে হাইস্কুলের হেডমাস্টার।..."

হেডমাস্টারমশায় নমস্কার করেন আমাকে। আমিও প্রতি-নমস্কার করি।

রঞ্জনবাবু বলতে থাকেন, "সেদিন কথায় কথায় ওঁকে বলেছিলাম আপনার আসার কথা। ওঁরই স্কুলের ছেলে-মেয়েরা শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা ও শহরের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি আপনাকে 'রিসিভ' করতে এসেছেন।"

হায় হরি! কোথায় মহামান্য মন্ত্রী আর কোথায় অধম আমি। আমার জন্যই এই মন্ত্রীমার্কা সংবর্ধনা!

তাহলেও বিস্মিত হব না। আমি যে আসামে এসেছি। আসাম আমাকে ভালোবাসে।

আমি অযোগ্য, তবু ধীর পায়ে এগিয়ে আসি সেই জনসমাবেশের মাঝে। মেয়েরা শাঁখ বাজায়, পুষ্পবৃষ্টি করে। ছাত্র-ছাত্রীরা মালায় মালায় ঢেকে ফেলে আমাকে। হে ঈশ্বর, তুমি পরম করুণাময়! তুমি আমাকে এমন অনাবিল ভালোবাসার অধিকারী করলে। তোমাকে প্রণাম।

ফুল ও মালার পালা শেষ হবার পরে সবার সঙ্গে বেরিয়ে আসি বাইরে। একটি ট্রাক, একখানি জীপ ও একখানা অ্যাম্বাসাডার দাঁড়িয়ে রয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীরা ট্রাকে চড়তে শুরু করে। রঞ্জনবাবু বলেন, "আমি গৌতমকে নিয়ে জীপে আসছি, আপনি উদয়বাবুর সঙ্গে আমার গাড়িতে আসুন।"

তিনি অ্যামবাসাডারের দরজা খুলে দেন। আমি গাড়িতে উঠি।

কে কোন গাড়িতে আসবেন, তাই নিয়ে একটু আলোচনা হয়। তারপরে উদয়বাবু ও আরেকজন ভদ্রলোক আমার পাশে এসে বসেন। আর সামনে ওঠে দুটি মেয়ে। গাড়ি এগিয়ে চলে।

কেটে যায় কয়েকটা মিনিট। তারপরে উদয়বাবু পাশের ভদ্রলোককে দেখিয়ে বলেন, "ইনি শ্রীঅম্বিকাচরণ সরকার, এখনকার নর্মাল স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল ও অসম সাহিত্যসভার স্থানীয় শাখার সভাপতি এবং সুলেখক।

অসমীয়া ও ইংরেজীতে বই রয়েছে।"

আমি নমস্কার করি। কিন্তু বলতে পারি না কিছু। তার আগেই সামনের সিট থেকে একটি মেয়ে বলে ওঠে, "শঙ্কুদা, আমি নীলিমা।"

নীলিমা! মেয়েটির দিকে তাকাই। বছর বাইশ বয়সের একটি শ্যামবর্ণা যুবতী। দোহারা চেহারা। কখনও দেখেছি বলে মনে হচ্ছে না।

"আমি আপনাকে চিঠি লিখেছিলাম, আপনি উত্তর দিয়েছিলেন।" সে যোগ করে।

মনে পড়ে আমার। মেয়েটির নাম নীলিমা দাস। 'অমরাবতী আসাম' পড়ে একখানি ভারী সুন্দর চিঠি লিখেছিল। হ্যাঁ, সে বঙাইগাঁও থাকে। বি· এ· পাস করে বি· টি· পড়ছে। কিন্তু সে আমার আসার খবর পেল কেমন করে?

"অবাক হলেন তো?" নীলিমার পাশে বসা মেয়েটি মৃদু হেসে প্রশ্ন করে। তার স্বাস্থ্য ভাল, দেখতে সুশ্রী। বয়সে বোধকরি নীলিমার চেয়ে কিছু ছোটই হবে। সে বলে চলে, "আমাদের এখানে তেমন কেউ বড় একটা আসেন না। তাই কেউ এলে আমরা ঠিক জানতে পারি।"

হয়তো হবে। তাই কোন প্রতিবাদ না করে নীলিমাকে বলি, "তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ায় খুব ভাল লাগছে।"

"আর আমি যে অফিস কামাই করে এখানে বসে আছি, তা বুঝি কিছু নয়?" পাশের মেয়েটি আমাকে অসুবিধেয় ফেলে।

তাড়াতাড়ি বলি, "তুমি আসাতেও খুশি হলাম। কিন্তু তোমার পরিচয় যে জানা হয় নি এখনও।"

নীলিমা বলে, "আমার ছোট বোন মিনতি। গোয়ালপাড়া এস· ডি ও· অফিসে চাকরি করে। সেখানেই থাকে। শনিবার বিকেলে বাড়ি এসে সোমবার সকালে গোয়ালপাড়া চলে যায়। আপনি আসছেন বলে আজ আর যায় নি।"

"কবে যাবে?"

"কাল দুপুরে, আপনাদের সঙ্গে।" মিনতি উত্তর দেয়।

একটু অবাক হই। বলি, "কিন্তু আমি তো আজই রঞ্জনবাবুর সঙ্গে গোয়ালপাড়া চলে যাবো।"

"তা কেমন করে?" মিনতি প্রতিবাদ করে। "আজ রাতে যে এখানে আমাদের স্কুলে আপনার সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়েছে!"

সে তার হেডমাস্টারমশায়ের দিকে তাকায়। আমিও উদয়বাবুর দিকে ফিরি।

তিনি তাড়াতাড়ি আমার একখানি হাত হাতে নিয়ে সবিনয়ে বলেন, "আমাদের এ অনুরোধটা আপনাকে রাখতেই হবে। সামান্য আয়োজন। আপনি আপত্তি করবেন না!"

দুই

আমাদের বঙাইগাঁও ডাকবাংলোয় পৌঁছে দিয়ে রঞ্জনবাবু বিদায় নিলেন। তাঁকে গোয়ালপাড়া ফিরে যেতে হচ্ছে। তিনি মহকুমা শাসক। তাঁর পক্ষে রাতে সদর ছেড়ে এখানে থাকা সম্ভব নয়। তাই তিনি আমার সংবর্ধনা সভায় উপস্থিত থাকতে পারলেন না। আগামীকাল সকালে তিনি আবার এখানে এসে আমাকে গোয়ালপাড়া নিয়ে যাবেন।

তখন স্টেশন থেকে আমরা গিয়েছিলাম বঙাইগাঁও রোলার ফ্লাওয়ার মিলস-এ। মিলের মালিক শ্রীপ্রেমনাথ হরলালকা আমাদের চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় ভোজন করিয়েছেন। তাতেও তাঁর আপসোসের অন্ত ছিল না। কারণ ওঁরা নিরামিষভোজী, মাছ-মাংস খাওয়াতে পারলেন না। শুধু তাই নয় প্রেমনাথবাবু আমাকে কারখানার গেস্ট হাউস-এ রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু উদয়বাবু সম্মত হন নি। কারণ তিনি আগেই ডাকবাংলো রিজার্ভ করে রেখেছেন। অতএব আমরা এখানে এসেছি।

রঞ্জনবাবুকে বিদায় দিয়ে ঘরে এসে বসি। মাঝারি ঘর, দুখানি ঘর নিয়ে ছোট ডাকবাংলো। সামনে বারান্দা ও একফালি সবুজ মাঠ। পেছনে বারান্দা বাথরুম ও রান্নাঘর।

ঘরে দুখানি খাট, টেব্‌ল চেয়ার ও আলনা। মেঝেতে দড়ির কার্পেট পাতা। এককথায় খারাপ নয়। কিন্তু বিপদ হল আমার সঙ্গে অনেক লোক। রয়েছেন উদয়বাবুর সহকর্মী নারায়ণ সরকার, মৃণাল চক্রবর্তী, হারানিধি চক্রবর্তী, তারক আচার্য এবং শ্রীমতী স্মৃতি ভট্টাচার্য ও চন্দনা দে। রয়েছেন উদয়বাবু, অম্বিকাবাবু ও জগদীশ দাস নামে জনৈক স্থানীয় ব্যবসায়ী। রয়েছে নীলিমা ও তার বোন। এখন এত মানুষকে এ ঘরে বসতে দিই কোথায়?

না, শেষ পর্যন্ত উদয়বাবু ও নীলিমা সমস্যার সমাধান করে দেয়। তিনি তাঁর সহকর্মী শিক্ষকদের স্কুলে পাঠিয়ে দিলেন, বোধকরি সভার আয়োজন সম্পূর্ণ করতে। আর নীলিমা বলে, আমাদের বাড়ি এখান থেকে খুবই কাছে। আমরা গৌতমকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি, সন্ধ্যার আগে ওকে দিয়ে যাবো।"

প্রস্তাবটা ভালই। ওদের সঙ্গে গেলে গৌতমের একটু বিশ্রাম হবে। তাছাড়া এখানে সবাই আমাকে নিয়ে ব্যস্ত। বেচারী বড্ড একা পড়ে গেছে। সে নীলিমাদের বাড়িতে ভালই থাকবে।

গৌতম এর আগে আর কখনো আসামে আসে নি। নীলিমাদের বাড়ির সবাই হয়তো বিশুদ্ধ বাংলা বলতে পারে না। তবু ভাষা বিভ্রাট ঘটবার কোন কারণ নেই। গৌতম বাংলা বললে যেমন ওরা বুঝতে পারবে, তেমনি ওদের অসমীয়াও গৌতমের বুঝতে তেমন অসুবিধে হবে না। সবাই নিজের ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করবে। বাংলা ও অসমীয়া যে ভগ্নীভাষা।

ওরা চলে যাবার পরে উদয়শঙ্করবাবুকে বলি, "হাতে সময় থাকলে বঙাই-গাঁওয়ের কথা বলুন।"

"হাতে সময় আছে। কিন্তু অম্বিকাবাবু থাকতে আমি বলব বঙাইগাঁওয়ের কথা। আসামের ওপরে বিশেষ করে গোয়ালপাড়া জেলার ওপরে ওঁর বিশখানি বই আছে। সেইসব বই লেখার সময়ে উনি আসামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি নিয়ে রীতিমত গবেষণা করেছেন। সুতরাং অম্বিকাবাবুর সামনে আমি আর কি বলব?"

"তাতে কি হয়েছে।" অম্বিকাবাবু বলেন, "আপনিও তো বহু বছর এখানে শিক্ষকতা করছেন, বলুন না বঙাইগাঁওয়ের কথা।"

উদয়বাবু আর আপত্তি করেন না। তিনি শুরু করেন, "তৈল-শোধনাগার ও তৈলজাত দ্রব্যের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য ভারতের মানচিত্রে বঙাইগাঁও একটা বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। এর আগে বঙাইগাঁওয়ের একমাত্র পরিচয় ছিল রেলনগরী। তবে বঙাইগাঁওয়ের অবস্থান চিরকাল গুরুত্বপূর্ণ রূপে বিবেচিত হয়েছে কারণ এটি ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রবেশ তোরণ।"

"আচ্ছা, তৈল-শোধনাগারটি এখান থেকে কতদূর?" উদয়বাবু থামতেই প্রশ্ন করি।

তিনি উত্তর দেন, "শহর থেকে মাত্র পাঁচ কিলোমিটার। জায়গাটার নাম ধালিগাঁও।"

"আর কোন ইণ্ডাস্ট্রি আছে এখানে ?"

"আছে। শহরের পুবদিকে—চা বাগান। নাম বীরঝোড়া টী এস্টেট। তাছাড়া নিউ বঙাইগাঁওয়ের কাছে রয়েছে ডাংতল রেলওয়ে ওয়ার্কশপ, পূর্বাঞ্চলের সবচেয়ে বড় রেল কারখানা এবং এখান থেকে ২১ কিলোমিটার পশ্চিমে শালাকাটিতে তাপ-বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র।"

"আচ্ছা, নিউবঙাইগাঁও থেকে বঙাইগাঁও কতদূর ?"

"মাত্র তিন কিলোমিটার।" অম্বিকাবাবু উত্তর দেন। অম্বিকাবাবু শুধু একজন সুপণ্ডিত অধ্যক্ষ নন, তিনি সুসাহিত্যিক। অসম সাহিত্যসভার একজন বিশিষ্ট ও সক্রিয় সদস্য। তাই আমি তাকে বলি, "এবারে আপনি কিছু বলুন।"

অম্বিকাবাবু বলেন, "আপনি গারো পাহাড়ে যাচ্ছেন। আশা করছি, আপনি গারো পাহাড়ের ওপরে কিছু লিখবেন। তাই আপনাকে একটা অনুরোধ করব।"

"বেশ বলুন।"

"আপনি দেউয়ান সিং এবং নারায়ণ সাঙমা সম্পর্কে অবশ্যই কিছু লিখবেন।" একবার থামেন তিনি। তারপরে আবার বলতে থাকেন, "দেউয়ান সিং হলেন গারো পাহাড়ের বিদ্যাসাগর। গারোদের মধ্যে তিনিই প্রথম অনার্স নিয়ে বি. এ. পাস করেন। ইংরেজীতে তাঁর অসাধারণ দখল ছিল। গারো পাহাড়ের লোক-সংস্কৃতির ওপরে রচিত তাঁর কয়েকখানি ইংরেজী বই গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করেছে। গারো সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে তাঁর দান অপরিসীম।"

"আর নারায়ণ সাঙমা ?"

"গারো পাহাড়ের দাদাঠাকুর।"

"কি রকম ?"

"যৌবনে তিনি কলকাতায় কোন সংবাদপত্রে কম্পোজিটর ও মেশিনম্যানের কাজ করতেন। তারপরে চাকরি ছেড়ে দিয়ে তুরা চলে আসেন। সামান্য সামর্থ্য দিয়েই 'আচেক সংবাদ' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। তিনিই ছিলেন সে পত্রিকার সাংবাদিক সম্পাদক কম্পোজিটর মেশিনম্যান ও পরিবেশক। গারো পাহাড়ের রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসে আচেক সংবাদ বা গারো সংবাদ অত্যন্ত মূল্যবান ভূমিকা পালন করেছে। তাই দেউয়ান সিং-এর মতো নারায়ণ সাংমাও গারো পাহাড়ে অবিস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন।"

থামলেন অম্বিকাবাবু। কিন্তু আমি কিছু বলতে যাবার আগেই তিনি আবার বলেন, "আপনাকে আরেকটা অনুরোধ—আপনি গারো পাহাড়ের ওপর কোন বই লিখলে কিন্তু গোয়ালপাড়া জেলার কথা কিছু লিখবেন। কারণ গোয়ালপাড়াকে বাদ দিলে গারো পাহাড়ের কথা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।"

"কিছু কথা বলতে আপনি কি বোঝাতে চাইছেন?" আমি জিজ্ঞেস করি।

অম্বিকাবাবু উত্তর দেন, "যেমন ধরুন মহেন্দ্রগঞ্জের প্রাতঃস্মরণীয় বীর রাজা মহেন্দ্রনারায়ণের কথা, গৌরীপুরের কুমার প্রমথেশ বড়ুয়া ও তাঁর ভাই কুমার প্রকৃতিশ বড়ুয়ার কথা, এ জেলার প্রথম সংবাদপত্র হিতসাধনীর কথা। এই সাপ্তাহিক সংবাদপত্রটি ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল।"

"তার মানে সাংবাদিকতার ইতিহাসে গোয়ালপাড়ার শতবর্ষ পূর্ণ হয়ে গিয়েছে।" উদয়বাবু যোগ করেন।

অম্বিকাবাবু আবার শুরু করেন, "আপনাকে লিখতে হবে কোকরাঝাড় ও সাপটগ্রামের কথা। সাপটগ্রামের অনতিদূরে কচুগাঁও জঙ্গল এশিয়া মহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শালবন। সম্প্রতি এই জঙ্গলে একটা ব্যাঘ্র প্রকল্প করা হয়েছে। ফেরার পথে গোটাদুয়েক দিন আমাদের এখানে থাকলে, আমরা আপনাকে সাপটগ্রাম ও কচুগাঁও ঘুরিয়ে আনতে পারি।"

কি বলব? অম্বিকাবাবু আসামের মানুষ। সুতরাং আতিথেয়তা রয়েছে তাঁর রক্তে। ফেরার পথে দুদিন এখানে থাকার সময় হবে না আমার। সুতরাং নীরব থাকতে হয়।

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তার পরে বিদায় নিলেন অম্বিকাবাবু। বলে গেলেন, যথাসময়ে তিনি সভায় উপস্থিত হবেন।

অম্বিকাবাবু চলে যাবার পরে স্মৃতি বলে, "এখন আপনি একটু বিশ্রাম করে নিন। ঘণ্টাখানেক পরেই তো আবার সভার জন্য তৈরি হতে হবে।"

চন্দনা ও উদয়বাবু সমর্থন করেন তাকে। আমি আর আপত্তি না করে বিছানায় গা এলিয়ে দিই। সত্যিই কয়েকদিন ধরে শরীরের ওপর দিয়ে বড়ই ধকল চলেছে।

স্মৃতি ও চন্দনার সঙ্গে আমি ও গৌতম যখন রেলওয়ে হাইস্কুলে এসে পৌঁছলাম, তখন গোধূলির ম্লান আলো গিয়েছে মিলিয়ে, নেমে এসেছে সন্ধ্যা।

ফুল আর আলোয় সেজে উঠেছে সভাস্থল। উষ্ণ অভ্যর্থনার মাঝে আমি এসে পৌছলাম সেখানে।

উদয়বাবু জানালেন, "আমরা প্রস্তুত। তবে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এখনও এসে পৌছাননি, তাঁরা এলেই সভা শুরু হবে।"

নারায়ণবাবু যোগ করেন, "এটি আপনার সংবর্ধনা সভা হলেও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আবৃত্তি ও নাচ-গানের ব্যবস্থা রয়েছে। সুতরাং সময়ে শুরু করতে না পারলে দেরি হয়ে যাবে।"

শেষ পর্যন্ত সময়েই শুরু হল। ভিড় মন্দ হয় নি। নিজেকে একটু অসহায় বোধ হচ্ছে বটে, তাহলেও ভাল লাগছে। কারণ এমন আন্তরিকতা খুব বেশি পাওয়া যায় না। বক্তাদের বক্তৃতা, কবিদের কবিতা ও গায়কদের গানে আমি ক্ষণে ক্ষণে এই আন্তরিকতার মধুর স্পর্শ লাভ করছি। আমার মতো একজন নগণ্য লেখকের প্রতি কি আশ্চর্য ভালোবাসা! আনন্দে আমার চোখ দুটি বার বার অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠছে, আমি ঝাপসা দেখছি। মাঝে মাঝেই চোখ মুছে স্বাভাবিক হয়ে উঠবার চেষ্টা করছি, পেরে উঠছি না।

আমি শুধু কান্না-হাসির দোল দোলনায় দুলতে দুলতে ভাবছি আমার সৌভাগ্যের কথা আর করুণাময় কেদারনাথের কৃপার কথা। সত্যই আমার প্রতি তাঁর করুণা সীমাহীন। নইলে এত মানুষ আমাকে ভালোবাসবেন কেন?

অবশেষে শুরু হল মানপত্র পাঠ। ওঁরা লিখেছেন—

'...আমাৰ (আমাদের) মাজত (মাঝে) আপোনাৰ উপস্থিতিয়ে আজি অসমীয়া-বঙালী সাহিত্যসেবী আৰু (এবং) সাহিত্য-প্ৰেমী ৰাইজক (জনসাধারণ) পরস্পৰে পরস্পৰৰ মিলা-প্ৰীতি আৰু সম্প্ৰীতিৰ ভেটি (ভিৎ) সুদৃঢ় কৰিছে, উপৰিও যি (যে) কোনো বিভেদকামী শক্তিৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰাম কৰিবৰ কাৰণে শক্তি যোগাইছে আৰু প্ৰেৰণা দিছে।

আমাৰ ভিতৰত যাতে সম্প্ৰীতিৰ সেতু সুদৃঢ় হয় আৰু উত্তৰোত্তৰ বৃদ্ধি পায় তাকে (তাই) আপোনাৰ অমৰ লিখানিৰ পৰা (থেকে) আশা কৰিলো।...সাহিত্যৰ জৰীয়তে (আপনার সাহিত্যের মাধ্যমে) সৰ্বশ্ৰেণীর মানুহৰ (মানুষের) ভিতৰত আধ্যাত্মিক মিলনৰ সেতু ৰচনাৰ ক্ষমতা দিয়ে (দিক) তাৰ বাবে (জন্য) প্ৰাৰ্থনা জনালো (জানালাম)।...'

পাঠ শেষ হল। আমি উঠে দাঁড়িয়ে মানপত্রখানি গ্রহণ করলাম। সবিনয়ে বললাম—আমার মধ্যে আপনাদের আশা পূর্ণ হবে কিনা জানা নেই আমার,

হয়তো হবে না কারণ আমি অযোগ্য। তবু আপনাদের স্নেহের দান আমি জীবন-দেবতার আশীর্বাদ রূপে মাথায় তুলে নিলাম।

মানপত্রের পরে অম্বিকাবাবু একটি স্টেইনলেস স্টীলের পানপাত্র বা পান রাখার পাত্র আমার হাতে তুলে দিলেন। আমি পান খাই না, খেলেও এটি ব্যবহার করতে পারতাম না। আমি আসামবাসীদের ঐতিহ্যময় উপহারটিকে সযত্নে সঞ্চয় করে রাখবার জন্য পরমসমাদরে গ্রহণ করলাম।

সভার শেষে বেশ কিছুক্ষণ ধরে কবিতা পাঠ ও গান শোনা গেল। গান বলতে রবীন্দ্রসঙ্গীত ও আসামের লোকসংগীত। ভারী ভাল লাগল।

অবশেষে একসময় অনুষ্ঠান শেষ হল। আমরা ফিরে চললাম ডাকবাংলোয়। গাড়ির সিটে গা এলিয়ে দিয়ে ভেবে চলি আজকের দিনটির কথা। সকালে তো ভাবতেও পারি নি আজ এখানে এমন অনাবিল ভালোবাসা আমার জন্য অপেক্ষা করছে। এমন আনন্দময় দিন আমার জীবনে খুব বেশি আসে নি। তাই এ মধুময় দিনটি আমার স্মৃতির মালায় অক্ষয় হয়ে রইল। পরম করুণাময় জীবনদেবতাকে আমি পুনরায় প্রণাম করি।

তিন

যা বলে গিয়েছিলেন, তাই করলেন রঞ্জনবাবু। সকাল ঠিক ন'টার সময় এসে উপস্থিত হলেন বঙাইগাঁও ডাকবাংলোয়। আমরাও তৈরি হয়ে নিয়েছি। রঞ্জনবাবু আসতেই ব্রেকফাস্ট সেরে নিলাম। তারপরেই শুরু হল বিদায় নেবার পালা। এসেছেন অনেকেই—উদয়বাবু, মৃণালবাবু, হারানিধি-বাবু, তারকবাবু, স্মৃতি, চন্দনা ও নীলিমা। এসেছে মিনতি। কিন্তু সে বিদায় জানাতে আসে নি, এসেছে সঙ্গী হবে বলে। সেও আমাদের সঙ্গে যাবে। গোয়ালপাড়া তার কর্মস্থল। সে রঞ্জনবাবুর অফিসে চাকরি করে।

সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গাড়িতে উঠি। বিদায় বেলায় নীলিমা আমাকে ফুলাম গামোছা দিল। অসমীয়া সমাজে এর চেয়ে আন্তরিক উপহার আর কিছু নেই। আমি রঞ্জনবাবু ও মিনতি পেছনে বসেছি। গৌতম বসেছে ড্রাইভারের পাশে। ফেরার পথে আবার দেখা হবে এই আশা নিয়ে বিদায় নিই। গাড়ি এগিয়ে চলল।

বঙাইগাঁও থেকে গোয়ালপাড়া যেতে হলে ব্রহ্মপুত্র পার হতে হবে। এপারে যোগীঘোপা ঘাট ওপারে পঞ্চরত্ন ঘাট। আমরা বঙাইগাঁও শহর ছাড়িয়ে যোগীঘোপার দিকে অর্থাৎ দক্ষিণ-পশ্চিমে এগিয়ে চলেছি।

"আচ্ছা কাকা, এখান থেকে যোগীঘোপা কতদূর ?" পেছন ফিরে গৌতম প্রশ্ন করে।

রঞ্জনবাবু বলেন, "৩৪ কিলোমিটার। ব্রহ্মপুত্র ওখানে ২ কিলোমিটার চওড়া। ওপারের পঞ্চরত্ন ঘাট থেকে গোয়ালপাড়া শহর ৮ কিলোমিটার।"

"তার মানে বঙাইগাঁও থেকে গোয়ালপাড়া ৪৪ কিলোমিটার।" গৌতম বলে।

রঞ্জনবাবু মাথা নাড়েন।

গৌতম আবার জিজ্ঞেস করে, "আচ্ছা, যোগীঘোপা নামের কোন ইতিহাস আছে কি ?"

"আছে।" এবারে মিনতি উত্তর দেয়, "যোগীঘোপা ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তর-তীর। ঘাটে পৌঁছে দেখবে নদীর পারে পাহাড় রয়েছে। সেই পাহাড়টার নাম যোগীঘোপা।"

"কোন কারণ আছে ?"

"আছে বৈকি! ঐ পাহাড়ে আঠারোটি ঘোপা বা ছোট-ছোট গুহা রয়েছে। কথিত আছে ঐসব গুহায় যোগী বা সন্ন্যাসীরা যোগসাধনা করতেন। তাই ঐ পাহাড়ের নাম যোগীঘোপা…"

"আর তা থেকেই ঘাটের নাম।"

"ঠিক তাই।" মিনতি বলে। সে যোগ করে, "যোগীঘোপা পাহাড়ের পুবদিকে সুবাসিনী নামে একটা গুহা আছে, স্থানীয়রা বলেন ঐ গুহাতে হর-পার্বতীর বিয়ে হয়েছে। বিবাহ মণ্ডপের চারপাশে পাথরের ওপরে ছোট-ছোট কলাগাছ পোঁতার দাগ রয়েছে।"

স্বাভাবিক ভাবেই আমার গিরিতীর্থ কেদারনাথের অনতিদূরে অবস্থিত ত্রিযুগীনারায়ণের কথা মনে পড়ছে। কথিত আছে প্রজাপতি ব্রহ্মার পৌরোহিত্যে হিমালয় সেখানে বসেই উমাকে কৈলাসপতির হাতে সমর্পণ করেছেন। হর-পার্বতীর বিয়ের কুশণ্ডিকা যজ্ঞের অখণ্ডধুনি সেখানে তিন যুগ ধরে জ্বলছে বলে, পুণ্যস্থানটির নাম ত্রিযুগীনারায়ণ।*

কিন্তু আমি সেকথা প্রকাশ না করে চুপ করে থাকি। মিনতি বলতে থাকে, "বিবাহ-মণ্ডপের সামনে পাথরের ওপরে এক হাত চওড়া ও দেড় হাত

* লেখকের 'পঞ্চ-প্রয়াগ' বইখানি দ্রষ্টব্য।

লম্বা একটি কুণ্ড আছে। এই কুণ্ডে বারো মাস জল থাকে। কথিত আছে নাথ সম্প্রদায়ের পরমগুরু গোরক্ষনাথ সেখানে যোগসাধনা করতেন।" মিনতি চুপ করে।

গৌতম আর কিছু জিজ্ঞেস করে না। কয়েকটা মিনিট নীরবে কেটে যায়। তারপরে রঞ্জনবাবু বলেন, "যোগীঘোপা সম্পর্কে আরও নানা কাহিনী আছে।"

"যেমন?" জিজ্ঞেস করি।

রঞ্জনবাবু বলেন, "যেমন মহারাজা বল্লাল সেন বাংলা থেকে তাড়িয়ে দেবার পরে যোগী বা নাথ সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরা এই যোগীঘোপাতে এসে আশ্রয় নেন। সেইসব যোগীদের সম্পর্কে স্থানীয়রা আজও বহু অলৌকিক কাহিনী বলে থাকেন।"

থামলেন রঞ্জনবাবু। আমি তাঁর মুখের দিকে তাকাই। তিনি আবার বলতে থাকেন, "মোগল সেনাপতি রামসিংহ যোগীঘোপাতে তাঁবু ফেলে গৌহাটি জয়ের পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু শরাইঘাটের যুদ্ধে তিনি অহোম সেনাপতি লাছিত বরফুকনের কাছে সম্পূর্ণ পরাজিত হন।"

আমি মাথা নাড়ি। রঞ্জনবাবু বলে চলেন "বিজনীর রাজা মুকুন্দনারায়ণ, অপুত্রক অবস্থায় মারা যাবার পরে রাজ্যে যখন আত্মকলহ শুরু হয়, তখন রাজমাতা বাণেশ্বরীদেবী যোগীঘোপাতে এসে শেষজীবন অতিবাহিত করেন।"

"রঞ্জনবাবু থামতেই মিনতি যোগ করে, "ইংরেজরা আসামে এসে যোগী-ঘোপায় প্রথম কুঠি তৈরি করেছিলেন।

"জায়গাটির অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে ইংরেজরা যোগীঘোপাকে খুবই পছন্দ করতেন। তাই বিগত বিশ্বযুদ্ধের সময় ওখানে ব্রহ্মপুত্রের ওপরে একটি রেলপুল তৈরির পরিকল্পনা করা হয়েছিল। বেঙ্গল অ্যাণ্ড আসাম রেলওয়ে থেকে 'সার্ভে' পর্যন্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর পরিকল্পনাটি রূপায়িত হয় নি। ফলে আজও গোয়ালপাড়াবাসীদের মধ্যে একটা চাপা অসন্তোষ রয়ে গিয়েছে।"

সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ আমরা ঘাটে পৌছলাম। টাগ্ (Tug) বা পারাপারের ফেরী ষ্টীমার অপেক্ষা করছিল আমাদের জন্য। আমরা গাড়ি থেকে পায়ে হেঁটে জেটি পেরিয়ে টাগ্-এ এলাম। ড্রাইভার তারপরে গাড়ি নিয়ে এলো। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে টাগ্ ছেড়ে দিল।

বেশ কিছুদিন বাদে ব্রহ্মপুত্র পার হচ্ছি। গতবছর আমার আর আসামে আসা হয়ে ওঠে নি। আসামের প্রাণধারা ব্রহ্মপুত্র। দুর্ভাগ্যের কথা দিন দিন

তার আয়ু কমে আসছে, আমরা তাকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য কোন স্থায়ী ও বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণ করছি না। অবশ্য এই অবহেলা ও অযত্ন যে কেবল ব্রহ্মপুত্রের বেলাতেই সত্য, তা ঠিক নয়। ভারতের প্রায় সমস্ত নদীর এই একই দুরবস্থা—গভীরতা গিয়েছে কমে। সে আর বর্ষার জল বইতে পারছে না। ফলে বর্ষায় প্লাবন আর গ্রীষ্মে চড়া দেখা দিচ্ছে। নদী প্রকৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। আমাদের অবহেলায় সেই সম্পদ আজ প্রায় অভিশাপে পরিণত হতে চলেছে। তাই ব্রহ্মপুত্রের দিকে তাকিয়ে আজ আমার আনন্দের চেয়ে কষ্ট হচ্ছে বেশি।

কিন্তু না, আর ব্রহ্মপুত্রের কথা ভাববার অবকাশ পাই না। মিনতির কথা শুনে তার দিকে তাকাতে হয়। সে বলে, "আমরা আগে এলেও কিন্তু সাহেবের গাড়ি সবার শেষে উঠত।"

"কেন বল তো?"

"যাতে ওপারে গিয়ে সাহেবের গাড়ি সবার আগে টাগ্ থেকে নামতে পারে। সাহেব যে এস. ডি. ও.।"

"তা তো বটেই।" তাড়াতাড়ি মাথা নেড়ে বলি। আর মনে মনে ভাবি—এস. ডি. ও. মানে মহকুমার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। অথচ সেই মানুষটি কত সহজ সরল ভদ্র ও বিনয়ী। 'বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্' প্রবচনটি যে মিথ্যে নয়, রঞ্জনবাবু তার প্রমাণ। নইলে কিই বা বয়স, বড়জোর বছর সাতাশ। এই বয়সে এতবড় গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হয়েও কি বিস্ময়কর নম্র ও ভদ্র ব্যবহার। আমি তাঁর চাইতে বয়সে বড় এবং তাঁর সিনিয়র দিলীপ গঙ্গোপাধ্যায়ের বন্ধু। সুতরাং আমার সামনে সিগারেট পর্যন্ত খাচ্ছেন না। সংসারে বড় হতে হলে যে বড় গুণ থাকা দরকার, রঞ্জনবাবু তার উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

আধঘণ্টা লাগল ব্রহ্মপুত্র পার হতে। আমরা যোগীগোপা ঘাট থেকে পঞ্চরত্ন ঘাটে এলাম। ব্রহ্মপুত্রের উত্তর পার থেকে দক্ষিণ পারে। মিনতির কথাই ঠিক হল। আমরা নেমে আসার পরেই আমাদের গাড়ি নেমে এল টাগ থেকে। আমরা গাড়িতে উঠলাম। গাড়ি এগিয়ে চলল গোয়ালপাড়ার পথে।

এপারেও দেখছি পাহাড়। শুধু তাই নয় আমাদের পথটা পর্যন্ত রীতিমত আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথ।

তবে সে পথ সুদীর্ঘ নয়। একটু বাদেই সমতল মাটির পথে নেমে এলাম। পঞ্চরত্নের পাহাড় গেল ফুরিয়ে। আর ঠিক তখুনি গৌতম প্রশ্ন করে বসল, "কাকা, এই পঞ্চরত্ন নামটির কোন ইতিহাস আছে কি?"

"আছে। তবে তাকে ইতিহাস না বলে কিংবদন্তী বলাই উচিত হবে। আর সেটা তোমাকে আমার ঘাটে বসেই বলা উচিত ছিল।"

"কেন বলুন তো?"

রঞ্জনবাবু বলেন, "আগে বললে তুমি দেখতে পেতে, এই পাহড়টাতেও দু-তিনটি গুহা রয়েছে। কথিত আছে একদা পাঁচজন রত্নতুল্য ঋষি ঐ গুহায় সাধনা করতেন। তাই এই পাহাড়ের নাম পঞ্চরত্ন। যাবার সময় তোমাকে আমি গুহাগুলো দেখিয়ে দেব।"

গৌতম মাথা নাড়ে। রঞ্জনবাবু বলে চলেন, "এই পাহাড়ের বিভিন্ন স্থানে বেশ কয়েকটি শিবলিঙ্গ স্থাপিত রয়েছে। তাঁদের মধ্যে পাগলাবাবার থান বিশেষ বিখ্যাত। সেখানের শিব শুনেছি খুবই জাগ্রত।"

ফাঁকা রাস্তা, পাঁচ মাইল পথ। সুতরাং কয়েক মিনিটের মধ্যে আমরা পৌঁছে গেলাম গোয়ালপাড়া সার্কিট হাউসে। অপরূপ অবস্থান তিন দিকেই— ব্রহ্মপুত্র। ব্রহ্মপুত্রের ভেতরে ঢুকে যাওয়া একফালি প্রায় অর্ধবৃত্তাকার উঁচু ভূখণ্ডের ওপরে রমণীয় নিবাস।

আমরা গাড়ি থেকে নেমে আসি। বেয়ারা সেলাম করে। রঞ্জনবাবু তাঁকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে আমাকে বলেন, "এবারে আমি কয়েক ঘণ্টার জন্য ছুটি নেব। অফিসের পরে চলে আসব। আপনারা বিশ্রাম করে স্নান-খাওয়া করে নিন। আজ আর বাইরের কোন প্রোগ্রাম নেই। সন্ধ্যায় শুধু কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি আপনার সঙ্গে আলাপ করতে আসবেন। আগামীকাল আমরা গোয়ালপাড়া দেখতে বের হব।"

মিনতিও বিদায় নেয়, সেও অফিসে যাবে। আমি ও গৌতম বেয়ারার সঙ্গে ভেতরে আসি। চমৎকার ব্যবস্থা। সামনে বসবার ঘর, পেছনে শোবার, সঙ্গে বাথরুম। দামী আসবাবপত্র, নরম বিছানা। কিন্তু সবচেয়ে রমণীয় হচ্ছে সামনের বারান্দাটি। ওখান থেকে ব্রহ্মপুত্রের দৃশ্য অপরূপ। গৌতম তাই ঘরে না ঢুকে ওখানেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। থাকগে, আমি ততক্ষণে বেয়ারার সাহায্যে গোছগাছ সেরে নিই। দুটি দিন যে বাস করব এই রমণীয় নিকেতনে।

দুপুরে রঞ্জনবাবু এসে খোঁজ-খবর নিয়ে আবার অফিসে চলে গেলেন। লাঞ্চের পরে একটু বিশ্রাম করে বারান্দায় এসে বসি। ব্রহ্মপুত্রের অপরূপ রূপ দেখতে দেখতে কখন যে বিকেল হয়ে গেছে, টের পাই নি। টের পেলাম বেয়ারার ডাকে, "সাহেব, চা নিয়ে আসি?"

তাড়াতাড়ি ঘড়ির দিকে তাকাই। চারটে বেজে গিয়েছে। গৌতম চা খায় না। আমার জন্য চা আনতে বলি।

পাঁচটার পরে রঞ্জনবাবু আসেন। এবারে আর তিনি একা নন। তাঁর সঙ্গে এসেছেন এখানকার এ্যাডিশনাল এ্যাসিস্ট্যাণ্ট কমিশনার বিমলকুমার হাজরিকা। বয়স বছর তিরিশ। সুশ্রী ও অমায়িক যুবক। এম. এ. পাশ করে কিছুদিন অধ্যাপনা করেছেন। তারপরে আসাম সিভিল সার্ভিসে যোগ দিয়েছেন। কিন্তু প্রশাসনিক প্রভাবে এখনও নীরস হয়ে ওঠেন নি। ছাত্রজীবনের সাহিত্যপ্রীতি ও কাব্যচর্চাকে সযত্নে বাঁচিয়ে রেখেছেন। 'অমরাবতী আসাম' ও 'মায়াময় মেঘালয়' (খাসি পাহাড় পর্ব) সহ আমার কয়েকখানি বই পড়েছেন।

চা খেতে খেতে তিনি আমার সম্পর্কে একটি অসমীয়া কবিতা লিখে ফেললেন। কবিতাটির বিষয়বস্তু হল—তিনি পাঠক, আমি লেখক। আমার লেখা পড়ে লেখক সম্পর্কে মানসপটে তিনি যে ছবি এঁকেছিলেন, বাস্তবের আমি হুবহু সেই রকম। আর আমি নাকি ভারতের শাশ্বত সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কাজ করে চলেছি।

তারপরে এলেন সরকারী বি. টি. কলেজের অধ্যক্ষ এস. এম. দত্ত মজুমদার। আগামীকাল দুপুরে তাঁর বাড়িতে আমার ও গৌতমের সঙ্গে রঞ্জনবাবুর নেমন্তন্ন। রঞ্জনবাবু কাল দুপুরের পরে অফিসে যাবেন। সুতরাং তাঁর কোন অসুবিধে হবে না। তবে বিমলবাবু যেতে পারবেন না। তাঁকে সকালেই অফিসে যেতে হবে।

অধ্যক্ষ দত্ত মজুমদারের পরে এলেন শ্রীমতী ইলা নাথ। মধ্যবয়সী ভদ্রমহিলা। স্থানীয় একটা বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা। তাঁর বাংলা উচ্চারণ শুনে বোঝার উপায় নেই তিনি অসমীয়া। তিনিও আমাকে এবং গৌতমকে রাতে তাঁর বাড়িতে নেমন্তন্ন করলেন।

তাঁর কথা শুনে রঞ্জনবাবু ও বিমলবাবু দুজনে দুজনের দিকে তাকালেন। ইলাদেবী হেসে ফেললেন। হাসতে হাসতেই বললেন, "ভয় পাবেন না। ওঁদের সঙ্গে আপনারাও আসবেন বৈকি।"

আমিও হেসে ফেলি। রঞ্জনবাবু বলেন, "আমি জানতাম আপনি আমাদেরও নেমন্তন্ন করবেন। কারণ আমি ব্যাচেলর আর মিসেস হাজরিকা এখানে নেই। তবু বলছিলেন না বলে একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলাম, এই যা!"

এবারে সমবেত হাস্যরোল।

কিছুক্ষণ কথাবার্তার পরে ইলাদেবী বিদায় নিলেন। কিন্তু বিশ্রামের অবকাশ পাওয়া গেল না। রঞ্জনবাবু বলেন, "চলুন, বাইরের 'লন্'-এ গিয়ে বসা যাক।" লন মানে বাংলোর সামনে ফুলগাছে ঘেরা একফালি সবুজ প্রান্তর। প্রায় তিনদিকেই ব্রহ্মপুত্র চলেছে বয়ে। এখন যদিও তাকে চোখ দিয়ে খুব স্পষ্ট দেখা যাবে না। কারণ তার বুকে সন্ধ্যার আঁধার এসেছে নেমে। তবে তাঁর অবস্থিতি বুকের মাঝে অনুভব করা যাবে।

বাইরে এসে কিন্তু বুঝতে পারি, ব্রহ্মপুত্রের ছন্দময় অনুভূতি লাভ করার জন্য রঞ্জনবাবু আমাকে ডেকে আনেন নি এখানে। লন্-এ সারি সারি চেয়ার আর সেখানে বসে আছেন প্রায় পঞ্চাশজন নারী পুরুষ। কিছু চেয়ার খালি পড়ে রয়েছে। বোধ করি আরও আসবেন। কিন্তু কি ব্যাপার?

আমি সবিস্ময়ে রঞ্জনবাবুর দিকে তাকাই। বিমলবাবু আমার নীরব প্রশ্নের উত্তর দেন, "আপনি এখানে এসেছেন, তাই এ ব্যবস্থা। কোন 'ফর্ম্যাল মিটিং' নয়। গোয়ালপাড়ার কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি ও কিছু সাহিত্যরসিক মানুষ আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছেন।"

অতএব শুরু হয় আলাপ। 'মাইক' আর 'মালা' না থাকলেও, আমাকে বলতে হ'ল অনেক কথা—হিমালয় ও আসামের কথা, তেনজিং নোরগে ও স্বামী কৃষ্ণাশ্রমের কথা*। অনিমাদি সুজয়া ও কমলার কথা।* সেই সঙ্গে শ্রোতাদের নানা প্রশ্নের উত্তর দিতে হল।

রাত ন'টায় সভা ভাঙল কিন্তু আমার জনসংযোগ শেষ হল না। সভার পরে আমার এক পাঠিকা-বোন এসে পরিচয় দেয়। মেয়েটির নাম যূথিকা ভৌমিক, মানকাচরের মেয়ে। গ্রীষ্মের ছুটিতে এখানে মামার বাড়িতে বেড়াতে এসেছে। কাছেই ওর মামার বাড়ি। আমি এসেছি শুনে মামাতো ভাইকে নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

চিঠিতে ওর সঙ্গে আমার পরিচয় অনেকদিনের কিন্তু দেখা এই প্রথম। যূথিকা তাই ভারী খুশি। আমারও ভাল লাগছে। ওর মামাতো ভাই আগামীকাল সকালে তাদের বাড়িতে চায়ের নেমন্তন্ন করে। কিন্তু কাল সকালে সময় হবে না, রঞ্জনবাবুর সঙ্গে গোয়ালপাড়া দেখতে বের হব। তাই অন্য কোন সময় যাবার প্রতিশ্রুতি দিতে হয়। ওরা খুশি হয়ে বিদায় নেয়।

রাত ন'টায় এসে পৌছলাম ইলাদেবীর বাড়িতে। তাঁর স্বামী বিশ্বনাথবাবু

* লেখকের 'চতুরঙ্গীর অঙ্গনে', 'গিরি-কান্তার' ও 'লীলাভূমি লাহুল' দ্রষ্টব্য।

নিজে এসে দরজা খুলে দিলেন। আমরা সামনের ঘরে প্রবেশ করি। এটি বিশ্বনাথবাবুর চেম্বারও বটে। তিনি এ্যাডভোকেট। অনেক রাত অবধি এ ঘরে মক্কেলরা বসে থাকেন। কথায় কথায় বলেন, "মক্কেল আর মামলা তো রোজই আছে এবং থাকবে কিন্তু আপনি যে কালই চলে যাবেন। তাই আজ ও-পাট চুকিয়ে দিয়েছি।"

শুধু সাহিত্যপ্রীতি নয় কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলার পরে ভদ্রলোকের মার্জিত-রুচির পরিচয় পেলাম। আর মিসেস নাথের সুরুচির পরিচয় পেলাম ডিনার টেবিলে। ভাত ডাল ঘি ভাজা তরকারী মাছ ও মুরগীর মাংস রান্না করেছেন। রাত বলে টক করেন নি তবে আচার ও স্যালাড পাওয়া গেল। এবং মিষ্টিও বাদ গেল না। ইলাদেবী কেবল একজন ভাল শিক্ষিকা নন, ভাল রাঁধুনীও বটে।

বলা বাহুল্য খাওয়াটা একটু বেশিই হয়ে গেল। তাই খাবার পরে কিছুক্ষণ গল্প করে জিরিয়ে নিতে হল।

অবশেষে নাথ দম্পতির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যখন গড়িতে এসে বসি, তখন প্রায় মধ্যরাত্রি সমাগত। এবং সেই সঙ্গে আমার জীবনের একটা আনন্দময় দিনের অবসান হল।

চার

সকালেই স্নান সেরে নিলাম। তারপরে ব্রেক-ফাস্ট করে রঞ্জনবাবুর সঙ্গে বেরিয়ে পড়া গেল। আমরা এখন গোয়ালপাড়া দেখতে বের হয়েছি।

বড়রাস্তা ছাড়িয়ে গাড়ি একটা মাঠের মধ্যে এসে নামল। মাঠে কাদা নেই। তাছাড়া আজ আমরা জীপগাড়ি করে বের হয়েছি। সুতরাং গাড়ি অক্লেশে এগিয়ে চলেছে।

একটা ছোট পাহাড়ের পাদদেশে এসে গাড়ি থামল। মাঠের এ অংশটুকু ভারী সুন্দর। সবুজ সমতলের ওপরে গুটিকয়েক আম বট ও তেঁতুল গাছ। আমরা গাড়ি থেকে নেমে পাহাড়টার সামনে এসে দাঁড়াই। কারা যেন কোন্ সুদূর অতীতে পাহাড়ের গায়ে কয়েকটি মূর্তি খোদাই করে রেখেছেন ভাবী-কালের দর্শনার্থীদের জন্যে। আমরা দর্শন করি।

সামনের বড় পাথরটার বাঁদিকে রাম লক্ষ্মণ ও সীতা আর ডানদিকে পঞ্চ-

পাণ্ডবের মূর্তি। সবার পেছনে দশভুজা দুর্গামূর্তি। তাঁর মাথায় মুকুট। কিন্তু তিনি দশভুজা নন, তাঁর আটখানি হাত।

একটু অবাক হই। ঠিক এ ধরণের মাতৃমূর্তি দেখেছি গুজরাতের একাধিক মন্দিরে। কোথায় গুজরাত আর কোথায় আসাম। অথচ দুয়ের মাঝে একই ধর্মীয় সংস্কৃতির অক্ষয়ধারা প্রবাহিত হচ্ছে সেই সুদূর অতীত থেকে। গোয়ালপাড়ায় এসে অখণ্ড ভারতীয় সংস্কৃতির আরেকটি উদাহরণ পেয়ে গেলাম।

দর্শন শেষ করে চড়াই পাকদণ্ডি পথ বেয়ে আমরা পাহাড়ের ওপরে উঠতে শুরু করি। আমার বা গৌতমের কোন অসুবিধে হবার কথা নয়। গৌতম দার্জিলিং থেকে মাউণ্টেনীয়ারিং ট্রেনিং নিয়েছে। রঞ্জনবাবুরও অসুবিধে হচ্ছে না। একে তো অল্প বয়স। তার ওপরে আই. এ এস.। ওঁদের সবকিছুই পারতে হয়।

অনেকটা ওপরে উঠে পাহাড়ের গায়ে একফালি সমতল পাওয়া গেল। জায়গাটার একপাশে একটি ছোট বৌদ্ধবিহার, আরেক পাশে শিব মন্দির। দুটিকেই বেশ পুরনো মনে হচ্ছে। যুগ যুগ ধরে বৌদ্ধ ও শৈবরা পাশাপাশি বাস করে আপন ইষ্টদেবতার আরাধনা করে চলেছেন। এইরকম একটা জায়গায় এসে বিবিধের মাঝে মিলনের তথা 'Unity in diversities'-এর এমন একটা উদাহরণ পেয়ে যাবো, তা ভাবতেও পারি নি।

দর্শন সেরে হৃষ্ট মনে নেমে চলেছি নিচে। চলতে চলতে রঞ্জনবাবু বলেন, "শিবমন্দির থেকে যদি আরও খানিকটা ওপরে উঠে যেতেন, তাহলে দেখতে পেতেন তিনটি গুহা। কয়েকজন যোগী বাস করেন।"

গাড়ি এবারে সেই মাঠের ওপর দিয়েই ডানদিকে এগিয়ে চলল। কয়েক মিনিট চলার পরে একটা বটগাছের নিচে এসে গাড়ি থামল। সামনে একটি ছোট মন্দির। ইটের দেওয়াল কিন্তু টিনের চাল। মন্দিরের চারিপাশে খানিকটা জায়গা দেওয়াল দিয়ে ঘেরা।

আমরা গাড়ি থেকে নেমে মন্দির এলাকায় প্রবেশ করি। মন্দিরের সামনে একফালি উঠান, সেখানে একটা বেলগাছ। কিন্তু মন্দিরে ঢুকে দেখি সূর্যমূর্তি। আশ্চর্য! বেলগাছ তো শিব মন্দিরের প্রতীক।

মূর্তিটি সুপ্রাচীন এবং ভারী সুন্দর। আমরা দর্শন করি, প্রণাম করি। সূর্য মন্দির খুব বেশি দর্শন করা যায় না।

মন্দিরের মেঝেতে একখানি পাথরের ওপরে চক্র খোদিত। চক্রের চারিদিকে বারোটি পদ্মের পাপড়ি। প্রত্যেকটি পাপড়িতে একটি করে ক্ষুদ্র

মূর্তি। রঞ্জনবাবু বলেন, "লক্ষ্য করে দেখুন, মূর্তিগুলো সবই বুদ্ধমূর্তি।"

ওপরে যা দেখে এসেছি, নিচে এসেও তাই দেখছি—সেই সর্বধর্ম সমন্বয়ের কথা, ভারতীয় সংস্কৃতির মূলমন্ত্র।

সূর্যমন্দির দর্শন করে আবার উঠে এসেছি গাড়িতে। পঞ্চরত্ন থেকে ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ তীর ধরে জীপ পশ্চিমে এগিয়ে চলেছে। আঁকাবাঁকা উঁচু নিচু পাহাড়ী পথ। হেলে-দুলে জীপ চলেছে।

প্রায় পনেরো কিলোমিটার পাহাড়ী পথ পেরিয়ে আমরা পাহাড় থেকে সমতলে নেমে এলাম। ব্রহ্মপুত্রের তীরে একফালি সমতল প্রান্তর। নদীর তীরে একটা চাঁপাগাছের ছায়ায় ছোট মন্দির।

তারই সামনে এসে জীপ থামে। রঞ্জনবাবু বলেন, "এ জায়গাটার নাম পাগলার টেক্। ছোট হলেও এ শিবমন্দিরটি বেশ বিখ্যাত। চলুন, দেখে আসি।"

জীপ থেকে নেমে কয়েক পা হেঁটে মন্দিরের সামনে আসি। বাংলায় লেখা রয়েছে—শ্রীশ্রী শিবমন্দির। পাগলার টেক্।

নাম যা-ই হোক। জায়গাটির পরিবেশ বড়ই রমণীয়, ভারী স্নিগ্ধ ও নিস্তব্ধ।

আমরা মন্দিরে উঠে আসি। লিঙ্গমূর্তি দর্শন করি, প্রণাম করি।

রঞ্জনবাবু বলেন, "আগের মন্দির ভেঙে যাওয়ায়, হালে এই মন্দিরটি তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু এই লিঙ্গমূর্তিটি সুপ্রাচীন। মনে হয়, বহুকাল ধরেই এটি এখানে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।"

মন্দির দর্শন করে ব্রহ্মপুত্রের তীরে এসে দাঁড়াই। দৃশ্য যতই মনোহর হোক, ব্রহ্মপুত্রের অবস্থা কিন্তু ভাল নয়। অনেকটা জুড়ে চড়া পড়ে গেছে। চড়ার ওপরে কারা যেন সারি সারি কুঁড়েঘর বানিয়েছে। দেখতে ভারী খারাপ লাগছে। তবে কুঁড়েঘরের সারি ছাড়িয়ে নদীর বুকের দৃশ্যটি বড় সুন্দর। শত শত ডিঙ্গি নৌকো ভাসছে ব্রহ্মপুত্রের বুকে। ওরা মাছ ধরছে। দেখতে ভারী ভাল লাগছে।

ড্রাইভার এতক্ষণ ধরে আমাদের সঙ্গে রয়েছে। সে শুধু গাড়ি চালায় নি, আমাদের সঙ্গে সঙ্গে দর্শনও করেছে। কিন্তু কোন কথা বলে নি। এবারে ব্রহ্মপুত্রের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বলে ওঠে, "ওরা সবাই বাংলাদেশের মানুষ।"

"কারা?" গৌতম প্রশ্ন করে, "যারা মাছ ধরছে, তারা, না যারা কুঁড়েঘর বানিয়েছে?"

ড্রাইভার উত্তর দেয়, "যারা মাছ ধরছে, তারাই কুড়েঘর বানিয়ে চড়া দখল করেছে।"

"কিন্তু এ চড়াগুলো তো আমাদের!" গৌতম বিস্মিত।

"হলে কি হবে স্যার! সারা আসাম জুড়েই ব্রহ্মপুত্রের চড়ায় বাংলাদেশের মানুষ বসবাস করছে। তারা ব্রহ্মপুত্রে মাছ ধরে আসামের বাজারে বিক্রি করছে। শুধু গোয়ালপাড়া নয়, কামরূপ ও নওগা জেলাতেও প্রতিদিন বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ ঘটে চলেছে।"

"কেন আমাদের সীমান্তরক্ষী বাহিনী নেই?" গৌতম আবার বিস্মিত।

ড্রাইভার উত্তর দেয়, "আছেন, তবে তাঁরা বাধা দেন না।"

"কিন্তু এভাবে চললে অসমীয়ারাই যে আসামে সংখ্যালঘু হয়ে পড়বেন!"

"আমরা তাই আশঙ্কা করছি। কিন্তু ভারত সরকার নীরব দর্শক হয়ে রয়েছেন। অথচ এই বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ আসামের নিরাপত্তা ও সংহতি রক্ষার এক বিরাট সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে।"

রঞ্জনবাবু চুপ করে আছেন। তিনি স্থানীয় শাসক। তাঁর পক্ষে কোন মন্তব্য করা সমীচীন নয়। কারণ এই মহকুমায় অনুপ্রবেশ বন্ধ করার দায়িত্ব তাঁর। কিন্তু তিনি হুকুমের দাস। তাঁর হাত-পা বাঁধা। সুতরাং চুপ করে আছেন। আমিও চুপ করে থাকি।

পাগলার টেক্ থেকে জীপ ছুটে চলেছে লখিপুরের দিকে। গোয়ালপাড়া থেকে দূরত্ব ৩২ কিলোমিটারের মতো। আমি নীরবে ড্রাইভারের কথাগুলি ভেবে চলেছি।

ড্রাইভার হলেও লেখাপড়া জানা ভদ্রঘরের যুবক। বোধ করি কোন ভুল বলে নি সে। সত্যই বাংলাদেশ থেকে অবিরত অনুপ্রবেশ আসামের একটি সংকটজনক সমস্যা।

সমস্যাটা অবশ্য নতুন নয়। বৃটিশ আমল থেকেই আসাম এ সমস্যার সম্মুখীন হয়ে এসেছে। পূর্ববঙ্গ থেকে দলে দলে মানুষ এসে আসামে বাসা বেঁধেছে। কিন্তু তখন আসাম ছিল প্রকাণ্ড প্রদেশ, তাছাড়া আসামের জনসংখ্যাও ছিল কম। তারপরে দেশ বিভাগ হল। পূর্ব-পাকিস্তান থেকে লক্ষ লক্ষ সংখ্যালঘু প্রাণের মায়ায় আসামে পালিয়ে এলেন। স্বাধীনতার যূপকাষ্ঠে বলিপ্রদত্ত সেই সর্বহারা মানুষগুলোকে তখন আসাম আশ্রয় দিতে কার্পণ্য করে নি। এবং আজও কার্পণ্য করা উচিত নয়।

তারপরে পূর্ব-পাকিস্তান বাংলাদেশ হল। সেখান থেকে সংখ্যালঘু আগমন

বন্ধ হয়ে গেল। ইতিমধ্যে আমরা বৃটিশ আমলের আসামকে খণ্ড খণ্ড করে বিভিন্ন রাজ্যে বিভক্ত করেছি। বর্তমান আসাম প্রকৃত পক্ষে শুধুই ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা।

সংখ্যালঘু বাস্তুত্যাগীদের আগমন বন্ধ হলেও আসামে বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশ বন্ধ হয় নি। প্রতিদিন এই অনুপ্রবেশ ঘটেছে এবং ঘটছে। আর সরকারী প্রশাসন নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে চলেছেন।

স্বাভাবিক ভাবেই আসামের মানুষ এই অবস্থাকে মেনে নিতে পারছেন না। কারণ এখন এটি তাঁদের জীবন-মরণের সমস্যায় পর্যবসিত। তাছাড়া বাংলাদেশের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়কে কেনই বা তাঁরা আশ্রয় দেবেন? তাঁদের তো নিজেদের দেশ রয়েছে। সে দেশে তাঁরা সুখে থাকবেন বলেই তো কলকাতা নোয়াখালি ও বরিশালে দাঙ্গা বাঁধিয়েছেন, লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ মানুষকে তাঁদের পিতৃপুরুষের ভিটে থেকে ভারতে তাড়িয়ে দিয়েছেন।

অতএব তাঁদের ভারতে আসার কোন অধিকার নেই কারণ তাঁরা বিদেশী। এই বেআইনী অনুপ্রবেশ যেভাবেই হোক বন্ধ করতে হবে। কর্তৃপক্ষের অবিলম্বে এ ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

সকাল সওয়া দশটায় লখিপুর পৌঁছলাম—গোয়ালপাড়া মহকুমার একটি থানা-সদর। থানার আয়তন ৬৯৯·৩ বর্গ কিলোমিটার, জনসংখ্যা দু'লাখের মতো। বাড়ির সংখ্যা হাজার তিরিশেক। আমরা পাগলার টেক্ থেকে একটি সোজা পথে এখানে এসেছি। গোয়ালপাড়া থেকে মাত্র ৩২কিলোমিটার পথ আসতে হয়েছে। জীপগাড়ি, আমাদের তেমন অসুবিধে হয় নি। কিন্তু এ পথটা ভাল নয়। গোয়ালপাড়া থেকে বেলগুড়ি হয়ে লখিপুরের একটা পিচঢালা ভাল রাস্তা রয়েছে। সে পথের দূরত্ব ৪৮ কিলোমিটার।

লখিপুর ছোট হলেও প্রাচীন শহর। এখানে একটি ছোট ইন্‌সপেকশান বাংলা রয়েছে। সেখানে এসেই জীপ থামল। রঞ্জনবাবু আগেই খবর দিয়েছিলেন। সুতরাং সার্কেল অফিসার অমরেন্দ্রকুমার দে কয়েকজন স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিসহ আমাদের স্বাগত জানালেন।

ভেতরে এসে বসি। অমরেন্দ্রবাব সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। পরিচয় হয় প্রাক্তন জমিদার মণীন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর সঙ্গে। আসামের সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে লখিপুর চৌধুরী পরিবারের অবদান অসামান্য। মণীন্দ্রবাবুর কাকা নগেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী একজন সুসাহিত্যিক। তিনি অসম সাহিত্যসভার সভাপতি ছিলেন। মণীন্দ্রবাবু নিজেও একজন সুলেখক ও সমাজসেবী।

কথায় কথায় মণীন্দ্রবাবু বলেন, "আমাদের পরিবারের অরুণচন্দ্র চৌধুরী স্থানীয় ভাষায় রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' অনুবাদ করেছেন।"

"এখানকার স্থানীয় ভাষা কি অসমীয়া নয় ?" আমি প্রশ্ন করি।

একটু হেসে মণীন্দ্রবাবু উত্তর দেন, "না। আমাদের স্থানীয় ভাষা ও বাংলাদেশের রংপুর অঞ্চলের একই ভাষা।"

"তার মানে বাহেভাষা।" আমি বলে উঠি।

"আপনি জানেন দেখছি।" মণীন্দ্রবাবু আবার একটু হাসেন।

"আমি যে ছোটবেলায় রংপুরে ছিলাম।"

"তবে আমরা কিন্তু বাহেভাষা বলি না, কেউ বললে রেগে যাই। আমরা বলি, স্থানীয় ভাষা।"

বাংলাদেশের বাহেভাষা আসামের স্থানীয় ভাষা। রাজনীতি অখণ্ড ভারতবর্ষকে কি জঘন্যভাবে খণ্ড খণ্ড করেছে। ভাষা ও সংস্কৃতিকে কোন মূল্যই দেওয়া হয় নি।

এসেছেন লখিপুর হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের প্রাক্তন প্রিন্সিপ্যাল সুবোধ-চন্দ্র সেন। আমি আসছি শুনে বৃদ্ধ ভদ্রলোক অনেকখানি পথ হেঁটে দেখা করতে এসেছেন।

চা খেয়ে বেরিয়ে পড়া গেল। অমরেন্দ্রবাবু সঙ্গে চললেন। আমরা যে এখন তাঁরই অতিথি।

প্রথমে এলাম জয়ভূমের কামাখ্যা মন্দিরে। দর্শন করলাম অভয়া কালী-বাড়ি। বৈদিক মন্দির হলেও স্থানীয় রাভা উপজাতির মানুষরাই এ মন্দির রক্ষণাবেক্ষণ করেন।

তারপরে লখিপুরের শিবমন্দির দর্শন করে এলাম বুনবাসীর মন্দিরে। বুনবাসী মানে বনবাসী, একজন স্থানীয় লৌকিক দেবতা।

মন্দির দর্শন করে এলাম জমিদার বাড়িতে। বৃটিশ আমলে লখিপুরের জমিদার বংশ আসামে খুবই প্রভাবশালী পরিবার ছিলেন।

বাড়িটি বেশ বড় তবে ইটের তৈরি নয়। কাঠ বাঁশ মাটি আর টিন দিয়ে তৈরি। কাঠের খুঁটি, কাঠের মেঝে আর কাঠ দিয়ে চালের কাঠাম (ফ্রেম)। বাঁশের বেড়া দিয়ে চালের 'সিলিং' আর বেড়ার ওপরে মাটির প্রলেপ দিয়ে দেওয়াল। মনে পড়ছে রংপুরে আমাদের বাড়িটাও কাঠ বাঁশ আর টিন দিয়ে তৈরি ছিল। তার মানে শুধু ভাষা নয়, এখানকার বাড়ি-ঘরও উত্তরবঙ্গের মতো।

কিন্তু বাড়ি-ঘরের কথা ভাবার আর সময় পাই না। জনৈক মধ্যবয়সী ভদ্রলোক দু-হাত জড়ো করে কপালে ঠেকিয়ে বেরিয়ে আসেন বাড়ির ভেতর থেকে। সোচ্চার স্বরে বলে ওঠেন, "আসুন, আসুন। কি সৌভাগ্য আমাদের!"

গাড়ি থেকে নেমে আসি।

অমরেন্দ্রবাবু পরিচয় দেন, "নৃপেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী।"

আমরাও নমস্কার করি। পরিচয়ের পরে বাড়ির ভেতরে এসে বৈঠকখানায় বসি। ঘরের চার দেওয়ালেই কয়েকখানি অয়েল-পেইন্টিং। তাকিয়ে দেখবার মতো।

নৃপেনবাবু বলেন, "এগুলো সবই আমাদের পরিবারের শিল্পীরা এঁকেছেন। সাহিত্য ও শিল্পের প্রতি আমাদের পরিবারের আকর্ষণ পুরুষানুক্রমিক।"

"শুধু সাহিত্য ও কলাবিদ্যা নয়, চৌধুরী পরিবার শিক্ষানুরাগীও বটে।" রঞ্জনবাবু যোগ করেন। তিনি বলে চলেন, "গোয়ালপাড়া ও ধুবড়ী অঞ্চলে এঁরা বেশ কয়েকটি স্কুল করে দিয়েছেন। এঁদের প্রতিষ্ঠিত গোয়ালপাড়ার পি. আর হাইস্কুলের শতবার্ষিকী উৎসব হয়ে গিয়েছে। নৃপেনবাবুর পুত্রবধূ লখিপুর গার্লস হাইস্কুলের হেড মিস্ট্রেস্। নৃপেনবাবু নিজে ১৯১৮ সালে স্থাপিত লখিপুর ক্লাবের সভাপতি। ক্লাবের পাঠাগারে প্রচুর ভাল বাংলা বই আছে। ক্লাব প্রতিবছর অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসব পালন করেন।"

বাড়ির ভেতর থেকে চা-বিস্কুট আসে। চায়ে চুমুক দিতে দিতে নৃপেনবাবুর কাছ থেকে তাঁদের পরিবারের ইতিহাস শুনি, "গারো পাহাড়ের উত্তরাংশ লখিপুরের চৌধুরীদের জমিদারী ছিল, আমাদের জমিদারীর নাম হল—মেচপাড়া এস্টেট।"

"ময়মনসিংহের মহারাজাদেরও তো গারো পাহাড়ে জমিদারী ছিল?"

নৃপেনবাবু মাথা নাড়েন। বলেন, "তাঁদের ছিল গারো পাহাড়ের পূর্বাংশ আর পশ্চিমাংশ ছিল কড়াইবাড়ির চৌধুরীদের। কড়াইবাড়ি এস্টেটের প্রধান শহর মানকাচর।"

"কুমার প্রমথেশ বরুয়াদেরও তো গারো পাহাড়ে জমিদারী ছিল?" গৌতম জিজ্ঞেস করে।

নৃপেনবাবু মাথা নেড়ে বলেন, "না। তাঁদের জমিদারীর নাম গৌরীপুর এস্টেট। তাঁদের গারো পাহাড়ে জমিদারী ছিল না কিন্তু তাঁরা গারো

পাহাড়কে খুবই ভালবাসেন। কুমার প্রমথেশ তাঁর 'মুক্তি' ছবিতে প্রথম গারো পাহাড়ের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন, কুমার প্রকৃতিশ গারো পাহাড়ের মানুষদের জীবনকে নিরাপদ করতে প্রচুর পাগলা হাতি শিকার করেছেন। কুমার প্রকৃতিশ কিছুকাল এম· এল· এ· ছিলেন। তাঁর ডাকনাম লালজী। তিনি ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ হাতি শিকারী। তাঁর বড় মেয়ে শ্রীমতী প্রতিমা পাণ্ডে গোয়ালপাড়া লোকসঙ্গীতের একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী। আপনারা আশা করি জানেন যে গোয়ালপাড়া জেলার লোকসঙ্গীত আসামের একটি সর্বশ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক সম্পদ।"

একবার থামলেন নৃপেন্দ্রনারায়ণ। তারপরে আবার বলতে শুরু করেন, "আমার বাবা যতীন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ছিলেন লখিপুরের তিন আনার মালিক। বাকি তের আনার মালিক ছিলেন রবীন্দ্রনারায়ণ, চারুচন্দ্র, ভোলানাথ ও জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর বংশধরগণ। জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ ছিলেন বড় তরফ।··"

শুনতে ভালই লাগছিল। কিন্তু অনেক বেলা হল। অধ্যক্ষ দত্ত মজুমদারের বাড়িতে নেমন্তন্ন রয়েছে। তাঁরা নিশ্চয়ই আমাদের পথ চেয়ে বসে রয়েছেন। ভাগ্যিস স্নান করে বেরিয়েছি, সোজা সেখানে চলে যাওয়া যাবে। তাছাড়া আজ বিকেলেই আমরা তুরা চলে যাবো।

অতএব নৃপেনবাবু ও অমরবাবুর কাছ থেকে নিতে হয় বিদায়। রঞ্জনবাবুর সঙ্গে এসে গাড়িতে উঠি। গাড়ি ফিরে চলে গোয়ালপাড়ায়।

রওনা দিতে বিকেল চারটে বেজে গেল। তাহলেও বলব দেরি করি নি মোটেই। অধ্যক্ষ দত্ত মজুমদারের বাড়িতে পৌঁছতেই তো দুটো বেজে গিয়েছে। খাওয়া-দাওয়া সারতে প্রায় ঘণ্টাখানেক লেগেছে। তারপরে আবার সার্কিট হাউসে আসার পথে যূথিকার মামাবাড়িতে নামতে হয়েছে একবার। কাল রাতে ওর মামাতো ভাইকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। না নেমে উপায় ছিল না। তবে বসতে পারি নি। শুধুই দেখা করে চলে এসেছি।

অতএব দেরি করি নি মোটেই। তবু চারটে বেজে গেল। রঞ্জনবাবু অবশ্য বলেছেন, আটটার আগেই পৌঁছে যাবো। এবং সেখানে সব ব্যবস্থা করা আছে, কোন অসুবিধে হবে না।

রঞ্জনবাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রওনা হওয়া গেল। আমরা রওনা হলাম মায়াময় মেঘালয়ের মধুরভূমি গারো পাহাড়ে, সুন্দরী সোমেশ্বরী বিধৌত

বনভূমি গারো পাহাড়ে, আকাশে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে থাকা গারো পাহাড়ে।

আমরা মানে কেবল আমি গৌতম ও জীপ-ড্রাইভার অমল ডেকা নয়, আমাদের সঙ্গে আরও তুজন মানুষ রয়েছে। একজন ড্রাইভারের সহকারী ধজেন রাখা, আরেকজন এস. ডি. ও. অফিসের উদয়প্রসাদ রায়। পাছে আমার কোন অসুবিধে হয়, তাই রঞ্জনবাবু উদয়বাবুকে সঙ্গে দিয়েছেন।

গোয়ালপাড়া থেকে তুরা চলেছি। গারো পাহাড়ের প্রাণকেন্দ্র তুরা। তুরা গারো পাহাড়ের একমাত্র শহর। কয়েক বছর আগেও গারো পাহাড় একটা জেলা ছিল। তখন তুরা ছিল গারো পাহাড়ের সদর। ইদানীং গারো পাহাড়কে ভাগ করে তুটি জেলা করা হয়েছে। দ্বিতীয় জেলাসদরের নাম উইলিয়াম নগর। শহরটি সবে গড়ে উঠছে। সুতরাং উইলিয়াম নগরের কথা থাক, তুরার কথা হোক। আমরা যে সেখানেই চলেছি।

আগেই বলেছি, আমরা বিকেল চারটে নাগাদ গোয়ালপাড়া থেকে রওনা হয়েছি। কয়েক মিনিটের মধ্যেই শহর ছাড়িয়ে জাতীয় সড়কে পড়েছি। সেই সড়ক ধরে এতক্ষণ চলে এই মাত্র এসে পৌঁছলাম আগিয়া। তার মানে আমরা গোয়ালপাড়া থেকে চৌদ্দ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিলাম। এখন বিকেল সাড়ে চারটে।

জাতীয় সড়ক অর্থাৎ গৌহাটির পথ ছেড়ে এবারে বেলগুড়ির বনময় পথ ধরা গেল। পথের পাশে গভীর বন আর বহুদূরে পাহাড়ের রেখা। গৌতমের প্রশ্নের উত্তরে অমল জানায়—ওটাই গারো পাহাড়।

মিনিট দশেক বাদে আরেকটি লোকালয় এল, নাম—পৈকান। এখান থেকে শুরু হল আঁকাবাঁকা বনময় চড়াই পথ। নবনির্মিত এই পথের নাম "হিল" রোড। এটি আসাম থেকে মেঘালয়ে যাবার সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত পথ। পাহাড়টা ক্রমেই কাছে আসছে।

আরও প্রায় আধঘণ্টা চলার পরে বিরুবাড়ি গ্রাম। এবারে থামতে হল। কারণ সামনে সরকারী চেক-পোস্ট। পথের ওপর রেলওয়ে লেভেল ক্রসিংয়ের অনুকরণে শালবল্লীর গেট। ওপাশে সাইনবোর্ড—

'BAJEENG DOBA OUTPOST, GARO HILLS.'

তার মানে এই বিরুবাড়ি আসামের সীমান্ত। এবারে আমরা মেঘালয়ে প্রবেশ করব, গারো পাহাড়ের মাটি স্পর্শ করব।

সরকারী জীপ। সুতরাং কোন তল্লাসী হল না। আমরা গারো পাহাড়-

জেলায় প্রবেশ করলাম। আবার মায়াময় মেঘালয়ে এলাম। আমার বহুদিনের বাসনা পূর্ণ হল।

সামনে পাহাড়। এটি তরাই অঞ্চল। এখান থেকে তুরা ৬৯ কিলোমিটার।

সাড়ে পাঁচটা নাগাদ বারি পৌঁছলাম। বেশ বড় গ্রাম। পথের পাশে বাজার—মুদি মনোহারী জামা-কাপড়, চা ও মিষ্টির দোকান। বলা বাহুল্য, পান-সুপারির দোকানও রয়েছে। গারোরাও খাসিদের মতো পান ভালবাসেন। কিন্তু এ-পথে খাসিয়া পাহাড়ের মতো সুপারির সৌন্দর্য চোখে পড়ছে না। সুপারি গাছ রয়েছে, তবে খুবই কম।

বারি বাজারে চা খেয়ে নিয়ে আবার রওনা হওয়া গেল। আর তারপরেই শুরু হল পাহাড়। আঁকাবাঁকা চড়াই পথ। পথের একদিকে পাহাড়, আরেক-দিকে খাদ। আমরা পাহাড়ে উঠছি—গারো পাহাড়।

পাহাড়ে পাথর কম, মাটি বেশি—লাল মাটি। বনময় পাহাড়, প্রচুর বাঁশ-বন আর কলাগাছ।

পথ কিন্তু খারাপ নয়। বেশ জোরে জীপ চলেছে। তবে মাঝে-মাঝেই ছোট বড় ঝরণার ওপরে কাঠের পুল। তখন গাড়ির গতি কমাতে হচ্ছে।

কোথাও কোথাও সমতল—অনেকটা উপত্যকার মতো। সেখানে ক্ষেত-খামার বাড়ি-ঘর। নারী-পুরুষ ও শিশুর দল আসা-যাওয়া করছে। তবে পথের পাশে পাহাড়ই বেশি। কোন কোন পাহাড়ে আগুন লাগিয়ে জুম চাষের জমি তৈরি করা হচ্ছে। গৌতম আগুন দেখে অবাক হয়। ড্রাইভার তাকে জুম চাষের পদ্ধতিটা বুঝিয়ে দেয়।

ড্রাইভার অসমীয়া কিন্তু বাংলাতেই কথা বলছে। গোয়ালপাড়াতে সবাই বাংলা বলতে পারেন। আর এ কথা কেবল গোয়ালপাড়ায় প্রযোজ্য নয়, সমস্ত উত্তর-পূর্ব ভারতের পক্ষেই সমান সত্য। আসাম মেঘালয় মিজোরাম মণিপুর নাগাল্যাণ্ড ও অরুণাচলের প্রায় সব শিক্ষিত মানুষ বাংলা বলতে পারেন। তবু বিচ্ছেদপন্থীদের প্ররোচনার বিরাম নেই।

আমরা আনোগিরি এলাম। এখানে বন-বিভাগের রেঞ্জ অফিস ও নির্মাণ বিভাগের বিশ্রাম ভবন রয়েছে।

লোকালয় ছাড়িয়েই চারটি পথের সঙ্গম। একটি আমাদের এই পথ, আর তিনটি পথ গিয়েছে রংগ্রাম, গাবিল ও তুরা। এখান থেকে তুরা ৪৪ কিলো-মিটার, রংগ্রাম ও গাবিল যথাক্রমে ২৮ ও ১৩ কিলোমিটার। আবার তুরার

পথেও রংগ্রাম যাওয়া যায় অথবা আমরা রংগ্রামের পথটি দিয়েও তুরা যেতে পারি।

গৌতম হঠাৎ বলে বসল, "জায়গাটার একটা ছবি নেব।"

অতএব ড্রাইভার গাড়ি থামায়। গৌতম নেমে গিয়ে ছবি তোলে। তারপরে গাড়ি আবার এগিয়ে চলে।

সাড়ে ছ'টার সময় আমরা জেঙ্গাল বাজারে এলাম। গোধূলি ঘনিয়ে এসেছে। পাহাড় কালো হচ্ছে, সমতল ধূসর হচ্ছে। আঁধার নেমে আসছে মাটিতে—গারো পাহাড়ে।

আবার একটি পথের সঙ্গম। এখানে পাঁচটি পথ—পাঁচ মাথার মোড় একটি আমাদের এই পথ, অপর চারটি উইলিয়াম নগর, সঙসাক, রঙজেং ও তুরার পথ। উইলিয়াম নগর এখান থেকে ৫৭ আর তুরা মাত্র ১৯ কিলোমিটার। তার মানে আমরা প্রায় এসে গিয়েছি। কিন্তু তার আগেই আকাশে চাঁদ উঠবে। কালো পাহাড় আলোময় হবে, ধূসর মাটি রুপোলী হবে—মধুর গারো পাহাড় স্বপ্নময় হয়ে উঠবে। আমি তার প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে থাকি।

না। কেবল প্রতীক্ষায় থেকে সময় নষ্ট করা কেন? তার চেয়ে এই অবসরে উদয়বাবুর কাছে গারো জাতির কথা শোনা যাক। আমার প্রস্তাবে তিনি আপত্তি করেন না। একটু ভেবে নিয়ে বলতে শুরু করেন—

"গারোদের চেহারা কাছাড়ী ও কোচ উপজাতির মানুষদের মতো, তবে কোচদের সঙ্গেই মিল বেশি। গারোরা খুব লম্বা নয় কিন্তু বেশ স্বাস্থ্যবান। তাঁরা কর্মঠ এবং খুবই কষ্টসহিষ্ণু। তাঁদের নাক বড়, কান লম্বা, ঠোঁট মোটা ও দাড়ি-গোঁফ কম। গারোদের গায়ের রং তামাটে কালো, তাঁরা দেখতে সুশ্রী নন।

আগে মেয়ে-পুরুষ সকলেই মাথায় লম্বা লম্বা চুল রাখতেন, ছেলেরাও চুল-দাড়ি কাটতেন না। অবশ্য অধিকাংশ গারোদের দাড়ি এত কম যে না কাটলেও কোন অসুবিধে হয় না। এখন শহরবাসী ও শিক্ষিত গারো ছেলেরা আমাদের মতই দাড়ি কামান, চুল ছাটেন। তবে গ্রামাঞ্চলে তেমন চুল ছাঁটার প্রচলন হয় নি। ফলে ছেলেরাও চুল-দাড়ি রাখেন। তাঁরা চুলগুলো ঝুঁটি বেঁধে রাখেন। অনেকে আবার পাগড়ীর নিচে চুল লুকিয়ে রাখেন। আগে তো গারো পাহাড়ে পাগড়ীর খুবই প্রচলন ছিল। এখনও অনেকে মাথায় পাগড়ী বাঁধেন।

সাহসী ও সত্যবাদী বলে গারোদের যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। তাঁরা শান্ত

কিন্তু কোন কারণে রেগে গেলে অত্যন্ত নিষ্ঠুর হয়ে ওঠেন। এঁরা প্রতিহিংসা-পরায়ণও বটে।

এখনও গারো পাহাড়ের মানুষরা গয়না পরতে ভালোবাসেন। অনেক পুরুষদের কানে পেতলের মাকড়ি ও গলায় পুঁতির মালা দেখতে পাবেন। সবচেয়ে মজা পাবেন যখন দেখবেন গলায় মালা পরে শীতের মধ্যে খালি গায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

"সে কি!" গৌতম প্রশ্ন করে।

"হ্যাঁ।" উদয়বাবু উত্তর দেন। বলেন, "কেন জানেন?"

"কেন?"

হাসতে হাসতে উদয়বাবু বলেন, "মালা তো পরলেই চলবে না, সবাইকে দেখাতে হবে না! মালা দেখাবার জন্য যদি একটু শীত লাগে, লাগুক না।"

থামেন উদয়বাবু। একটু হেসে আবার বলতে থাকেন, "গারো মেয়েরা এত ভারী দুল পরে যে অনেক সময়েই কান ছিঁড়ে যায়। তখন তারা কাটা কানের সঙ্গে দুলের মালা বেঁধে রাখে। ছেলে-মেয়েরা সকলেই জামা-কাপড়ে কড়ি সেলাই করে নেয়। গারো মেয়েরা কড়ির গয়নাও পরে। হাতে উল্কী আঁকার নিয়ম গারো পাহাড়ে বহুল প্রচলিত।

আগে গারোদের মধ্যে পশুপালনের প্রথা প্রায় ছিল না বলা চলে। এখন অবশ্য সমস্ত গৃহপালিত পশুপালনের প্রচলন হয়েছে। তবে পশু সম্পদে গারো পাহাড় এখনও নিতান্তই দরিদ্র।

লোকালয় এবং আবাদী অঞ্চল ছাড়া গোটা গারো পাহাড়ই বনময়—ঘন চিরহরিৎ বন। আগে গারো পাহাড়ের বনে বাঘ চিতা ভালুক হরিণ ও অসংখ্য হাতি ছিল। এখন বন্যপ্রাণী খুবই কমে গিয়েছে, তাহলেও কিছু রয়েছে।

প্রাকৃতিক কারণেই গারোরা শিকারী জাতি। গর্তের ফাঁদ পেতে হাতি ধরায় এঁরা খুবই পটু। আগে তাঁরা প্রায় সব পশু-পাখির মাংস খেতেন। এখন ওঁদের খাওয়ায় অনেক বাছবিচার হয়েছে। তাহলেও ওঁরা এমন অনেক পশুপাখির মাংস খান, যা খাবার কথা আমরা ভাবতেই পারি না।

সেকালের মতো একালেও গারো শ্রমিকরা মালবহনে পটু রয়েছেন। এঁরা দেড়মণ পর্যন্ত তুলা লঙ্কা মোম গালা অথবা কাঠের বোঝা নিয়ে চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে অনায়াসে মাইলের পর মাইল পথ চলে। আগে ওঁরা এইসব বোঝা নিয়ে ময়মনসিংহ সীমান্তে গিয়ে বিনিময় করতেন—তেল নুন চিনি জামা-

কাপড় বাসনপত্র চাষের যন্ত্রপাতি কিম্বা বর্শা বল্লম প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে আসতেন। ভারত স্বাধীন হবার পর থেকে বাংলার সঙ্গে গারো পাহাড়ের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘুচে গিয়েছে।

পাঁচ

গতকাল সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় আমরা তুরা পৌঁচেছি। ছোট একটি পাহাড়ী শহর। অবস্থান ২৫° ৩০′ উত্তর অক্ষরেখা ও ৯০° ১৫′ পূর্ব দ্রাঘিমায়।

রঞ্জনবাবু রেডিওগ্রাম পাঠিয়ে আমাদের জন্য ইন্‌সপেক্‌শান বাংলোতে ঘর ঠিক করে রেখেছিলেন। অতএব অসুবিধে হয় নি। হবার কথাও নয়, কারণ এখানেও আমরা আসামের অর্থসচিব দিলীপ গঙ্গোপাধ্যায়ের অতিথি। তাই অ্যাসিস্টাণ্ট ডেপুটি কমিশনার শ্রীঅরোরা ধরণীবাবুকে আমাদের দেখা-শোনার দায়িত্ব দিয়েছেন।

ধরণীবাবুর পুরো নাম ধরণীকান্ত চৌধুরী, এখানকার ইণ্ডাস্ট্রীজ সেণ্টারের জেনারেল ম্যানেজার। তিনি কাল রাতেই বাংলোয় এসে সব ব্যবস্থা করে গিয়েছেন।

ধরনীবাবু সাহিত্য-সুরসিক। তিনি আমার 'অমরাবতী আসাম' ও 'মায়াময় মেঘালয়' (খাসি পাহাড় পর্ব) পড়েছেন। সুতরাং আদর যত্নের কোন অভাব হয় নি। খাওয়া-দাওয়ার পরে রাতে বেশ ভাল ঘুম হয়েছে।

সহযোগী কৌমুদীকান্ত দত্ত এবং অধ্যাপক পরিমলচন্দ্র করকে নিয়ে ধরণীবাবু আজ সকালেই বাংলোয় এসে হাজির হয়েছেন। পরিমলবাবু একজন গারো বিশেষজ্ঞ। তাঁর লেখা 'British Annexation of Garo Hills' বইখানি পণ্ডিতসমাজে বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেছে।

ওঁদের বসতে বলে চায়ের ফরমাস করি। একটু বাদে উদয়বাবু আসেন। বলেন, "আমি কাল রাতেই অরোরাসাহেবের সঙ্গে দেখা করে সাহেবের চিঠি দিয়েছি। তিনি আজ সকালে আপনাদের চায়ের নেমন্তন্ন করেছেন। বলেছেন, তিনি আপনার গারো পাহাড় দেখার সব ব্যবস্থা করে দেবেন। এবারে আমরা বিদায় নেব স্যার!"

"আপনারা চা খেয়ে নিয়েছেন?"

"হ্যাঁ।" উদয়বাবু নমস্কার করেন।

ধরনীবাবুদের কাছ থেকে একটু ছুটি নিয়ে আমি ও গৌতম উদয়বাবুর সঙ্গে বেরিয়ে আসি ঘর থেকে। ড্রাইভার অমল ডেকা ও তার সহকারী ধজেন রাখা একেবারে তৈরি হয়ে গাড়িতে উঠে বসেছিল। আমাদের দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি নেমে আসে। বিদায় নেয় আমাদের কাছ থেকে। তারপরে উদয়বাবুকে নিয়ে আবার গাড়িতে চড়ে। গাড়ি গর্জে ওঠে, চলতে শুরু করে, বড রাস্তায় উঠে অদৃশ্য হয়ে যায়। আমরা ফিরে আসি ঘরে।

ফিরে এসে আলাপ করি পরিমলবাবুর সঙ্গে। পণ্ডিত ও পরিশ্রমী মানুষ। কর্মভূমি গারো পাহাড়ের হারিয়ে যাওয়া ইতিহাসকে আবিষ্কার করার জন্য কঠোর সাধনায় ব্রতী রয়েছেন। অথচ ভদ্রলোক ভারী বিনয়ী। ভাল লাগে আমার।

ওরা কিন্তু চা খেতে রাজী হলেন না। পরিমলবাবু বললেন, "মি· অরোরা তো আপনাকে চায়ের নেমন্তন্ন করেছেন। আপনার সঙ্গে যখন যাচ্ছি, তখন আমরাও চা পেয়ে যাবো। অতএব এখানে আর হাঙ্গামা করা কেন? তার চাইতে চলুন, তাড়াতাড়ি যাওয়া যাক।"

তাই করি। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে আমি ও গৌতম ওঁদের সঙ্গে বেরিয়ে আসি সার্কিট হাউস থেকে।

বড়রাস্তা ধরে খানিকটা ডাইনে এগিয়ে বাঁদিকের চড়াই পথ ধরি। পথটা সামনের পাহাড়টায় উঠে গেছে। চওড়া বেশি নয়। কিন্তু গাড়ি চলাচলের উপযোগী। সুতরাং চড়াই ভাঙতে কোন কষ্ট হচ্ছে না।

কয়েক মিনিট হেঁটে এসে পৌঁছই পাহাড়টির ওপরে, একফালি সমতলে। এখানেই শ্রীঅরোরার বাংলো। সামনে ফুলের বাগান। আমরা এসে ড্রয়িংরুমে বসি। খবর পেয়ে শ্রীঅরোরা ছুটে আসেন। নবীন আই· এ· এস·। ট্রেনিং-এর পরে এখানেই প্রথম পোস্টিং পেয়েছেন। ডেপুটি কমিশনার ছুটিতে গেছেন। অতএব এখন তিনিই এ জেলার সর্বময় কর্তা।

আলাপ করে ভাল লাগে আমার। কথায় কথায় জানতে পারি আমার অনুজপ্রতিম বন্ধু নিখিলেশ দাস তার 'ব্যাচ্-মেট'। নিখিলেশ এখন দুর্গাপুরের এস· ডি· ও·।

একটু বাদেই একজন বেয়ারা নিয়ে মিসেস অরোরা ঘরে আসেন। খাবার ও চায়ের সরঞ্জাম টেবিলে রেখে মিসেস আমাদের নমস্কার করেন। আমি প্রতি-নমস্কার করে বসতে বলি।

তিনি কিন্তু বসেন না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই আমাদের খাবারের প্লেট সাজান, পরিবেশন করেন। চা তৈরি করে কাপে ঢালেন। প্রত্যেকের সামনে চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে চিনি মিশিয়ে নিতে বলেন।

নবীন আই· এ· এস· অফিসারের স্ত্রী। সুতরাং সুন্দরী শিক্ষিতা এবং 'স্মার্ট' তো হবেই। অবাক হচ্ছি মেয়েটির বিনম্র ব্যবহার দেখে।

সবাইকে চা পরিবেশন করে নিজে এককাপ চা নিয়ে মিসেস একখানি চেয়ারে বসলেন। অধ্যাপক কর তাঁর কাছে আমার পরিচয় দেন।

মেয়েটি আবার নমস্কার করেন আমাকে। তারপরে বলেন, "আপনি তো বাংলায় বই লিখবেন, গারো পাহাড়ের ওপর?"

মাথা নেড়ে বলি, "হ্যাঁ।"

"তাহলে আর আমার কি লাভ?"

হেসে বলি, "আমার তো বই লিখতে দেরি হবে। এর মধ্যে আপনি মিঃ চৌধুরী এবং প্রফেসার করের কাছে বাংলাটা শিখে নিতে পারেন।"

"এ ভেরী গুড্ সাজেশ্চন।" মিঃ অরোরা বলে ওঠেন। "তাহলে তুমি আমাকেও বইখানি পড়িয়ে শোনাতে পারবে।"

"কিন্তু মিঃ চৌধুরী ও প্রফেসর কর কি সময় পাবেন আমাকে বাংলা শেখাতে?"

"তা না পারার কি আছে?" অধ্যাপক বলেন, "সপ্তাহে দু'দিন ঘণ্টাখানেক সময় না পাবার মতো ব্যস্ত মানুষ আমি নই। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে বই। ইংরেজীতে লেখা বাংলা শেখার বই পেলে ভাল হয়। কিন্তু সে বই তো এখানে পাওয়া যাবে না।"

"কোলকাতায় নিশ্চয়ই পাওয়া যায়?" মিসেস জিজ্ঞেস করেন।

উত্তর দিই, "তা পাওয়া যাবে বৈকি!"

"তাহলে আপনি কলকাতায় ফিরে গিয়ে আমাকে একখানি বই পাঠিয়ে দেবেন।" বিনা প্রস্তাবনায় মেয়েটি আমাকে অনুরোধ করেন।

ওঁর সারল্যে মুগ্ধ হই। হাসতে হাসতে মিঃ অরোরা বলে ওঠেন, "নিন, বই লেখার খেসারত দিন।"

"সানন্দে।" আমি বলি, "কলকাতায় ফিরে গিয়েই আপনাকে বই পাঠিয়ে দেব।"

"ধন্যবাদ।"

টেলিফোন বেজে ওঠে। মিঃ অরোরা রিসিভার তুলে কথা বলতে থাকেন।

কিছুক্ষণ বাদে কানে আসে—কলকাতা থেকে একজন লেখক এসেছেন, তিনি গারো পাহাড়ের ওপর বাংলায় একখানি বই লিখবেন।...

অপর পক্ষ কে জানি না, তাঁর কথাও শুনতে পাচ্ছি না। আমরা টেলিফোন শেষ হবার প্রতীক্ষায় থাকি।

কিন্তু টেলিফোন শেষ হয় না। কথা শেষ করেও রিসিভার নামিয়ে রাখলেন না মিঃ অরোরা। রিসিভারটা হাতে ধরে আমাকে বললেন, "উইলিয়াম নগরের ডেপুটি কমিশনার মিঃ নাগরাজন আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন।"

উঠে গিয়ে রিসিভার হাতে নিয়ে বলি, "হ্যালো!"

"হ্যালো! গুড মর্ণিং। আমি উইলিয়াম নগরের ডি· সি· নাগরাজন বলছি।"

আমিও নিজের পরিচয় দিই। তারপরে মিঃ নাগরাজন বলেন, "আপনি গারো পাহাড়ের ওপরে বই লিখবেন শুনে ভারী খুশি হ'লাম। কিন্তু আপনি তো জানেন আমার জেলা উইলিয়াম নগর গারো পাহাড়ের একটা অংশ।"

"জানি।"

"তাহলে উইলিয়ম নগর না এসে আপনি গারো পাহাড়ের ওপরে বই লিখবেন কেমন করে?"

"আসতে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু আসব কেমন করে?"

"সে দায়িত্ব আমার। আপনি বলুন সময় আছে কিনা?"

"আছে।"

"বেশ। তাহলে তরশু দুপুরে তুরাতে একটা সভা আছে, আমি আসছি। সেদিনই বিকেলে ফিরব। আপনাকে সঙ্গে নিয়ে আসব।"

"আমার সঙ্গে ছেলে রয়েছে।"

"বেশ তো, সেও আসবে। তাকে আমার নিমন্ত্রণ জানাবেন।"

নমস্কার বিনিময়ের পর টেলিফোন ছেড়ে দিই। সবাইকে বলি কথাটা। ওঁরা খুশি হন। কিন্তু আমি ভাবি অন্য কথা—মিঃ নাগরাজন বাংলা জানেন না। তাছাড়া এঁদের বদলীর চাকরি। আমার বই যখন প্রকাশিত হবে, তখন এঁদের গারো পাহাড়ে না থাকার সম্ভাবনাই বেশি। তবু এ ব্যাপারে এঁদের কি আন্তরিক উৎসাহ। তাছাড়া আমিও ভাগ্যবান এমন উৎসাহী প্রশাসকদের সঙ্গে পরিচয় হল। এবং আমি পশ্চিম গারো পাহাড় জেলার সদর উইলিয়াম নগরে যেতে পারছি।

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তার পরে মিস্টার ও মিসেস অরোরার কাছ থেকে

বিদায় নিয়ে নেমে আসি নিচে। উৎরাই পথ বেয়ে বড় রাস্তায় আসি। এটাই গারো পাহাড়ের প্রধান পথ—ট্রাঙ্ক রোড, বাংলাদেশ সীমান্ত ডালু পর্যন্ত প্রসারিত। আগে এই পথেই বাংলার সঙ্গে গারো পাহাড়ের প্রধান যোগাযোগ ছিল। ময়মনসিংহ থেকে রেলে সিংঘানি এসে ব্রহ্মপুত্র পেরিয়ে জামালপুর। সেখান থেকে বাস-এ তুরা। এখন স্বাধীন দেশ। সুতরাং সোজাপথে আসার উপায় নেই।

তুরা থেকে ডালু ৫১, মানকাচর ৫২ ও ফুলবাড়ি ৮৬ কিলোমিটার। তুরা থেকে ৩৪ কিলোমিটার দূরে গারোবাঁধা। সেখান থেকে ১৮ কিলোমিটার দূরে আসামের মানকাচর। এটিও একটি সীমান্ত।

আমরা যেখানে এসে দাঁড়িয়েছি, সেখানে বড় রাস্তাটি তিন দিকে প্রসারিত উত্তরে রংগ্রাম ও ফুলবাড়ি হয়ে গোয়ালপাড়া, পুবে মানকাচর ও দক্ষিণে দারেংগিরি হয়ে ডালুর পথ। পথের সঙ্গমে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শহীদ বেদি। আমরা কাছে আসি। বেদির গায়ে একখানি পেতলের প্লেটের ওপরে লেখা—'

'In memory of the Men of
The 69th & 8th Garo Labour Companies
Who Died At France
For Their King Emperor'

তা বটে, সেকালে রাজার জন্য প্রজা প্রাণ দিয়েছে আর একালে নেতার জন্য দেশপ্রেমিক মৃত্যুবরণ করছে। এ মৃত্যু অপমৃত্যু হলেও গৌরবের। বৃটিশরা অকৃতজ্ঞ নন, তাঁরা শহীদবেদি তৈরি করে রেখে গিয়েছেন! আমরা করছি না কারণ ওসব সাম্রাজ্যবাদী 'সেন্টিমেন্ট' আমাদের নেই। আর তাই 'দেশ এগিয়ে চলেছে।'

শহীদবেদি দেখে ডানদিকে এগিয়ে চলি। চলতে চলতে ভাবি—উচ্চতা কম কিন্তু তুরাকে হিমালয়ের যে কোন ছোট শৈলনগরীর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। তেমনি চড়াই-উৎরাই আঁকা-বাঁকা পথ। তেমনি সারি-সারি বাড়ি-ঘর। কোথাও খাড়া পাহাড় আর কোথাও বা সুন্দর সমতল। একদিকে অনেকটা উঁচুতে তুরা পাহাড়ের সবুজ শিখর, আরেক দিকে খানিকটা নিচুতে গারো পাহাড়ের সবুজ বন।

পথটা বাঁয়ে বেঁকে আবার ডাইনে ফিরেছে। সেখানে পাহাড়ী নালার ওপরে একটা পুল। এই নালাটাই আমাদের বাংলার পেছনে প্রবাহিত—

পাশের পাহাড় থেকে নেমে এসেছে।

পুল পেরিয়ে তুরা সিভিল হাসপাতাল। তারপরে নির্মাণ বিভাগের অফিস, সিনেমা হল ও জেলা গ্রন্থাগার। এখন বন্ধ। আগামীকাল এসে এখানে কিছুক্ষণ কাটিয়ে যেতে হবে।

গ্রন্থাগারের পরেই তে-মাথার মোড়। ডানদিকে পৈকান-এর সেই পাহাড়ী পথ। ধরণীবাবু বলেন, "এই পথেই আপনারা এসেছেন। কিন্তু কাল রাত বলে খেয়াল করেন নি। আজ কিছুদূর এগিয়ে গেলে দেখতে পাবেন ব্যাপ্টিস্ট মিশন ও হাসপাতাল। তারপরে চাঁদমারি বাজার। আরও খানিকটা এগিয়ে একটা পাহাড়ের ওপরে 'মাল্‌টি পারপাস' স্কুল আর সবার শেষে ক্যাথলিক চার্চ ও ডন ভস্‌কো স্কুল।"

"আমরা দেখব না ?" গৌতম জিজ্ঞেস করে।

"হ্যাঁ। আমার গাড়ি করে দেখিয়ে আনব সব।" ধরণীবাবু গৌতমকে আশ্বস্ত করেন।

আমরা মূল পথ ধরে এগিয়ে চলি। পরিমলবাবু বলেন—এটাই ফুলবাড়ির পথ। এখানে এর নাম হাওয়াখানা রোড। এই পথের ওপরেই নূতন নগরী তৈরি হচ্ছে। কয়েক বছর বাদে সব সরকারী অফিস সেখানে উঠে যাবে।

ইতিমধ্যে প্রায় এক কিলোমিটার এগিয়ে এসেছি। ডানদিকে একটা মোটর পথ উঁচুতে উঠে গিয়েছে। সেখানে বেশ বড় বড় বাড়ি দেখতে পাচ্ছি। ধরণীবাবু বলেন—ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের অফিস। গারো পাহাড়ের প্রশাসনে তাঁদের প্রভূত কর্তব্য ও ক্ষমতা রয়েছে। ডেপুটি কমিশনার তাঁদের মতামতের বিশেষ মূল্য দিয়ে থাকেন।

ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল ছাড়িয়ে কয়েক পা এগিয়ে এসেছি। পথের পাশে খানিকটা নিচে একখানি বাড়ি দেখিয়ে পরিমলবাবু বলেন, "ওটাই আমার বাড়ি। চলুন, একবার পায়ের ধুলো দেবেন। এক কাপ চা খেয়েই চলে যাবেন, বেশিক্ষণ আটকে রাখব না। আপনার সঙ্গে আলাপ করার জন্য আমার কয়েকজন বন্ধু বসে রয়েছেন।"

অতএব পথ থেকে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসি পরিমলবাবুর বাড়িতে। তাঁর ছোটভাই আমাদের বসার ঘরে নিয়ে আসেন। শুনেছি এ ভদ্রলোক গারো ভাষা খুব ভাল জানেন এবং তিনি একজন প্রথম সারির গারো কবি ও লেখক। তাই তাঁর সঙ্গে আমার অনেক দরকার।

কিন্তু এখন কোন আলোচনার অবকাশ নেই। পরিমলবাবুর বন্ধুরা বসে

রয়েছেন। আগে তাঁদের সঙ্গে আলাপ করা দরকার। পরিচয় হয় ইংরেজীর অধ্যাপক রামানন্দ ভট্টাচার্য ও বাংলার অধ্যাপক রঞ্জিত গোস্বামীর সঙ্গে। পরিচয় হয় ডাঃ এ. পাল. চৌধুরী, বকুল পাল ও অক্ষয়কুমার মহান্তের সঙ্গে। অক্ষয়বাবু ডেপুটি কমিশনার অফিসের হেড ক্লার্ক।

অক্ষয়বাবুর সঙ্গে বাংলোয় ফিরে চলি। যে-পথে এসেছি, সে-পথে কিন্তু ফিরছি না। চলেছি নিচের রাস্তা ধরে। এ রাস্তাটির নাম ওয়াকার রোড। ওয়াকার নামে জনৈক বৃটিশ ডেপুটি কমিশনার রাস্তাটি নির্মাণ করেছেন।

গতকাল রাতে উদয়বাবুদের সঙ্গে একটা হোটেলে খেয়ে নিয়েছিলাম। আজ সকালে ওরা গোয়ালপাড়া ফিরে গিয়েছে। আজ থেকে আমরা মাত্র দু'জন। তাই বাংলোর চৌকিদার আমাদের রান্না করছে। ভালই রেঁধেছে।

অক্ষয়বাবু দেখতে পাচ্ছি সময় সম্পর্কে খুবই সচেতন। ঠিক আড়াইটের সময় এসে হাজির হলেন। পরিমলবাবুর বাড়িতে বসে কথা দিয়েছিলাম— তিনটের সময় তাঁর অফিসে যাব।

অতএব আবার সেই পথ—গারো পাহাড়ের পথ। এবারে আমরা বাঁয়ে অর্থাৎ বাজারের দিকে চলেছি। সার্কিট হাউস ছাড়িয়েই রাস্তার বাঁদিকে তুরা শিখরের পথ। শিখর বেশ দূরে, অনেকটা চড়াই ভাঙতে হয়। ওখান থেকে গারো পাহাড়ের দৃশ্য নাকি বড়ই রমণীয়।

এখন শিখরারোহণের সময় নয়, তবু সেই পথে এগিয়ে চলি। একটু ওপরে উঠে বাঁদিকে ডেপুটি কমিশনারের বাংলো, ডানদিকে তুরা পার্কের প্রবেশ-তোরণ।

পার্কে প্রবেশ করি। এটি শুধু পার্ক নয়,সেই সঙ্গে 'মিনি জু'—ছোট চিড়িয়াখানা। ছোট মানে খুবই ছোট। একটি বাঘ, কয়েকটি হরিণ বানর সাপ আর বনছাগল নিয়ে চিড়িয়াখানা। আমরা তাই দেখি এবং দেখে ভাল লাগে আমাদের। যেমন সুন্দর অবস্থান, তেমনি রমণীয় পরিবেশ। বড় রাস্তার ধারে খানিকটা উঁচুতে বড় বড় গাছে ছাওয়া অপরূপ কানন।

পার্ক থেকে আবার পথে নেমে আসি। এগিয়ে চলি বাজারের দিকে। কয়েক পা এগিয়েই টেলিফোন ভবন, ডাক ও তার ঘর এবং থানা। তার পরেই ডেপুটি কমিশনারের অফিস। এটি আদালতও বটে। কর্মব্যস্ত অফিস। সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসি দোতলায়। অক্ষয়বাবুর টেবিলের সামনে বসি। তাঁর সহ-

কর্মীরা ছুটে আসেন কয়েকজন। তাঁরা গারো পাহাড়ের নানা কথা বলেন। আমি বই লিখব শুনে খুশি হন। কথায় কথায় সময় বয়ে যায়। চা আসে। একসময় বিদায় নিই ওঁদের কাছ থেকে। ওঁরা আমাকে অফিসের গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন।

আবার সেই পথ। তবে এখন শুধু আমরা দুজন—আমি ও গৌতম। আমরা বাজারে চলেছি। চলেছি গারো পাহাড়ের প্রখ্যাত সমাজসেবী ও তুরা বাজারের বিখ্যাত ব্যবসায়ী মেঘাবাবুর দোকানে। পরিমলবাবু সেখানেই আমাদের জন্য অপেক্ষা করবেন।

মেঘাবাবুর দোকান খুঁজে নিতে অসুবিধা হয় না। পরিমলবাবু আগেই এসে আমাদের প্রতীক্ষা করছেন। তিনি মেঘাবাবুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ভদ্রলোককে ভাল লাগে আমার। তাঁর ভাল নাম আনন্দকিশোর ঘোষ।

কিছুক্ষণ কথাবার্তার পরে মেঘাবাবু আমাদের নিয়ে ননীবাবুর বাড়িতে এলেন। ননীবাবু মানে ননীগোপাল দেব। মেঘাবাবুর দোকানের প্রায় উল্টো-দিকে বেশ বড় বাড়ি। তিনিও তুরার বড় ব্যবসায়ী এবং গারো পাহাড়ের একজন শ্রেষ্ঠ সমাজসেবী। স্থানীয় ঠাকুরবাড়ী ও স্কুল থেকে বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত।

যথারীতি চা আসে। আর তখুনি প্রস্তাবটি পেশ করি। বলি, "আমি একটি গারো-গ্রাম দেখতে চাই।"

"দেখিয়ে দেব।" সঙ্গে সঙ্গে ননীবাবু সম্মতি দান করেন। বলেন, "চলুন কাল বিকেলে দেখে আসবেন।"

"কোথায় নিয়ে যাবেন ?" পরিমলবাবু প্রশ্ন করেন॥

"কেন ?" মেঘাবাবু বলেন, "আপনার দারেঙগিরি।"

"আমার দারেঙ্গিরি !" পরিমলবাবু মৃদু হাসেন।

"আপনার নয় তো কি ?" ননীবাবু বলেন, "বউমেয়ে বাড়ি-ঘর সব ফেলে যেখানে গিয়ে মাসের পর মাস কাটিয়েএলেন. সেই দারেঙ্গিরি আপনার নয় !"

পরিমলবাবুর দিকে তাকাই।

আবার একটু হেসে পরিমলবাবু বলেন, "আমি 'পি. এইচ. ডি.'-র জন্য গারোদের ওপরে একটা 'থিসিস' করছি। তাই কয়েক মাস গিয়ে থাকতে হয়েছিল ঐ গ্রামটিতে।"

"তাহলে তো ভালই হল।" আমি বলি, "চলুন, আপনার দারেঙগিরি

দেখে আসা যাক।…”

কিন্তু দারেঙগিরি যাব আগামীকাল। সুতরাং সে কথা আজ নয়। আজ আর বলার মতো কোন কথা নেই আমার। স্বপ্নময় গারো পাহাড়ের প্রথম দিনটি গেল ফুরিয়ে। সেই সঙ্গে শেষ হল আমার জীবনের একটি সুন্দর দিন, আনন্দের দিন, মধুর দিন।

ছয়

তিনটে দিন যে কেমন করে কেটে গেল, আজ ভাবতে বসে বুঝতে পারছি না। কেমন করেই বা পারব? সারাদিন পথে কাটলে কি দিনের হিসেব থাকে? তাই হিসেব করতে বসে গরমিল হয়ে যাচ্ছে।

তিনটে দিন তো নয়, যেন তিনটি আনন্দঘন মুহূর্ত। পরশুদিনের কথা আগেই বলেছি। এবারে গতকালের কথা ভাবা যাক।

গতকাল সকালে চা খেয়েই চলে গিয়েছিলাম পরিমলবাবুর বাড়িতে। আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার জন্য তিনি আরও কয়েকজন বন্ধুকে আসতে বলেছিলেন। তাঁরা আগের থেকেই বসেছিলেন সেখানে। আলাপ হ'ল তাদের সঙ্গে।

গতকাল বিকেলে আমরা পরিমলবাবর সঙ্গে মেঘাবাবুর জীপ গাড়ি করে গিয়েছিলাম দারেঙগিরি গ্রামে। বড়বাজারে মেঘাবাবুর দোকান থেকে রওনা হয়ে এগিয়ে গিয়েছি ডালুর পথে। ঠাকুরবাড়ি ও নাথাম বাজার পেরিয়ে যেতে হয়েছে।

নাথাম বাজার তুরার শহরতলী। শুটকি মাছ কেনা-বেচার জন্য বিখ্যাত। গারোরা শুটকি মাছ খুব পছন্দ করেন। ফলে বাজারটি বেশ জনপ্রিয়। বাজারে একটি ধর্মশালা আছে।

নাথাম বাজার থেকে দারেঙগিরি সাত মাইলের মতো। দারেঙগিরি বেশ সমৃদ্ধ ও বড় গ্রাম। কারণ এই গ্রামের উপকণ্ঠে গারো পাহাড়ের দুটি বৃহত্তম কয়লাখনি অবস্থিত। খনিজ সম্পদে গারো পাহাড় বেশ সমৃদ্ধ। এবং এ জেলার প্রধান খনিজ সম্পদ কয়লা। ১৯৫৮-৫৯ সালে জিওলজিক্যাল সার্ভের রিপোর্টে বলা হয়েছিল গারো পাহাড়ে ২৭৭০ লক্ষ টন কয়লা রয়েছে। ইতিমধ্যে

তার কতটা তুলে ফেলা হয়েছে বলতে পারব না।

যাক্ গে যেকথা বলছিলাম—দারেঙগিরি বেশ বড় গ্রাম। কিন্তু গারো পাহাড়ের বেশির ভাগ গ্রামই ছোট। তার কারণ অধিকাংশ উপজাতিদের মতো গারোরাও নদীর ধারে কিংবা কোন পানীয় জলের উৎসের কাছে বসতি স্থাপন করে। তাঁরা প্রথমেই বাঁশের নল দিয়ে গ্রামে জল নিয়ে আসেন। এজন্য জলের উৎসের নিচে বসতি স্থাপন করতে হয়।

খড় কিংবা পাতা বাঁশ ও কাঠ দিয়ে গারোরা ঘর তৈরি করেন। বলা বাহুল্য গৃহ নির্মাণে মাটির একটা বিশেষ ভূমিকা থাকে। সাধারণতঃ একখানি ঘর নিয়েই বাড়ি। বাড়ির সামনে ও পেছনে দুটি দরজা। জানলার প্রচলন কম। তবে প্রতি বাড়িতে একটি করে 'জমনো' বা শস্যাগার থাকে। বাড়ির উঠানে অপেক্ষাকৃত ছোট একখানি ঘর এই শস্যাগারের কাজ করে।

গ্রামের অদূরেই জুমচাষের জমি। গারোরা মূলতঃ কৃষিজীবী। তাঁদের ভাষায় জুমকে বলে 'আবা'। বছর দুয়েক বাদে বাদে তাঁরা জমি বদল করেন। কারণ জমি তার উর্বরতা হারিয়ে ফেলে। তখন আবার আগাছা জন্মাবার জন্য জমি ফেলে রাখতে হয়। বছর দুয়েক বাদে সেই আগাছা পুড়িয়ে আবার জমি তৈরি করা হয়। এখন অবশ্য গারো পাহাড়ে আধুনিক কৃষি ব্যবস্থার প্রচলন হচ্ছে।

জমি পালটালেও গারোরা সাধারণতঃ গ্রামের চার-পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যেই চাষের জমি সীমাবদ্ধ রাখে। পাহাড়ী ধান, ভুট্টা, বজরা ও কার্পাস গারো পাহাড়ের প্রধান চাষ। তুলা গারো পাহাড়ের শ্রেষ্ঠ কৃষি সম্পদ।

গারোদের গ্রামবিন্যাসের কোন বিশেষ নিয়ম নেই। তাহলেও দারেংগিরি বেশ বিন্যস্ত গ্রাম। ভারী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। গাঁয়ের মানুষ আমাদের খুবই আদর-যত্ন করেছেন। বয়স্করা প্রায় প্রত্যেকেই বাংলা বলতে পারেন। তবে অল্প বয়সীরা অনেকেই বাংলা বুঝতে পারেন না। দেশবিভাগের ফলে বাংলার সঙ্গে গারো পাহাড়ের যোগাযোগ ঘুচে গিয়েছে। তাই একালের ছেলে-মেয়েরা বাংলা শেখার সুযোগ পাচ্ছেন না। সেকালে গারো পাহাড়ের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও ব্যবসা-বাণিজ্যে বাংলার প্রাধান্যই ছিল বেশি, আর একালে সে প্রাধান্য প্রায় বিলুপ্ত।

তাহলেও দারেঙগিরিতে আমাদের ভাষাবিভ্রাটে পড়তে হয় নি। বরং গ্রামবাসীদের আন্তরিক আতিথেয়তা ও মধুর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে সন্ধ্যার পরে তুরা ফিরে এসেছি।

আজ সকালে গৌতমকে নিয়ে প্রথম গিয়েছিলাম মিস্টার অরোরার বাংলোয়। তাঁর সাহায্যের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দিয়েছি। আজও মিসেস অরোরা চা খাইয়েছেন। অরোরা বলেছেন—ছুপুরের আগেই মিস্টার নাগরাজন এখানে এসে যাবেন, আমাদের একটা মিটিং আছে। মিটিং-য়ের পরে তিনি আপনাদের নিয়ে উইলিয়াম নগরে ফিরে যাবেন। বিকেলে আপনারা বাংলোয় থাকবেন।

ওঁদের ছুজনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা ছুজনে নেমে গিয়েছি বড় রাস্তায়। আজ আর বাজারের দিকে অর্থাৎ দক্ষিণে না এগিয়ে উত্তরে গিয়েছি। তুরা টাউনহলের ছবি নিয়ে মেয়েদের স্কুল পেরিয়ে মিশন হাস-হাসপাতালের সামনে পৌচেছি।

মিশন হাসপাতালের পুবে একটি গীর্জা রয়েছে। সেটির ছবি নিয়ে খেলার মাঠের পাশ দিয়ে উপস্থিত হয়েছি সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুলের সামনে। এটি তুরা শহরের একটি দর্শনীয় স্থান, শহরের প্রায় উত্তরপ্রান্তে অবস্থিত। স্কুলের পাশে একটা গীর্জা রয়েছে। ছবি তুলে আমরা ফিরে এসেছি বাংলোয়।

স্নান-খাওয়া সেরে গৌতম আবার বেরিয়ে গিয়েছে। আর আমি বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েছি।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছি মনে নেই। বৈকালী চা এনে ঘুম ভাঙিয়েছে চৌকিদার। গৌতম ফিরেছে একটু আগে। সে চা খায় না, তাই জিনিসপত্র গোছ-গাছ করতে লেগে গিয়েছে।

একটু বাদে ধরণীবাবু এসেছেন। তারপরে এসেছেন পরিমলবাবু ও মোহান্তমশায়।

বেয়ারা আবার চা পরিবেশন করেছে। আমরা গারো পাহাড় সম্পর্কে নানা আলোচনা করেছি। কথায় কথায় পরিমলবাবু বলেছেন—তুরার বর্তমান জনসংখ্যা আঠারো হাজারের মতো।

শহরে রাস্তার দৈর্ঘ পঞ্চাশ কিলোমিটার। একটি কলেজ, সাতটি হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল, বারোটি জুনিয়ার স্কুল ও গুটিপঞ্চাশেক প্রাইমারী স্কুল আছে।

"আচ্ছা, শহরে কাদের সংখ্যা বেশি, হিন্দু না খ্রীষ্টান।" কাজ করতে করতে গৌতম প্রশ্ন করে বসে।

পরিমলবাবু উত্তর দেন, "খ্রীষ্টান। একাত্তর সালের জনগণনা অনুযায়ী তুরা শহরে খ্রীষ্টানের সংখ্যা ছিল ৭৯৮৪ জন, আর হিন্দু ৬৮৭৫ জন। বাকি ৬৩০ জনের মধ্যে ৪৬৪ জন ছিলেন মুসলমান আর শিখ বৌদ্ধ জৈন ইত্যাদি সব

মিলে ১৬৬ জন।"

পরিমলবাবু থামতেই ধরণীবাবু যোগ করেন, "বৃটিশ আমলের চেয়ে স্বাধীনতার পরে গারো পাহাড়ে আর শুধু গারো পাহাড়ই বা বলি কেন, সারা উত্তর-পূর্ব ভারতে মিশনারীদের কর্মব্যস্ততা অনেক বেড়ে গিয়েছে। এতটুকু শহর তুরা, এখানেও মিশনারীদের একটা হাসপাতাল ও দুটি হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল রয়েছে।"

মহান্তবাবু মন্তব্য করেন, "মানুষ কেন খ্রীষ্টান হবে না বলুন! দরিদ্র জেলা, মানুষ দুবেলা খেতে পায় না। আমরা তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারি না' কাজ দিতে পারছি না। মিশনারীরা তাঁদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন, শুধু লেখা-পড়া নয়, সেই সঙ্গে নানা রকমের হাতের কাজ শেখাচ্ছেন, তাই দলে দলে লোক খ্রীষ্টান হয়ে যাচ্ছেন।"

"তা যাক্ গে। ভারত যে ধর্মনিরপেক্ষ দেশ।" গৌতম বলে।

"না, না, খ্রীষ্টান হওয়ায় কোন আপত্তি নেই। আপত্তি হচ্ছে মিশনারীদের কেউ কেউ এঁদের এমন শিক্ষা দিচ্ছেন যে সরল ও দরিদ্র মানুষগুলোর মধ্যে একটা ভারতবিরোধী বোধ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চাইছে।" মহান্তবাবুর কণ্ঠে উষ্মা।

আমি বলি, "নিজেদের অযোগ্যতা ঢাকবার জন্য অপরকে দোষ দিচ্ছেন কেন? সীমান্ত অতিক্রম করে বিদেশী আসছে, আমরা তাদের অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে পারি না। দেশের মাটিতে ভারতবিরোধী বীজ বপন করা হচ্ছে, আমরা সেই বিষবৃক্ষের চারাগুলিকে তুলে ফেলতে পারছি না। কেমন করে পারব, স্বাধীন হবার পরে আমরা যে ক্রমেই জাতীয় চেতনাবোধ হারিয়ে ফেলেছি।… "

কথায় কথায় সময় বয়ে যায়, সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে, কিন্তু কোন গাড়ি এসে বাংলোর সামনে দাঁড়ায় না।

আমার উৎকণ্ঠা ধরা পড়ে যায়। মহান্তবাবু আমাকে আশ্বস্ত করেন। বলেন, "নাগরাজনসাহেব তুরা এসেছেন। মিটিংয়ের পরে তিনি অরোরা-সাহেবের বাংলোয় আসবেন চা খেতে, সেখান থেকে এখানে আসবেন। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, তিনি আপনাকে নিয়ে যাবেন।"

"কিন্তু রাত হয়ে গেল যে! জঙ্গলের পথ, পাহাড়ী পথ।"

"তা হোক গে! পরিচিত পথ। ওঁরা হামেশাই এপথে চলাফেরা করছেন।"

তবু নিশ্চিন্ত হতে পারি না। আমার কাছে পথের মতো পথের সাথীটিও অপরিচিত। বড অফিসার হযতো কাজের ভিড়ে কথাটা ভুলেই গিযেছেন।

না, আমার আশঙ্কা সত্য নয়। সহসা গাড়ির হেডলাইটের আলো দেখতে পাই। গাডিটা বাংলোর সামনে এসে থামে। রাস্তার আলোয় দেখি একখানি এ্যামবাসাডার।

আমরা উঠে দাঁড়াই। এগিয়ে চলি গেটের দিকে। একজন ছিপছিপে লম্বা ভদ্রলোক গাড়ির দরজা খুলে বাইরে বের হলেন। মহান্তবাবু বলে ওঠেন, "মিঃ নাগরাজন।"

তাড়াতাডি এগিযে গিযে হাত বাড়িয়ে দিই, করমর্দন করি।

ভদ্রলোকের গাযের রংটি কালো হলেও ভারী সুশ্রী আর স্মার্ট চেহারা। প্রথম দর্শনেই তাঁকে ভাল লাগে আমার। আমি কিছু বলতে পারার আগেই তিনি বলে ওঠেন, "দেরি হযে গেল। আপনাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখলাম।"

"না, না, আমরা তো গল্প করছিলাম।"

"আমাবও তাই করতে গিযে দেরি হযে গেল। কিন্তু কি করব বলুন, উইলিয়াম নগরে চাকরি কবা আর নির্বাসনে থাকা একই কথা। এখানে তবু একটা 'এসোসিযেশন' আছে, ওখানে কিছুই নেই। তাই আমাদেব কাছে তুরা আসা মানে আপনাদের কাছে কাকদ্বীপ থেকে কলকাতা আসা। যাক্ গে, আর দেরি নয, চলুন এবারে বেরিযে পডা যাক। আপনাদেব মালপত্র?"

"এখুনি নিযে আসছি।" গৌতম ঘরে যাবাব জন্য পা বাডায।

"না, না, তোমার আনার দরকার নেই। চৌকিদাব নিযে আসছে।"

মালপত্র তোলা হলে পরিমলবাবু, ধরণীবাবু ও মহান্তবাবুব কাছ থেকে বিদায় নিই। বিদায নিই চৌকিদারেব কাছ থেকে। পরিমলবাবুরা যেমন আমাকে সঙ্গদান করেছেন, তেমনি চৌকিদারও আমাদের যথাসাধ্য সেবা করেছে। জীবনে এদের সঙ্গে আর দেখা হবে কিনা জানি না, তবে তুরার সঙ্গে এদেব সবার কথাও আমার বহুদিন মনে থাকবে।

বিদায নিযে গাডিতে উঠি। গৌতম সামনে বসে, আমি পেছনে, মিঃ নাগরাজনেব পাশে। ড্রাইভার গাডিতে স্টার্ট দেয়। আমরা হাত নাড়ি, ওঁরা হাত নাডেন। গাডি চলতে শুরু করে।

একটু বাদে নাগরাজন বলেন, "এখন সাড়ে সাতটা, ঘণ্টা দুয়েক লাগবে। আমরা রাত সাড়ে ন'টা নাগাদ পৌঁছে যাবো। অবশ্য উইলিয়াম নগরে তখন গভীর রাত।

"তা হোক গে। রাতের গারো পাহাড় দেখা যাবে।"

"হ্যাঁ। এখন চাঁদনী রাত। রাতের গারো পাহাড় ভাল লাগবে আপনাদের।"

কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা শহর ছাড়িয়ে এলাম। বনময় পাহাড়ী পথ, আঁকাবাঁকা চড়াই-উৎরাই। আমরা ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে উত্তরে চলেছি। রংগ্রাম থেকে গোয়ালপাড়ার পথ ধরে পুবে যেতে হবে। তারপরে রংরেণগিরি হয়ে উইলিয়াম নগর। খুব মসৃণ না হলেও পথ তেমন খারাপ নয়। আকাশে ত্রয়োদশীর চাঁদ উঠেছে। বনপথ হলেও প্রতি মুহূর্তে তার উপস্থিতি টের পাচ্ছি। কিছুক্ষণ আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। এখন মেঘমুক্ত আকাশ। মিষ্টি হাওয়া বইছে। আমি দেখছি আর দেখছি।

আঁকাবাঁকা উঁচু-নিচু পথ। বাঁকের পর বাঁক। কখনও নামছি কখনও উঠছি। কোথাও ঘন বন, চাঁদের আলো আসতে পারছে না, পথের পাশে অন্ধকার। আবার কোথাও বা পথের পাশে ছোট-ছোট ক্ষেত। সেখানে 'চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে।'

মাঝে মাঝে দু-য়েকটি ছোট-ছোট নদী, নালাও বলা যেতে পারে। কোথাও কংক্রিট, কোথাও বা কাঠের পুল। পুল পেরিয়ে গাড়ি ছুটে চলেছে। আবার কোথাও পাহাড়ের গা বেয়ে ঝরণা নেমে এসেছে। চাঁদের আলোয় মনে হচ্ছে মুক্তোধারা। অপরূপ দেখাচ্ছে।

ভারী ভাল লাগছে। ভাগ্যিস নাগরাজন দেরি করে রওনা হয়েছেন। নইলে তো গারো পাহাড়ের এই অপরূপ রূপ আমার অজানাই থেকে যেত।

হঠাৎ পেছন ফিরে গৌতম জিজ্ঞেস করে, "এসব বনে বন্যজন্তু নেই ?"

"আছে বৈকি!" নাগরাজন বলেন। আগে তো গারো পাহাড়ের বন বন্যজন্তুর জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এখন বসতি বেড়েছে, প্রচুর সংখ্যায় মেরে ফেলা হয়েছে, ফলে বন্যপ্রাণী অনেক কমে গেছে। তাহলেও রয়েছে বৈকি!"

একবার থামেন নাগরাজন। তারপরে আবার বলেন, "গারো পাহাড় বনময়। সব বন সংরক্ষিত নয়। মানুষের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বেশির ভাগ বন্যপ্রাণী এখন সংরক্ষিত অঞ্চলেই আশ্রয় নিয়েছে। সেখানেও মানুষের অত্যাচার আছে, তবে কিছু কম। তাই এখন সংরক্ষিত অঞ্চলেই রয়েছে বাঘ লেপার্ড মোষ ভালুক, বুনোশুয়োর ইত্যাদি। তাছাড়া হরিণ বুনো-হাঁস ও বনমোরগ প্রভৃতি তুমি গারো পাহাড়ের সব বনেই দেখতে পাবে।"

"এসব জায়গায় আছে ?"

"হ্যাঁ আছে। তবে গাড়ির শব্দ পেলে ওরা সাধারণতঃ রাস্তা থেকে দূরে সরে যায়। তুমি তো মাউণ্টেনীয়ারিং ট্রেনিং নিয়েছো, তুমি তো জানো হিমালয়ের পথ ও বন কি রকম শব্দহীন।"

গৌতম মাথা নাড়ে। মিঃ নাগরাজন বলেন, "এখানকার বনভূমিও তেমনি শান্ত এবং নীরব। তাই গাড়ির শব্দ এখানেও ধ্বনিত আর প্রতিধ্বনিত হয়ে বহুদূরে ভেসে যায়। সে শব্দ শুনলে ওরা পথ থেকে দূরে সরে যায়। কেবল ব্যতিক্রম হচ্ছে হাতি।"

"কি রকম?"

"ওরা এসব শব্দ-টব্দকে পরোয়া করে না। বন্য হাতির পাল সর্বদা সোজা-পথে স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করে, পথের সকল বাধা ভেঙে ফেলে অগ্রসর হয়। এমন কি অনেক সময় ওরা দল বেঁধে পথের ওপর বসে বিশ্রাম নেয়। সংকীর্ণ পথ। সব জায়গায় তাড়াতাড়ি গাড়ি ঘুরিয়ে পালানো সম্ভব হয় না। তখন খুবই মুশকিলে পড়তে হয়।"

"এসব জায়গায় হাতি আসে?"

"অনেক দিন ধরে কেউ দেখে নি। তবে যে কোন সময় আসতে পারে। তাই আমার স্ত্রী রাতে জঙ্গলের পথে চলাফেরা করতে নিষেধ করে। কিন্তু আমার পক্ষে সে পরামর্শ মেনে নেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। কেমন করে হবে বলো, আমাদের চাকরিতে 'ট্যুর্' করতেই হবে। গারো পাহাড়ে চাকরি করব আর রাতে জঙ্গলে ঘুরব না, তা কেমন করে সম্ভব?"

থামলেন নাগরাজন। বাইরে তাকাই। বনময় পাহাড়ীপথে গাড়ি এগিয়ে চলেছে। বন কোথাও অন্ধকার কোথাও বা আলোময়। আলো-আঁধারী পথ একটা মায়াময় পরিবেশ রচনা করেছে। সত্যই মেঘালয় মায়াময়।

কিছুক্ষণ বাদে গৌতম আবার জিজ্ঞেস করে, "এখানকার বনে প্রধান গাছ কি কি?"

নাগরাজন উত্তর দেন, "শাল গুরগরা ও হলদি গাছ এবং বাঁশ। গুরগরা ও ও হলদি গাছের কাঠ দিয়ে ভাল প্লাইউড্ হয় আর গারো পাহাড়ের শালকাঠ খুবই বিখ্যাত। বাঁশেরও বেশ ভাল বাজার।......" কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেলেন নাগরাজন। ড্রাইভারকে বলে উঠলেন, "রোখো!"

একটা মালবোঝাই 'ট্রাক'-এর পেছনে আমাদের গাড়ি থামে। ট্রাক্-টা দাঁড়িয়ে আছে প্রায় পথের মাঝখানে। সরু পথ, কোন রকমে দু'দিকের দু'খানি গাড়ি যাতায়াত করতে পারে। এপথে এতবড় গাড়ি এমনভাবে দাঁড় করানো

ঠিক হয় নি।

গাড়ি থামাবার সঙ্গে সঙ্গে নাগরাজন নেমে পড়েন গাড়ি থেকে। আমরাও নেমে আসি পথে। পথের দু'পাশেই বাড়ি-ঘর। মনে হচ্ছে বেশ বড় গ্রাম। মিঃ নাগরাজন ড্রাইভারকে বলেন, "এটা তো রংরেণগিরি? এখানে একটা পুলিস চৌকি আছে?"

"জী হা।" ড্রাইভার উত্তর দেয়।

"জলদি জমাদারকো বোলাও!

ড্রাইভার চলে যায়। বিরক্ত কণ্ঠে নাগরাজন বলেন, "কেউ যদি কাজ না করে, কেউ যদি আইন না মানে, আপনি কেমন করে দেশ চালাবেন?"

তাঁর ক্ষোভ অকারণে নয়। তবে এটা শুধু আইনের ব্যাপার নয়, নাগরিক বিবেচনার ব্যাপারও বটে। আমি এখানে গাড়ি দাঁড় করালে, অপরের অসুবিধে হবে এবং আমার পক্ষে তার অসুবিধে করা উচিত নয়, এই বিবেচনাবোধ না থাকলে এমন ঘটনা ঘটবেই। দুর্ভাগ্যের কথা আমরা পাশ্চাত্যের কাছ থেকে মোটরে চড়া শিখেছি কিন্তু মোটর চালাবার নিয়ম-কানুনগুলো শিখতে পারি নি। ফলে ভারতের প্রায় প্রত্যেক বড় শহরে প্রতিদিন 'ট্রাফিক জ্যাম্' লেগেই আছে।

কয়েক মিনিট বাদেই ড্রাইভার ফিরে আসে। তার সঙ্গে দুজন পুলিস ও জনচারেক লোক।

পুলিসরা মিঃ নাগরাজনকে স্যালুট করেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন, "এটা কার গাড়ি?"

"আজ্ঞে, আমার হুজুর।" একটি লোক হাতজোড় করে দাঁড়ায়।

"রাস্তাটাও বোধহয় তোমার?"

"আজ্ঞে না হুজুর!"

"তাহলে রাস্তার মাঝখানে গাড়ি রেখে দিয়েছো কেন?"

"এখুনি সরিয়ে রাখছি হুজুর, আর কোনদিন এভাবে গাড়ি রাখব না।"

"মনে থাকবে?"

"জী, হুজুর।" লোকটি প্রায় ছুটে গিয়ে ট্রাকে ওঠে।

এবারে মিস্টার নাগরাজন পুলিস দুজনকে জিজ্ঞেস করেন, "আপনারা কি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন?"

"আজ্ঞে না। আমরা ঘরের ভেতরে ছিলাম, দেখতে পাই নি।"

"কিন্তু দেখা উচিত ছিল।"

"জী হুজুর। ভুল হয়ে গিয়েছে। আর কোনদিন হবে না।"

তাদেরও ক্ষমা করলেন নাগরাজন। আমরা আবার গাড়িতে এসে উঠি। গাড়ি এগিয়ে চলে।

আমি বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকি।

না! চাঁদের আলোয় মায়াময় মেঘালয়ের অপরূপ রূপ দেখছি না, ভাবছি আমার পাশে বসে থাকা ভদ্রলোকের কর্তব্যপরায়ণতার কথা। তিনি জেলা-শাসক। এসব তুচ্ছ জিনিস দেখা তাঁর কাজ নয়। তবু ব্যাপারটা তাঁর দৃষ্টি এড়ালো না। ওপর মহলের মানুষরা সবাই এমন দৃষ্টিসম্পন্ন হলে, জনসাধারণের অনেকখানি দুঃখ-কষ্ট দূর হয়ে যেত। পথ তৈরি নয়, পথ পরিস্কার রাখাই এখন আমাদের প্রধান সমস্যা। সে সমস্যার সমাধানের জন্য মিস্টার নাগরাজনের মতো প্রশাসকের প্রয়োজন। কিন্তু এমন মানুষ ক'জন আছেন এদেশে?'

রাত ঠিক পৌনে দশটায় উইলিয়াম নগরে পৌছলাম। তার মানে মিস্টার নাগরাজনের হিসেব নির্ভুল। তিনি বলেছিলেন দু'ঘণ্টা লাগবে আর আমাদের লেগেছে সোয়া দু'ঘণ্টা। তার মধ্যে মিনিট পনেরো দেরি হয়েছে রংরেণগিরিতে, সেই ট্রাক্ সরাবার জন্য।

এটি মধ্য-গারো পাহাড়ের পশ্চিমাঞ্চল। তুরার প্রায় একই সমান্তরাল রেখায় অবস্থিত। মাত্র বছর তিনেক আগেও উইলিয়াম নগর ছিল একটি গণ্ডগ্রাম। গুটি পঞ্চাশেক ঘর আর শ'দুয়েক মানুষ নিয়ে ছিল সেই গ্রাম। বরং তুলনায় রংরেণগিরি অনেক প্রাচীন ও বড় গ্রাম। কিন্তু উপত্যকাটি বড় বলে সেই অখ্যাত গণ্ডগ্রামটিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠছে নতুন জেলাসদর। বন কেটে বসত হচ্ছে। পথ তৈরি হচ্ছে, বাড়ি তৈরি হচ্ছে, পার্ক তৈরি হচ্ছে, জল সরবরাহের ব্যবস্থা হয়েছে, বিদ্যুৎ এসে গিয়েছে।

সেই নির্মীয়মাণ পথ ধরে, নির্মীয়মাণ বাড়ি-ঘরের পাশ দিয়ে আমাদের গাড়ি একটা বাংলোর সামনে এসে থামল। গেটের সামনে এক টুকরো কাঠের ওপরে মিস্টার নাগরাজনের নাম লেখা।

নাগরাজন বলেন, "কয়েক মিনিটের জন্য আমাকে একটু মাফ করতে হবে। আমি একবার 'এ্যাটেণ্ডেন্স' দিয়ে আসি।"

"এ্যাটেণ্ডেন্স!"

"ইয়েস। টু মাই হোম্ মিনিস্টার।"

হেসে ফেলি। তিনিও হাসেন। আমি বলি, "বেশ তো। বনময় পাহাড়ী পথ পেরিয়ে নিরাপদে ঘরে ফিরে এসেছেন, খবরটা দেওয়া দরকার বৈকি।"

"হ্যাঁ। ওর সঙ্গে দেখা করেই আমি আপনাদের ইন্‌সপেক্‌শান বাংলোয় পৌঁছে দিয়ে আসব।"

"কিন্তু আমাদের সঙ্গে আপনার যাবার দরকার আছে কি? আমাদের তো ড্রাইভারই পৌঁছে দিয়ে আসতে পারে।"

"না।" তিনি আপত্তি করেন, "এত রাতে ড্রাইভারের সঙ্গে পাঠালে আপনারা হয়তো 'নেগলেক্টেড্' হবেন। একটু বসুন, আমি আপনাদের সঙ্গে যাবো।"

তিনি গাড়ি থেকে নেমে ভেতরে চলে যান। আবার ভাবতে হয় এই মানুষটির কথা। তিনি জেলাশাসক আর আমি একজন নগণ্য বাংলা লেখক। ভদ্রলোক বাংলা জানেন না, তবু কত যত্ন করছেন আমাকে।

মিনিট দশেক পরে তিনি ফিরে আসেন। তবে একা নন, সঙ্গে মিসেস নাগরাজন। সুশ্রী যুবতী।

নমস্কার বিনিময়ের পরে মিসেস বলেন, "এক কাপ কফি খেয়ে গেলে কিন্তু ভারী খুশি হতাম।"

"কাল সকালে ওঁরা এখানেই ব্রেকফাস্ট করবেন।" আমি কিছু বলতে পারার আগেই মিঃ নাগরাজন বলে ওঠেন, "আজ আর দেরি করিও না, তাহলে ওঁদের ইন্‌সপেকশান বাংলোয় ডিনার জুটবে না।"

"বেশ তো তাহলে এখানেই ডিনার সেরে যান।" সঙ্গে সঙ্গে মিসেস বলে ওঠেন।

মনে মনে ভাবি—এই তো ভারতীয় নারী, তা তিনি যা-ই হোন, যেখানেই থাকুন। খাইয়ে এমন আনন্দ পৃথিবীর আর কোন দেশের মেয়েরা লাভ করেন বলে জানা নেই আমার। মুখে বলি, "আজ অনেক রাত হয়ে গেছে, আজ থাক। কাল সকালে এসে ব্রেকফাস্ট খেয়ে যাবো।"

মিসেস নাগরাজনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গাড়িতে এসে উঠি। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা সয়েল কনজার্ভেশন ডিপার্টমেন্ট-এর ইন্‌সপেকশান বাংলোর সামনে এসে উপস্থিত হলাম। ভূমিক্ষয় গারো পাহাড়ের অন্যতম প্রধান সমস্যা। তাই কেন্দ্রীয় ভূমি সংরক্ষণ দপ্তর এখানে অফিস ও এই বিশ্রাম-ভবন নির্মাণ করেছেন।

ড্রাইভার গাড়ি থেকে নেমে চৌকিদারকে ডাকতে চলে গেল। এখানে এত

রাতে অতিথি আসার কথা নয়, বেচারী বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে।

চোখ ডলতে ডলতে চৌকিদার এসে উপস্থিত হয়। স্বাস্থ্যবান প্রৌঢ়। সে সবিনয়ে সেলাম করে আমাদের। তারপরে হাতজোড় করে মিঃ নাগরাজনের দিকে তাকায়। তিনি তাকে একখানি ঘর দেবার ও আমাদের দেখাশোনা করার নির্দেশ দেন।

আমরা গাড়ি থেকে নেমে বাংলোয় উঠে আসি। মিঃ নাগরাজন নিজেও আমাদের সঙ্গে আসেন। চৌকিদার ঘর খুলে দেয়।

ঘর নয় স্যুট। মেঝেতে দড়ির কার্পেট পাতা। সামনে বসার জায়গা, সোফা ও সেণ্টার টেব্‌ল দিয়ে সাজানো। পর্দার পেছনে শোবার ঘর। দুখানি খাট, চেয়ার ড্রেসিং টেব্‌ল টিপয় আলনা প্রভৃতি প্রচুর আসবাবপত্র। খাটে ডানলোপিলোর গদি ও নাইলনের মশারী। ঘরের সঙ্গে বাথরুম। বেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন এবং সুন্দর ব্যবস্থা।

রাত দশটা বেজে গিয়েছে। মিঃ নাগরাজনকে বলি, "এবারে আপনি আসুন।"

"হ্যাঁ। কিন্তু আপনাদের খাবার ব্যবস্থা…। সাওমী। সাবদের কিছু খাওয়াবার ব্যবস্থা করতে পারবে?"

"জী সাব!" চৌকিদার সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়।

"তাহলে আপনি আর দেরি করবেন না।"

মিঃ নাগরাজনও আর আপত্তি করেন না। তিনি খুবই শ্রান্ত। আমরা তাঁকে এগিয়ে দিতে বাইরে আসি।

গাড়িতে উঠে নাগরাজন বলেন, "সকাল আটটায় একটা জীপ আসবে। আপনারা আমার বাংলোয় গিয়ে ব্রেকফাস্ট করবেন। তারপরে সেই গাড়িতে করেই বেড়াতে বের হবেন। গাড়িটা সারাদিন আপনাদের সঙ্গে থাকবে। যে লোকটি গাড়ি নিয়ে আসবে, সে স্থানীয় লোক, বাংলা জানে। সে আপনাদের সব জায়গা ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেবে।"

কি আর বলব। শুধু সকৃতজ্ঞ চিত্তে বলি, "ধন্যবাদ।"

তিনি বলেন, "গুডনাইট।"

আমরাও হাতজোড় করে বলে উঠি, "গুডনাইট।"

সাত

সকাল সাতটায় ঘুম ভেঙে গেল। শেষরাতের দিকে জোর বৃষ্টি হয়েছে। সঙ্গে হাওয়াও ছিল। তাই শেষ পর্যন্ত লেপ গায়ে দিতে হয়েছে। আর এমনটি হতে পারে জেনেই যেন সাঙমা পায়ের কাছে লেপ রেখে দিয়েছিল।

গৌতমেরও ঘুম ভেঙেছে। ওর শীত কম। তবু দেখছি লেপ টেনে নিয়েছে।

বাথরুমে গিয়ে প্রাতঃকৃত্য সেরে আসি। একখানি চাদর গায়ে দিয়ে সামনের বারান্দায় এসে দাঁড়াই। গতকাল রাতে ঠিকমত দেখতে পাই নি। আজ দেখছি ভারী সুন্দর জায়গা। শান্ত ও রমনীয় পরিবেশ। একটি বেশ বড় সবুজ উপত্যকায় গড়ে উঠছে নতুন শহর। প্রায় চারিদিকেই পাহাড়।

দেখে বেশ বুঝতে পারছি, আগে এই সমতল বনময় ছিল। বন কেটে বসত হয়েছে। কোঠাবাড়ি কম, অধিকাংশই বাংলো টাইপের—টিন কিম্বা এ্যাজবেস্টসের চাল। সাদা অথবা সবুজ। এগুলি সবই সরকারী অফিস অথবা কোয়ার্টার্স।

আমাদের বাংলোর বিপরীত দিকে রাস্তার ধারে কয়েকটি বাঁশ ও খড়ের ঘর রয়েছে। জরাজীর্ণ হলেও দেখতে খারাপ লাগছে না।

"সাব্! এখানে চা নিয়ে আসব?" কখন যেন সাঙমা এসে আমার পেছনে দাঁড়িয়েছে।

এত তাড়াতাড়ি এমন সুসংবাদ প্রত্যাশা করি নি। তাই সানন্দে বলে উঠি, "চা হয়ে গিয়েছে?"

"হ্যাঁ, স্যার।"

তুরাতেও দেখেছি এখানেও দেখছি—এরা হিন্দি বলে না, বাংলাতেই কথা বলে। তাই তো বলবে, বাংলার সঙ্গে গারো পাহাড়ের যোগাযোগ যে সুদূর অতীত থেকে।

বলি, "বেশ এখানেই নিয়ে এসো।"

"ছোট সাহেবের চা কি করব, তাঁকে ডাকব কি?"

"ডেকে দাও কিন্তু ওকে চা দিতে হবে না। ও চা খায় না।"

"কিন্তু আমি যে ওনার চা বানিয়ে ফেলেছি!"

"তুমি খেয়ে নাও।"

একখানি চেয়ারে বসি। মায়াময় মেঘালয়ের মনোরম প্রভাতটিকে মন-প্রাণ দিয়ে উপভোগ করতে চাই।

সাঙমা চা নিয়ে আসে। আমি মনোযোগ দিয়ে তাদের শহর দেখছি বলেই বোধ হয় সে বলতে শুরু করে, "স্যার, দু-বছর আগেও এখানে জঙ্গল ছিল, ঘন জঙ্গল। এখন যা-কিছু দেখছেন, সবই প্রায় বছর দুয়েকের মধ্যে তৈরি হয়েছে।"

"এখানে জেলাসদর হয়েছে কতদিন ?"

"আজ্ঞে তিন বছর।"

"আচ্ছা, তোমাদের সুপারিনটেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ার মিস্টার সত্যপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম শুনেছো ?"

"ব্যানার্জী সাহেব! গারো পাহাড়ে তার নাম কে না শুনেছে সার? তিনি যে আমাদের দেবতা।" শ্রদ্ধায় সাঙমার কণ্ঠস্বর যেন রুদ্ধ হয়ে যেতে চাইছে।

"তাঁর কোয়ার্টার্সটা জানো ?"

"আজ্ঞে তিনি তো এখানে থাকেন না। কাল রাতে তুরা থেকে এখানে আসার পথে যে বড় গ্রামটা দেখেছেন, সেই রংরেণগিরিতে নিজের বাড়িতে থাকেন। সেখান থেকেই অফিস করেন। সপ্তাহে তিন দিন এখানে আসেন। তিন দিন তুরা যান।"

"আগামীকাল এখানে আসবেন ?"

"কাল, কি বার সোমবার। না, কাল এখানে আসবেন না, কাল তুরা যাবেন। পরশু এখানে পাবেন।"

"কিন্তু আমি তো পরশু গোয়ালপাডা ফিরে যাবো ভাবছি। তাহলে আর ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করা হবে না।"

"কেন হবে না স্যার! আপনাকে তো ডি. সি. সাব গাড়ি দিচ্ছেন ?"

"হ্যাঁ, জীপ। আটটায় আসবে।"

"তাহলে রংরেণগিরি চলে যান না। আজ রবিবার। বাড়িতেই পাবেন। গাড়িতে যেতে মিনিট পনেরো সময় লাগবে। ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে ঘুরে আসতে পারবেন।"

মিস্টার নাগরাজন একই কথা বলেন। তিনি কথা রেখেছেন। ঠিক সকাল আটটায় গাড়ি পাঠিয়েছেন।

আমরা প্রথমেই তাঁর বাংলোয় এসেছি। সত্যপ্রিয়বাবুর কথা বলতেই তিনি সোচ্চার স্বরে বলে উঠলেন, "নিশ্চয়ই। গারো পাহাড়ে এসে যদি তাঁর সঙ্গে পরিচিত না হন, তাহলে খুবই দুঃখের হবে। হি ইজ এ্যান আইডিয়েল

অফিসার, এ ডেডিকেটেড্ ইঞ্জিনীয়ার।"

"শুনেছি তিনি একজন গারো মহিলাকে বিয়ে করেছেন ?"

"ইয়েস, মিসেস মেরী ব্যানার্জী। শি ইজ অল্সো এ ডেডিকেটেড লেডী। গারো পাহাড়ের সমাজ উন্নয়নে, বিশেষ করে নারীমুক্তি আন্দোলনে তাঁর অবদান উল্লেখ করার মতো।"

"তাহলে একবার তাঁদের সঙ্গে দেখা করে আসি।"

"নিশ্চয়ই! ব্রেক-ফাস্ট করেই চলে যান। কতক্ষণ লাগবে ? কাল তো আসার পথে গ্রামটা দেখেছেন।"

আমি মাথা নাড়ি।

তিনি বলেন, "বড় জোর মিনিট পনেরো। ফিরে এসে লাঞ্চ করবেন। সাঙমাকে লাঞ্চের কথা বলে এসেছেন তো ?"

"হ্যাঁ।" তাডাতাড়ি উত্তর দিই। নইলে হয়তো আবার নেমন্তন্ন করে বসবেন।

ব্রেক-ফাস্ট তো নয়, লাঞ্চের বাডা। কি করব ? তুরাতে দেখেছি, এখানেও দেখছি—এঁরা আধুনিকা আই· এ· এস· গৃহিনী হলে কি হবে, অতিথি সেবার ব্যাপারে মা-ঠাকুরমাদের মানসিকতা ছাড়তে পারেন নি। ভাগ্যিস রঞ্জনবাবু বিয়ে করেন নি।

যাই হোক ভুরিভোজ জলখাবার খেয়ে মিস্টার ও মিসেস নাগরাজনের কাছ থেকে বিদায় নিযে গাডিতে এসে উঠি। গাড়ি এগিয়ে চলে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা শহর ছাড়িয়ে এলাম। একটু বাদে একটা গ্রাম, পথের ডানদিকে। বাঁদিকে বন, ডানদিকে লোকালয় ও খেতখামার। বাঁশ আর খডের ঘর, মাটির মেঝে। পথের পাশে কয়েকটি খড়ের চালা। শুধুই চাল, বেডা নেই। আজ লোকজন নেই। হাটের দিনে দোকান বসে। তবে গুটিদুয়েক চায়ের দোকান রয়েছে। ড্রাইভার জানায় আমরা উইলিয়াম নগর থেকে ৫ কিলোমিটার এসেছি।

জীপ এগিয়ে চলেছে। গ্রাম ছাড়িয়ে পথের দু-পাশেই জঙ্গল। একটু বাদে একটা নদী। ছোট পাহাড়ী নদী, ছোট পুল।

আমরা পুল পেরিয়ে এগিয়ে চলি। ড্রাইভার বলে, "এই নদীটা দুধনৈ থেকে এসেছে।"

"দুধনৈ কোথায় ?" গৌতম প্রশ্ন করে।

ড্রাইভার উত্তর দেয়, "আসামে, গোয়ালপাড়া জেলায়। আপনারা কি

এখান থেকে তুরা ফিরবেন, না সোজা গোয়ালপাড়ায় চলে যাবেন।"

"গোয়ালপাড়ায় চলে যাবো।" আমি উত্তর দিই।

ড্রাইভার বলে, "তাহলে তো আপনাদের ডুধনৈ হয়েই যেতে হবে। উইলিয়ামনগর থেকে বাস যায় ডুধনৈ পর্যন্ত, দূরত্ব ৮৪ কিলোমিটার। সেখান থেকে আরেকটা বাস ধরে আপনাদের গোয়ালপাড়া পৌছতে হবে।"

"কতক্ষণ সময় লাগবে ?"

একটু ভেবে নিয়ে ড্রাইভার উত্তর দেয়, "তা ঘণ্টা সাতেক তো বটেই। উইলিযাম নগর থেকে সকাল সাড়ে দশটার বাস ধরলে বিকেল তিনটে নাগাদ ডুধনৈ পৌছবেন। সেখানে বাস পাবার পরেও দু-আড়াই ঘণ্টা তো লাগবেই। ডুধনৈ থেকে গোযালপাড়া ৩৮ কিলোমিটার।"

"ডুধনৈ বুঝি মেঘালয় ও আসাম সীমান্ত ?" গৌতম জিজ্ঞেস করে।

ড্রাইভার উত্তব দেয়, "না। ডামরা গারো পাহাড়ের শেষ গ্রাম। ডুধনৈ গোযালপাডা জেলায়। ডামরা থেকে বাসে প্রায় আধঘণ্টার পথ।"

ইতিমধ্যে আমাদের গাড়ি পাহাডী পথ ভাঙতে শুরু করেছে। বনময় পাহাড। ড্রাইভার বলে "এটা সিমসাঙগিরি রেঞ্জ। ফরেস্ট রেঞ্জ বলাই উচিত হবে। বেঞ্জাব রংবেণগিরিতে থাকেন।"

কযেক মিনিটের মধ্যেই আমরা একটা পাহাডী গ্রামে উপস্থিত হলাম। কাল রাতে বুঝতে পারি নি, আজ দেখছি কেবল বড নয়, বেশ সমৃদ্ধ। মসৃণ ও ঝকঝকে পথ, সুবিন্যস্ত বাড়ি-ঘর। গ্রামের উপকণ্ঠে সবুজ ক্ষেত। আমরা তাকিযে তাকিযে দেখি।

ড্রাইভার বলে, "রংরেণগিরি।"

আমি মাথা নাড়ি।

ড্রাইভার বলে চলে, "শ'দেড়েক ঘর আর শ'ছযেক মানুষ নিয়ে গ্রাম। কিন্তু দেখুন বাজারটি কেমন সাজানো গোছানো—সবই পাকা দোকানঘর। আর এই দেখুন, মডেল এম. ই. স্কুল—পঁচাত্তর জনের মতো ছাত্র-ছাত্রী।

স্কুল ছাড়িয়ে আমাদের জীপ এগিযে চলে। একটু বাদেই পথের পাশে একটা প্রসূতি-সদন নাম সরোজিনী মাতৃমঙ্গল মন্দির।

নামটা দেখে মনে হচ্ছে এর সঙ্গে মিঃ ব্যানার্জীর নিকট সম্পর্ক রয়েছে। কথাটা জিজ্ঞেস করি ড্রাইভারকে। সে উত্তর দেয়, "ঠিকই ধরেছেন, ব্যানার্জী সাহেবের মায়ের নামে মেরীদিদি এই ম্যাটার্নিটি সেণ্টার করেছেন।"

প্রসূতি-সদন ছাড়িযে একটু বাদেই ছোট অথচ সুন্দর একখানি বাড়ির

গেটে এসে গাড়ি থামল। লোহার গেট কিন্তু মাধবীলতায় ছাওয়া। বাড়ির সামনে চমৎকার বাগান। গোলাপ জবা গন্ধরাজ থেকে শুরু করে নানা রঙের রকমারী ফুল ফুটে আছে।

পায়জামা ও কিমানো পরে একজন দীর্ঘদেহী প্রৌঢ় গাছের পরিচর্যায় ব্যস্ত ছিলেন। আমাদের গাড়ির শব্দ শুনে তিনি উঠে দাঁড়িয়েছেন। ড্রাইভার বলে, "ব্যানার্জী সাহেব।"

আমরা দরজা ঠেলে বাড়ির ভেতরে ঢুকি। লাল সুরকির পথের ওপর এসে দাঁড়াই। মিঃ ব্যানার্জী এগিয়ে আসছেন। সৌম্য শান্ত সুপুরুষ। তিনি কাছে আসেন। আমি নমস্কার করে পরিচয় দিই।

ভদ্রলোক ভারী খুশি হলেন। বয়সে আমার চেয়ে কিছু বড় হবেন, কিন্তু চেহারা দেখে বোঝার উপায় নেই। শুধু স্বাস্থ্যবান ও 'স্মার্ট' নন, হাসিখুশি রসিক মানুষ। বললেন, "মিঃ নাগরাজন টেলিফোনে আপনার আসার খবর দিয়েছেন। কি সৌভাগ্য আমার, চলুন ঘরে গিয়ে বসবেন।"

আমরা তাঁর সঙ্গে ড্রয়িংরুমে এসে বসি। তিনি জিজ্ঞেস করেন, "এবারে বলুন, গারো পাহাড় কেমন লাগছে?"

"ভাল, খুব ভাল।"

"লাগবেই। আর কয়েকদিন থাকুন, দেখবেন কেমন মায়ায় পড়ে যাবেন, ছেড়ে যেতে কষ্ট হবে। আমি তো পারলামই না।"

"জানি। আপনার কথা কিছু শুনেছি।"

"কি শুনেছেন জানি না। তবে যা সত্য, তা হল এই যে ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে এখানে চাকরি নিয়ে এসেছিলাম, সারা জীবন এখানেই থেকে যেতে হল।"

"আপনার স্ত্রীও শুনেছি এখানকার মেয়ে?"

"হ্যাঁ। এখুনি পরিচয় হবে। খবর পেয়ে গেছে যে আপনারা কলকাতা থেকে এসেছেন। কলকাতা থেকে কেউ এলে ওর ভারী আনন্দ হয়। ছুটে এলো বলে।" একবার থামেন তিনি। তারপরে আবার বলেন, "কলকাতায় যেতে আমাদের দুজনেরই খুব ইচ্ছে করে। কিন্তু যাওয়া হয়ে ওঠে না। সেও এই গারো পাহাড়ের মায়ায়। কি করব একে তো আমার চাকরিতে বারো মাসের কাজ, তার ওপরে ওর প্রসূতি সদন। আসার সময় তো দেখে এলেন।"

আমি মাথা নেড়ে বলি, "এসব কথা কিছু শুনেছি। শুনে বিস্মিত হয়েছি। তাই আপনাদের দেখতে এসেছি।"

"এসেছেন ভাল করেছেন। কিন্তু ভাই, বিস্মিত হবার মতো কোনো ব্যাপার নয়। কি আর করতে পেরেছি। যেটুকু হয়েছে, সবই সরকারী কাজ, আমি তো উপলক্ষ মাত্র।"

"কিন্তু আমি আপনার কথা শোনার জন্যই আজ এখানে এসেছি।"

সহসা হো হো করে হেসে উঠলেন মিঃ ব্যানার্জী। প্রাণখোলা উদাত্ত হাসি। হাসির কারণ বুঝতে না পেরে আমরা তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি।

একটু বাদে হাসি থামিয়ে মিঃ ব্যানার্জী বলেন, "আপনি তো লেখক, রিপোর্টার নন। শুনেছিলাম রিপোর্টাররা নাছোড়বান্দা হন, কিন্তু এখন দেখছি লেখকরাও কম যান না।"

সহাস্যে উত্তর দিই, "সব লেখকই তো কম-বেশি রিপোর্টার, তাই লেখকরা নাছোড়বান্দা হবে না কেন?"

মিঃ ব্যানার্জী আর কিছু বলবার অবকাশ পান না। ভেতর থেকে নারী-কণ্ঠ ভেসে আসে, "যার কাছে এসেছেন, তিনিও কিছু কম নাছোড়বান্দা নন।" পর্দা ঠেলে জনৈকা সুদর্শনা ও স্বাস্থ্যবতী মহিলা ঘরে ঢোকেন। বাঙালী মেয়েরা ঘরে যেমন করে শাড়ী পরেন তিনি তেমনি করে শাড়ী পরেছেন। তাঁর বাংলা উচ্চারণ থেকেও বোঝা গেল না তিনি বঙ্গললনা নন। গায়ের রঙ, এমন কি মুখশ্রী দেখেও বুঝতে পারছি না, তিনি গারো। তাঁর পেছনে একজন পরি-চারিকা। তার হাতে চায়ের সরঞ্জাম।

ব্যানার্জী সাহেব আমাদের বলেন, "আমার স্ত্রী মিসেস মেরী বন্দ্যোপাধ্যায়।"

আমরা নমস্কার করি। মিঃ ব্যানার্জী আমাদের পরিচয় দেন।

মিসেস একখানি চেয়ারে বসে চা করতে করতে বলেন, "নাছোড়বান্দা না হলে যে সংসারের কোন কাজ হয় না, তা তো তোমার চেয়ে কেউ বেশি জানে না।"

তিনি আমার সামনে চায়ের কাপ এগিয়ে দেন। গৌতম তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, "আমি কিন্তু চা খাই না।"

"তাই নাকি?"

"আজ্ঞে, হ্যাঁ।"

"গুড্, ভেরী গুড্। তাহলে তুমি একগ্লাস দুধ খাও।" তিনি পরি-চারিকার দিকে তাকান।

গৌতম লজ্জা পেয়ে যায়। সে বলে, "না, না, এখন দুধ খাবো কি ?"

"চায়ের মতো দুধ খাবারও কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। এভরি টাইম ইজ মিল্ক টাইম..."

"ইফ্ ইট ইজ অব্ ইয়োর ওন কাউজ।" হাসতে হাসতে মিঃ বন্দ্যোপাধ্যায় যোগ করেন।

আমরাও অট্টহাসিতে ফেটে পড়ি। পরিচারিকা ভেতরে চলে যায়। গৌতম আর প্রতিবাদ করতে পারে না।

ভদ্রমহিলার কথাবার্তা ও আচার-আচরণ যেমন মধুর, তেমনি ব্যক্তিত্বপূর্ণ। তাঁকেও ভাল লাগে আমাদের।

একটু বাদে কথায় কথায় মিসেস ব্যানার্জী বলেন, "আপনি এতদূর থেকে আমাদের কথা শুনতে এসেছেন, উনি নিশ্চয়ই আপনাকে সব বলবেন। কিন্তু সেইসঙ্গে আমার একটা অনুরোধ রাখতে হবে আপনাদের।"

"বেশ বলুন!"

"মা, মানে আমার শাশুড়ী বলতেন, দুপুরবেলা কেউ বাড়িতে এলে তাঁকে না খাইয়ে ছাড়তে নেই। ছাড়লে গৃহস্থের অকল্যাণ হয়। তাই আজ দুপুরে আপনাদের এখানেই চারটি ডাল-ভাত খেয়ে যেতে হবে।"

এমন প্রস্তাবের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। তাই চট করে প্রতিবাদ করতে পারি না, আর সেই অবসরে মিঃ ব্যানার্জী বলে ওঠেন, "এবারে টের পেলেন কে বেশি নাছোড়বান্দা ?"

সমবেত হাস্যরোল।

হাসি থামলে সবিনয়ে বলি, "আমি মুসাফির মানুষ। আপনার এখানে খেতে আমার কি আপত্তি থাকতে পারে ? তবে বাংলোয় রান্না করতে বলে এসেছি। খাবারটা নষ্ট করা উচিত হবে না।"

"তা তো ঠিকই। বিশেষ করে আপনি একজন অতিথি।" মিঃ ব্যানার্জী সমর্থন করেন আমাকে।

আমি খুশি হই। কিন্তু হায়, মিসেস বলেন, "খাবার নষ্ট হবে কেন, রাতে খেয়ে নেবেন।"

"কিন্তু সাওমা না খেয়ে আমাদের জন্য খাবার নিয়ে বসে থাকবে।" আমি বলি।

"এসব কথা আমি শুনতে রাজী নই। আপনারা এখানে খেয়ে যাবেন, ব্যস।"

আমি অসহায় ভাবে ব্যানার্জীসাহেবের দিকে তাকাই। না, তিনি আর আমার হয়ে ওকালতী করেন না, কেবল একটু হাসেন।

অগত্যা আমাকে বিকল্প প্রস্তাব দিতে হয়। গৌতমকে দেখিয়ে বলি, "ওরা ফিরে যাক। ড্রাইভার আমার খাবারটা খেয়ে নেবে।"

"সেকি! আপনার ছেলে চলে যাবে?"

"কিন্তু এছাডা আর কি করা যায় বলুন?"

বাধ্য হয়ে ওরা সম্মত হলেন। আমি জিজ্ঞেস করি, "ড্রাইভারকে কখন গাডি নিয়ে আসতে বলব?"

"কেন?" মিঃ ব্যানার্জী জিজ্ঞেস করেন।

"আমাকে ফিরতে হবে তো।"

"নিশ্চযই! আপনি তো আর আমার মতো চিরকাল এখানে থাকবেন না। কিন্তু ড্রাইভারকে বলে দিন, ওকে আব ফিরে আসতে হবে না। আমি আপনাকে পৌছে দিযে আসব।

জলখাবার খেযে গৌতম ও ড্রাইভাব উইলিযাম নগরে রওনা হযে গেল। মিসেস ব্যানার্জী চলে গেলেন রান্নাঘবে আর মিস্টার ব্যানার্জীর সঙ্গে আমি ফিবে এলাম ড্রযিংরুমে।

কিন্তু মিঃ ব্যানার্জী বলেন, "এখানে নয। চলুন, পডার ঘরে গিযে বসা যাক। এটা বাইরেব ঘর কেবলি লোকজন আসবে।"

আমি তাঁর সঙ্গে বাডির ভেতরে আসি। ছোট বাডি তবে ভারী সুন্দর সাজানো-গোছানো। কোথাও বাড়াবাডি নেই, কিন্তু সর্বত্র একটা মার্জিত রুচির ছাপ।

আমরা পডার ঘরে এসে বসি। ঘরেব এককোণে একটা ফুলদানিতে কিছু রঙীন ফুল। সেদিকে তাকিযে মিঃ ব্যানার্জী বলেন, "আমরা সাদার চেয়ে রঙীন ফুল বেশি পছন্দ করি।"

আমি তাঁর মুখের দিকে তাকাই। তিনি আবার বলেন, "আমাদের তুজনেরই বযস হয়েছে। ছেলে গৌহাটিতে ডাক্তারী পড়ছে, মেয়ে ছোট, তবু মা থাকতে থাকতে গত বছর তার বিয়ে দিয়ে দিয়েছি। আমার আর বছর তিনেক পরে চাকরি থেকে অবসর নিতে হবে। তাহলেও আমরা বুড়িয়ে যেতে চাই না। আমরা মনে করি আমাদের জীবনের সব রং এখনও ফুরিয়ে যায় নি। তাই আমরা সাদা ফুলের চেয়ে রঙীন ফুল বেশি পছন্দ করি।"

"দেশে আপনার কে কে আছেন?" আমি প্রশ্ন করি।

তিনি উত্তর দেন, "মা ছিলেন, গতবছর চলে গেলেন। এখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। আমার স্ত্রীকে বড় ভালোবাসতেন। আর আমার ছেলে ছিল তাঁর প্রাণ।" একবার থামেন তিনি, তারপরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বলেন, "কলকাতায় দাদা আর বৌদি থাকেন, ওঁদের কোন ছেলে-পুলে নেই। মাঝে মাঝে এখানে এসে কিছুদিন করে কাটিয়ে যান। তবে বাড়ি খালি পড়ে থাকে বলে বেশিদিন থাকতে পারেন না।"

কথায় কথায় আবার বলে ফেলি, "এভাবে নয়, আপনি গোড়া থেকে আপনার কথা বলুন। মানে আপনি যখন প্রথম গারো পাহাড়ে এলেন, তখন থেকে শুরু করুন।"

"করব। কিন্তু বলব না পড়ে শোনাবো।"

"কি পড়ে শোনাবেন?"

"গারো পাহাড়ের পাঁচালি।"

"কিন্তু আমি তো আপনার কথা শুনতে চাইছি!"

একটু হাসেন তিনি। তারপরে বলেন, "আপনি তো জানেন, সমস্ত কর্ম-জীবন আমি এই গারো পাহাড়ে রয়েছি। ফলে এখন আমার আলাদা কোন সত্তা বলে কিছু অবশিষ্ট নেই। আমি আর গারো পাহাড় এক হয়ে গিয়েছি। তাই গারো পাহাড়ের পাঁচালি শুনলে আশা করি, আমার কথাও শোনা হয়ে যাবে।"

"বেশ শুরু করুন।" আমি বলি।

মিস্টার ব্যানার্জী ড্রয়ার খুলে দুখানি লম্বা খাতা বের করে একখানি খাতা খোলেন। কিন্তু পড়তে আরম্ভ করেন না। আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, "আমি ইঞ্জিনীয়ার, পথে-প্রান্তরে আমার কাজ। ঘরের সঙ্গে সম্পর্ক সামান্য, সাহিত্যের সঙ্গে আরও কম। গারো পাহাড়ে জীবন কাটালাম, এখানে বই-পত্তর তেমন পাওয়া যায় না। তাছাড়া সময়ও বড একটা পাই না। তাই লেখক হওয়া দূরের কথা, আমি ভাল পাঠক পর্যন্ত নই। তবু আমি গারো পাহাড়ের পাঁচালি লিখেছি। এ পাঁচালি আপনার কেমন লাগবে আমি জানি না, তবে এতে আপনি আজ থেকে তিরিশ বছর আগেকার গারো পাহাড় সম্পর্কে কিছু কথা জানতে পারবেন।"

"আমি তা-ই শুনতে চাইছি, আপনি পড়তে আরম্ভ করুন।"

তিনি পড়তে শুরু করেন, আমি শুনতে থাকি—

শৈশব, কৈশোর, যৌবন

শৈশব সুন্দর। সব শিশুই মায়ের প্রাণ, বাবার যখের ধন, প্রতিবেশীর আপনজন।

শিশু কৈশরে পা দেয়। বিদ্যালয়ের আঙিনা থেকে যাত্রা করে জীবনের পথে। সে-পথ সরল নয়, সহজ নয়, সুগম নয। সে-পথ বড়ই দুর্গম।

কিশোর যৌবনে পদার্পণ করে। একদিন যারা একসঙ্গে পথ চলা শুরু করেছিল, তারা ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্যে পৌছয। কেউ ভাল হয, কেউ মন্দ। কেউ সাধু, কেউ বা চোর। কেউ মানুষ, কেউ বা অমানুষ।

কেন এমন হয ? সুপ্রিয ভাবে—যারা ভাল হয, যারা মানুষ হয়, তারাও যে বৃত্তি ও পরিবেশের জন্য ভিন্ন জীবন যাপন করে।

সুপ্রিয় ভাবে—কেন এমন হয ?

সুপ্রিয ভেবে চলে—যাদের সঙ্গে সে জীবনের পথে যাত্রা শুরু করেছিল, তারা আজ কোথায ? স্কুলের গণ্ডী ছাড়বার আগেই তো তাদের কতজনের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হোল। যারা ছিল, তাদেরও অধিকাংশ হারিয়ে গেল ইঞ্জিনিযারিং কলেজ প্রাঙ্গণে। যা-ও বা দু-একজন টিঁকে ছিল, তারাই বা আজ কোথায ? কর্মজীবনের প্রারম্ভে সুপ্রিয যে তাদেরও ফেলল হারিয়ে।

শুধু কি তাই। কেবল তো শৈশব-সাথীদের নয, মা দাদা ও বৌদির সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হল। তাদেরও ছেড়ে তাকে চলে আসতে হোল। আসতে হোল চাকরির জন্য। এই যে জীবনের নিযম।

মনে যা-ই থাক, মুখে সেই কথাই সুপ্রিয় মা-কে বলেছে। মা কিন্তু মেনে নেন নি। মানেন নি দাদা, মানে নি বৌদি। তবু সুপ্রিয় এসেছে। এসেছে মাকে ছেড়ে, দাদা ও বৌদিকে ছেড়ে, আত্মীয-বন্ধু সবাইকে ছেড়ে। এসেছে বহুদূরে—গাবো পাহাড়ে।

শৈশব ও কৈশোরের সাথীদের হারিযে যুবক সুপ্রিয় এসেছে গারো পাহাড়ে। সাথীহারা সুপ্রিয কিন্তু ব্যথিত নয়। মানুষ সাথীহারা থাকে না। নতুন-সাথী পুরনো সাথীর শূন্যতা দেয় ভরিয়ে।

অবশেষে বাসযাত্রার যতি পডল। বাস পৌছল তুরা—গারো পাহাড়ের জেলা সদর। ইদানীং কালের নয, একশো বছর আগের।

১৮৬৭ সালে প্রথম বৃটিশ ডেপুটি কমিশনার ক্যাপ্টেন উইলিয়মসন্ দুর্ধর্ষ গারোদের সংযত করার প্রয়োজনে পরীক্ষামূলক ভাবে তুরাতে বাস করতে শুরু করেন। সেই থেকেই তুরা গারো পাহাড়ের জেলা সদর।

বৃটিশরা নাকি গারো পাহাড়কে চারিপাশের জগৎ থেকে আলাদা করে

রেখেছিল। ফলে গারোদের সঙ্গে বাঙালী ও অসমীয়াদের সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। স্বাধীনতা পাওয়ার পরে এই সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়েছে। জাতীয় সরকার গারো পাহাড়ের উন্নয়নে নজর দিয়েছেন। আর তারই ফলে নির্মাণ-বিভাগের সাব-ডিভিশনাল অফিসারের চাকরি নিয়ে সুপ্রিয় আজ আসতে পেরেছে এখানে। এই তুরা শহরে।

তুরা কিন্তু শহরের স্বীকৃতি পেয়েছে মাত্র সেদিন—১৯৬১ সালে। তার আগে গারো পাহাড়ে কোন শহর ছিল না। ১৯৬১ সালের আদমসুমারির পরে দেখা গেল তুরার জনসংখ্যা ৮৮৮৮ জন অর্থাৎ পাঁচ হাজারের বেশি। কেবল তাই নয়, দেখা গেল এখানে প্রতি বর্গমাইলে হাজার লোকের বেশি বাস করে এবং শতকরা পঁচাত্তর জনের জীবিকা কৃষিকার্য নয়। তাই তুরাকে শহরের মর্যাদা দেওয়া হল। তুরা গারো পাহাড়ের একমাত্র শহর।

একে শীতকাল, তার ওপর পূর্ব-ভারত। ঘড়িতে সাড়ে পাঁচটা বাজলেও সন্ধ্যে হয়ে এল প্রায়। তাড়াতাড়ি বাস থেকে নেমে মালপত্র নামাবার ব্যবস্থা করে সুপ্রিয়। মালপত্র কম নয়। বিছানা বাক্স ঝুড়ি টিফিন-ক্যারিয়ার, জলের বোতল—সবই দিয়ে দিয়েছেন মা। অনেক চোখের জল ফেলে নিজের হাতে সব গুছিয়ে দিয়েছেন। তাঁর একেবারেই ইচ্ছে ছিল না চাকরির জন্ত ছোট-খোকা এত দূরে চলে আসে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুপ্রিয়র জেদ তাঁকে মেনে নিতে হয়েছে।

তবে তর্কে হেরে গেলেও তিনি কিছুতেই সুপ্রিয়র যুক্তি মেনে নেন নি। বারবার বলেছেন, সুপ্রিয়র কোনো প্রয়োজন নেই চাকরির জন্য এই পাণ্ডব-বর্জিত দেশে আসার। দু'টি ভাই। বড় ভাই সুব্রত, ভাল চাকরি করেন। বছর ছ'য়েক হল বিয়ে করেছেন, কিন্তু কোনো ছেলে-মেয়ে নেই। দাদার যা আয় তাতে চারটি মানুষের সংসারে অসচ্ছলতার কোনো প্রশ্ন উঠতে পারে না। সুপ্রিয় তাই অনায়াসে আরও কিছুদিন ঘরে বসে থেকে কাছাকাছি কোথাও একটা ভাল চাকরির চেষ্টা করতে পারত।

সুপ্রিয় সে-কথা শোনে নি। ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে ঘরে বসে দাদার অন্ন ধ্বংস করার কোনো সার্থকতা খুঁজে পায় নি। তাছাড়া চাকরিটা মন্দ নয়, গেজেটেড অফিসার। মাইনেও ভাল। তাই সে মা দাদা ও বৌদির কথা না শুনে পাড়ি জমিয়েছে এই সুদূর আসামে—গারো পাহাড়ে। কলকাতা থেকে ট্রেনে গোয়ালপাড়া জেলার বঙ্গাইগাঁও। সেখান থেকে যোগীঘোপা ঘাট। তারপর ষ্টীমারে ব্রহ্মপুত্র পেরিয়ে গোয়ালপাড়া। আজ সকাল সাতটায় বাসে

চেপেছে সেখানে। এতক্ষণে বাসযাত্রার যতি পড়ল। বাস পৌঁছল তুরা।

প্রথম দর্শনেই তুরাকে ভাল লাগে সুপ্রিয়র। চার হাজার ফুট উঁচু একটি শৈল শহর। বনাবৃত পাহাড়ের গায়ে ছোট-ছোট বাড়ি। অধিকাংশই টিন আর কাঠের তৈরি। পাহাড়ের পাদদেশে পথ—রাজপথ। বাসপথও বলা যেতে পারে। সেই পথ থেকে সরু-সরু গলি বাড়ি-ঘরের পাশ দিয়ে উঠে গেছে পাহাড়ে।

এখন তুরা শহরে প্রায় দশ হাজার লোকের বাস। পূর্ব-পাকিস্তান থেকে চলে আসা বহু বাঙালী এখানে বাস করছেন। শহরের আয়তন প্রায় চার বর্গমাইল। জেলা সদরের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত দপ্তরই আছে এখানে। আছে দুটি ব্যাংক, ডাক-তার অফিস, কয়েকটি স্কুল ও একটি কলেজ। আছে ডাক-বাংলো। আছে, কিন্তু কোথায় ?

কয়েকজন মেয়ে ও পুরুষ জমা হয়েছে বাসের কাছে। তাদের মাথায় বড় বড় চুল। গায়ের রং কালো। চ্যাপ্টা নাক। তাদের পোশাকের স্বল্পতা দেখে সুপ্রিয় একটু বিস্ময় বোধ করে।

তবে সে জানে এ কিছুই নয়। গারো পাহাড়ের অনেক গ্রামে নাকি এখনও ছেলেরা ফুট খানেক চওড়া ও ফুট দু'য়েক লম্বা একটুকরো কাপড় কোমরে বেঁধে রাখে। তাতে কেবল সামনের দিকটাই ঢাকা পড়ে। আর মেয়েরা একটু বড় একফালি কালো কাপড় নাভির নিচে শরীরের চারপাশে কোনমতে জড়িয়ে লজ্জা নিবারণ করে। কেউ বা গেঞ্জি গায়ে দেয়, কেউ বা দেয় না। তবে মেয়েরাও ছেলেদের মতোই পাগড়ি বাঁধে আর গয়না পরে।

কিন্তু গয়নার কথা এখন থাক। এখন সুপ্রিয়র এ-সব দেখার সময় নেই। তার রাতের আশ্রয় দরকার। সে বুঝতে পারে এরা সবাই মাল বাহক। নিজের মাল বিশ্রামভবন পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার জন্য এদের একজনকে প্রয়োজন। সে জিজ্ঞেস করে, "ডাকবাংলো কতদূর।"

"কাছেই। আপনার মাল কোথায় ?" একজন লোক ভাঙা বাংলায় উত্তর দেয়।

মালপত্র দেখিয়ে দেয় সুপ্রিয়। হাতের দড়ি দিয়ে তা বেঁধে পিঠে নিয়ে লোকটি বলে, "চলুন।"

সুপ্রিয় তাকে অনুসরণ করে। উৎরাই পথ। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। আঁধার নেমে এসেছে তুরার পথে ও প্রান্তরে। বড় রাস্তার পাশে সারি সারি দোকানে আলো জ্বলেছে। আলো জ্বলেছে পথের ল্যাম্পপোস্টে। কিন্তু আঁধার যায় নি

মুছে। গারো পাহাড়ের আঁধার ঘোচাতে আরও আলোর প্রয়োজন।

আলো-আঁধারী পথ বেয়ে কুলির সঙ্গে সুপ্রিয় ডাকবাংলোর সামনে এসে পৌঁছয়। ছোট বিশ্রামভবন। সামনে এককালি প্রাঙ্গণ তারপর চওড়া বারান্দা। খান কয়েক খালি বেতের চেয়ার। দু'টি ঘর। একটির দরজায় তালা ঝুলছে। আর একটিতে আলো জ্বলছে। কুলি হাঁক দেয় মাতৃভাষায়, মনে হয় চৌকিদারকে ডাকছে। কিন্তু কেউ সাড়া দেয় না। নির্জন বিশ্রামভবন নির্বাক।

কুলি আবার হাঁকে। খোলা ঘরখানির পর্দা ঠেলে বেরিয়ে আসে একটি তরুণী। তার পরনে শাড়ী, মাথায় বেণী, পায়ে চপ্পল। মেয়েটিকে বাঙালী বলে মনে হয়। সুপ্রিয় খুশি হয়। বিদেশ-বিভুঁইয়ে বাঙালী মেয়ে দেখলে কোন্ বাঙালী যুবক না খুশি হয়! সে হাত তুলে নমস্কার করে। মেয়েটি প্রতিনমস্কার জানায়। কিন্তু তারপরেই সে গারো ভাষায় কুলিকে কি যেন বলে।

ভুল বুঝতে পারে সুপ্রিয়। মেয়েটিকে লক্ষ্য করে—না, বাঙালী নয়। বাঙালী মেয়েদের নাক অমন হয় না। তবে মেয়েটি দেখতে বেশ ভালই। গারোদের তুলনায় গায়ের রং বেশ ফর্সা। চোখ দু'টি বড় বড়। নিটোল গাল, প্রশস্ত ললাট। ঠোঁট দু'টি পাতলা। কিন্তু মুখখানি গোল। স্বাস্থ্যটি ভাল—পীনোন্নত বক্ষ, সুডৌল নীতম্ব অথচ সঙ্কীর্ণ কটিদেশ। সব মিলিয়ে সুন্দরী বলা যেতে পারে। ভাল লাগে সুপ্রিয়র। ভাবতে ভাল লাগে—বাসস্ট্যাণ্ডে যাদের দেখেছে, কেবল তাদের নিয়েই গারো পাহাড় নয়। এমন মেয়েও গারো পাহাড়ে আছে।

কুলির সঙ্গে কথা শেষ করে মেয়েটি তার দিকে তাকায়। দু'জনে চোখাচোখি হয়। একটি নীরব মুহূর্ত। সুপ্রিয় চোখ নামিয়ে নেয়। কি বলবে বুঝে উঠতে পারে না।

তাকে কিছু বলতেও হয় না। মেয়েটিই কথা বলে। আর সে কথা বলে অকম্পিত স্বরে। বলে পরিস্কার বাংলায়, "আপনি বোধহয় বাঙালী?"

বিস্মিত সুপ্রিয় কোনোমতে জবাব দেয়, "হ্যাঁ।"

"কিন্তু আজ তো আর চৌকিদারকে পাবেন না। সে বাড়ি চলে গেছে। কাল সকালে আসবে।"

"আমি তা হলে থাকব কোথায়!" অসহায় স্বরে সুপ্রিয় বলে ওঠে।

মেয়েটি মুচকি হাসে। বলে, "আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন না ওখানে।"

সুপ্রিয় ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ে। কুলিও মাল নামায়। সুপ্রিয়

আবার জিজ্ঞেস করে, "কিন্তু আমি থাকব কোথায়? নতুন মানুষ, কিছুই যে জানি না এখানকার।"

এবারে আর মেয়েটি মুচকি হাসে না, অপেক্ষাকৃত গম্ভীর স্বরে বলে, "তাই তো একটু মুশকিল হল। বাজারে অবশ্য হোটেল আছে। কিন্তু আপনি সেখানে থাকতে পারবেন কি!"

"পারতেই হবে।" সুপ্রিয় উঠে দাঁড়ায়। "আপনি আমার এই কুলিকে একটু বলে দিন, কোন হোটেলটা সবচেয়ে ভাল। আমি সেখানেই যাচ্ছি।"

মেয়েটি কিন্তু চট করে কোনো জবাব দেয় না। কি যেন একটু ভাবে। তারপরে বলে, "আপনি একটু বসুন। আমার বাবা বাজারে গেছেন। এখুনি এসে যাবেন। তিনি নিশ্চয়ই আপনাকে একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন।"

"না না, তার দরকার নেই। আপনার বাবার কষ্ট হবে। তার চেয়ে আমি হোটেলে চলে যাচ্ছি। চল হে।" কুলিকে তাড়া লাগায় সুপ্রিয়।

"আপনি বসুন তো। যা বলছি শুনুন!" মেয়েটি যেন আদেশ করে সুপ্রিয়কে।

আরও আশ্চর্য! সে আদেশ সুপ্রিয় অমান্য করতে পারে না। সে আবার চেয়ারে বসে পড়ে। মেয়েটি এবারে জিজ্ঞেস করে, "চা চলবে নিশ্চয়ই।"

"হ্যাঁ, হলে ভালই হয়। কিন্তু আপনার আবার···"

"কষ্ট হবে।" সুপ্রিয় শেষ করার আগেই মৃদু হেসে মেয়েটি বলে ওঠে। তারপরে সে পর্দা ঠেলে ভেতরে চলে যায়। সুপ্রিয় চুপ করে বসে থাকে।

বাইরে নেমে আসছে রাত। অজানা পরিবেশ। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। নিরাশ্রয় সুপ্রিয়। অসহায় সুপ্রিয়। সে ভেবে চলেছে নিজের কথা, মার কথা, দাদা-বৌদির কথা আর এই পাহাড়ী মেয়েটির কথা।

কতক্ষণ বসে এসব ভাবছিল, ঠিক খেয়াল নেই তার, সহসা ভাবনায় ছেদ পড়ে। হ্যাট-কোট পরিহিত একজন স্বাস্থ্যবান প্রৌঢ় উঠে এসেছেন ডাক-বাংলোর বারান্দায়। তাঁর হাতে একটি বেতের ঝুড়ি। সুপ্রিয় তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায়। নমস্কার করে। ভদ্রলোক প্রতিনমস্কার করে ইংরিজিতে বলেন, "দাঁড়ালেন কেন? বসুন। আপনি বোধহয় বাঙালী।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

ঠিক তখনি আঁচলে হাত মুছতে মুছতে মেয়েটি বারান্দায় আসে। ভদ্র-লোকের হাত থেকে ঝুড়িটা হাতে নিয়ে নিজেদের ভাষায় তাঁকে কি যেন বলে কিছুক্ষণ ধরে। সুপ্রিয় চুপ করে থাকে। মেয়েটি ঝুড়ি নিয়ে ভেতরে চলে যায়।

ভদ্রলোক একখানি চেয়ারে বসে বাংলায় বলেন, "আগে আসুন চা খেয়ে নেয়া যাক্, তারপরে আপনার আশ্রয়ের কথা ভাবা যাবে।"

"কিন্তু রাত বেশি হলে কি আর হোটেলে জায়গা পাওয়া যাবে?" সুপ্রিয় বলে।

"তা পাওয়া যাবে বৈকি! আর না পাওয়া গেলেই বা অত চিন্তার কি আছে। আপনি এখানেই থাকবেন।"

"কিন্তু চৌকিদার যে চাবি নিয়ে চলে গেছে!"

"চাবির কি দরকার? আপনি এ ঘরেই থাকবেন।"

"এই ঘরে—?"

"হ্যাঁ। আমাদের সঙ্গে থাকবেন। আমরা তো মোটে দু'জন। ঘরখানা বেশ বড়। আপনার সঙ্গে নিশ্চয়ই বিছানাপত্র আছে।"

"হ্যাঁ। তা আছে। কিন্তু—" সুপ্রিয় শেষ করে না।

"কেন আপনার কোনো অসুবিধা হবে কি?"

"না। আমি আশ্রয়হীন, আশ্রয় পেলে আমার অসুবিধে হবে কেন? আমি ভাবছি আপনাদের কথা।"

"আমার অসুবিধে! না, না, আমার কোনো অসুবিধে হবে না।"

"ঠিক আপনার নয়—মানে আপনার মেয়ের—" সুপ্রিয় ঢোক গেলে।

"মানে শেলীর—" বলেই ভদ্রলোক জোরে জোরে মেয়েকে ডাকতে শুরু করেন।

হাতের কাজ ফেলে ছুটে আসে মেয়েটি।

ভদ্রলোক বাংলাতেই বলেন, "আচ্ছা—কি যেন নাম আপনার?"

"সুপ্রিয় বোস।"

"হ্যাঁ। মিস্টার বোস যদি আজ রাতে এখানে, মানে আমাদের এই ঘরে থাকেন, তাহলে কি তোর কোনো অসুবিধা হবে?"

শেলী কোনো জবাব দেয় না। চুপ করে থাকে।

ওরা দু'জনে শেলীর দিকে তাকায়। শেলী এখনও মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। তাহলে কি তার আপত্তি আছে? নিশ্চয়ই আছে। নইলে সে চুপ করে আছে কেন? হয়তো শেলী ভেবে নিয়েছে সুপ্রিয়ই তার বাবার কাছে প্রস্তাবটা করেছে। ছিঃ ছিঃ, লজ্জায় তার মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছা করছে।

"আমরা পাহাড়ী মেয়ে।" শেলী মুখ তোলে, "আমাদের ইজ্জত অত

ঠুন্‌কো নয় মিস্টার বোস। তাছাড়া আপনি পরদেশী, আপনাকে আশ্রয় দেওয়া আমাদের ধর্ম।"

হো হো করে হেসে ওঠেন শেলীর বাবা। হাসি থামলে বলেন, "আমি আগেই জানতাম তুই একথা বলবি। বুঝলেন মিস্টার বোস, শেলী আমার মিশনারী কলেজে-পড়া মেয়ে।"

বিমুগ্ধ সুপ্রিয় তখনও শেলীর মুখের দিকে তাকিযে আছে। তার দিকে নজর পড়ে শেলীর। সুপ্রিয় তাডাতাড়ি চোখ নামিয়ে নেয়।

একটু হেসে শেলী বলে, "কি ভাবনা দূর হল? এবারে জিনিসপত্র ঘরে এনে কুলিটাকে ছেড়ে দিন। বাথরুমে গিযে হাত মুখ ধুযে নিন। তারপরে বাক্স খুলে গরম জামা বের করে পরে ফেলুন। কলকাতা থেকে এসেছেন, ঠাণ্ডা লেগে যাবে। আমি ততক্ষণে চা-খাবার নিয়ে আসছি।" কথা শেষ করে ঘরে ঢুকতে গিযে থমকে দাঁড়ায় শেলী। সে পেছন ফেরে। সুপ্রিযর সামনে এসে শান্ত স্বরে বলে, "আচ্ছা একটা কথা তো আপনাকে জিজ্ঞেস করা হয় নি, আপনি কি আমার রান্না খাবেন?"

"হঠাৎ এ প্রশ্ন?" সুপ্রিয় বিস্মিত।

ক্ষীণ কণ্ঠে শেলী উত্তর দেয, "না, আমরা যে খৃষ্টান।"

এবারে হাসির পালা সুপ্রিযর। তার সঙ্গে শেলীর বাবাও যোগ দেন। একটু পরে সুপ্রিয বলে, "আপনার রান্না তো রাজভোগ। যারা দু'শো বছর এই দেশে রাজত্ব করেছেন, আপনারা তাদেরই ধর্মগ্রহণ করেছেন। যাক্‌গে, জলখাবারটা তাড়াতাড়ি নিযে আসুন তো, বড্ড খিদে পেযেছে।"

এবারে বাবার সঙ্গে মেযেও হেসে ফেলে। বাবা বলেন, "তোর যেমন সব উদ্ভট প্রশ্ন, স্বাধীন ভারতের মডার্ন ইযংম্যানরা এসব মানে নাকি?"

হাসতে হাসতে শেলী চলে যায।

চায়ে চুমুক দিযে সুপ্রিয় শেলীর বাবাকে বলে, "আপনার নামটা কিন্তু এখনও জানা হয় নি।"

"উইলিযম মোমিন। আমরা গারোরা প্রধানতঃ তিনটি মাচং বা সম্প্রদায়ে বিভক্ত। মাচং তিনটি হল সাঙমা, মারাক ও মোমিন।"

"কিন্তু একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না, আপনারা এত ভাল বাংলা শিখলেন কেমন করে?"

"আমাদের সঙ্গে আপনাদের যোগাযোগ যে সুদীর্ঘ কালের। এমনকি গারো নামটিও সম্ভবতঃ আপনাদেরই দেওয়া।"

"কি রকম ?" সুপ্রিয় প্রশ্ন করে।

উইলিয়ম বলেন, "আপনি জানেন, এ জেলার পশ্চিমে রংপুর আর দক্ষিণে ময়মনসিংহ। রংপুরের দিকে ব্রহ্মপুত্র প্রবাহিত বলে ময়মনসিংহ দিয়েই আমরা সমতলের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতাম। বৃটিশরাও ঐ দিক দিয়েই আমাদের জেলায় এসেছে। কথিত আছে ময়মনসিংহ জেলার উপকণ্ঠে এই পাহাড়ী জেলায় গারা নামে এক উপজাতি বাস করতেন। ময়মনসিংহের মানুষেরা তাদের বলতেন গারো আর তাদের এই বাসভূমিকে বলতেন গারো পাহাড়।" একবার থামেন উইলিয়ম। তারপরে আবার বলেন, "আমরা কিন্তু নিজেরা নিজেদের কাছে কখনও গারো বলে পরিচয় দিই না।"

"কি বলেন ?"

"বলি আচিক মানে পাহাড়ী অথবা আচিক মান্দে মানে পাহাড়ী মানুষ।"

"আমি শুনেছি", সুপ্রিয় বলে, "আপনাদের পূর্ব-পুরুষরা যখন তিব্বত থেকে এদেশে আসেন, তখন তাঁদের নেতার নাম ছিল গারু। তার নাম থেকেই নাকি গারো নামটি এসেছে।"

"হ্যাঁ, এ রকম একটা মত আছে। তবে আমার বিশ্বাস এটি সত্য নয়। যাক্ গে, যেকথা বলছিলাম—বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ সুদীর্ঘ কালের। বাঙালী জমিদাররাই গারো পাহাড়ের অধিকাংশ জায়গার মালিক ছিলেন। আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য সবই ছিল বাঙালীদের সঙ্গে। বাংলা ছিল আমাদের কাছে অপরিহার্য। তাই এখনও সমস্ত শিক্ষিত গারোরাই বাংলা বলতে পারে। তাছাড়া গোয়ালপাড়া জেলায় বাংলা খুবই জনপ্রিয়। ব্যবসা বাণিজ্য ও লেখাপড়ার জন্য আমাদের সব সময়েই গোয়ালপাড়া যেতে হয়। এই দেখুন না, আমার মেয়ে তুরার স্কুল থেকে পাশ করে এখন গোয়ালপাড়ায় পড়ছে।"

"কি পড়ছে ?"

"হায়ার সেকেণ্ডারী। এবারে পরীক্ষা দেবে। টেস্ট হয়ে গেছে। তাই বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি।"

"আপনাদের বাড়ি কোথায় ?"

"এখান থেকে পঁচিশ মাইল দূরে রং-রেন-গিরি গ্রামে।

"রংগ্রাম এখান থেকে কত দূরে ?"

"পাচ মাইল।"

"আমি রংগ্রামে যাচ্ছি।"

"আরে তাই নাকি!" প্রায় লাফিয়ে ওঠেন উইলিয়ম, "আমাদেরও যে রংগ্রাম হয়েই যেতে হবে। তাহলে তো আমরা একসঙ্গেই যেতে পারি। বেশ গল্প করতে করতে পথ চলা যাবে।"

"খুবই ভাল হয়। তবে আমাকে যে কাল সকালে ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে দেখা করে কাজকর্ম বুঝে নিতে হবে। আমি তো সকালে রওনা হতে পারব না।"

আমিও এখানকার কাজ শেষ করতে পারি নি। আমরা কাল খাওয়া-দাওয়া সেরে বেলা এগারটা নাগাদ রওনা হব। কি বলিস শেলী?"

সুপ্রিয় দরজার দিকে তাকাল। জলখাবার নিয়ে শেলী দাঁড়িয়ে আছে। কখন এসেছে টের পায় নি সুপ্রিয়। দুজনের চোখে দুজনের চোখ পড়ে।

শেলী চোখ নামিয়ে নেয়। সুপ্রিয়র সামনে খাবারের থালা রেখে নিঃশব্দে উইলিয়মের কাছে যায়। কোন কথা বলে না। সুপ্রিয় বিচলিত হয়। তবে কি শেলী তাকে পথের-সাথী করে নিতে চায় না?

উইলিয়ম কিন্তু মেয়েকে আবার বলেন, "মিঃ বোস রংগ্রামে যাচ্ছেন। আমরা একসঙ্গেই যাব। কি বলিস?"

"কি বলব আবার।" শেলী গম্ভীর স্বরে বলে, "গারো পাহাড়ের দুর্গম পথে যে কোন নবাগতেরই একা পথ-চলা কষ্টকর। পরিচয় যখন হয়েছে, ওঁকে আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যেতেই হবে।"

একান্ত অপ্রয়োজনেই খুব সকালে সুপ্রিয়র ঘুম ভেঙে গেল। নিদ্রা কোনো প্রয়োজনকে মেনে চলে না, দেহ আর মনের তাগিদে সে আসে আর যায়। তাই ইচ্ছা করলেই যেমন জেগে থাকা যায় না, তেমনি ঘুমও ভাঙে আকস্মিক ভাবে।

কাঁচের জানলা দিয়ে ভোরের প্রথম আলো এসে লুটিয়ে পড়েছে ঘরে। কিন্তু তাতে আঁধার ঘোচে নি। আলো আর আঁধারে রচিল যে খেলা, তাই দেখতে দেখতে সুপ্রিয় পাশ ফিরল। ওপাশের খাটে উইলিয়ম। আর ওদের দু'জনের মাঝে মেঝেতে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে শেলী। উষার আলোয় ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। শাশ্বতী মানবী—যার কোনো দেশ নেই, জাতি নেই,

ধর্ম নেই। সে সকল দেশের, সকল কালের, সকল জাতির, সকল ধর্মের।

শেলীর গায়ে একখানা পাতলা চাদর। হৃৎস্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে চাদরখানি দুলছে। ওর বুক দুলে দুলে উঠছে, ওর মোমের মতো কোমল শরীরটা ফুলে ফুলে উঠছে। সুপ্রিয়র বড় ভাল লাগে শেলীকে। কেমন একটা অভূতপূর্ব অনুভূতিতে তার সারা মন আচ্ছন্ন হয়ে যায়। সে অপলক নয়নে শেলীর দিকে তাকিয়ে থাকে।

"আপনার বুঝি সকালে ওঠার অভ্যেস?"

আচমকা প্রশ্নে বিব্রত বোধ করে সুপ্রিয়। শেলী চেয়ে আছে তার দিকে। সুপ্রিয়র অমন করে তাকিয়ে থাকা নিশ্চয়ই সে দেখেছে। কোনোমতে ঢোক গিলে বলে, "না, আজই কেন যেন ঘুমটা ভেঙে গেল। আপনার?"

"আমারও তাই।"

"আপনি কখন জেগেছেন?"

"অনেকক্ষণ।"

আবার চমকে ওঠে সুপ্রিয়। শেলী কি এতক্ষণ জেগেই ছিল! তাহলে তো সে দেখেছে সুপ্রিয়র তাকিয়ে থাকা। নিজেকে অপরাধী মনে হয়। মনে হয় শেলী হয়তো একে প্রকৃতির প্রতি পুরুষের কাঙালপনা বলেই মনে করেছে। কিন্তু সে তো শেলীর চোখ দু'টো বন্ধ দেখেছিল। তাহলে কি শেলীও তার দৃষ্টির অগোচরে সুপ্রিয়কে দেখছিল? চোখাচোখি হবার ভয়ে চোখ বন্ধ করেছিল!

সুপ্রিয়র চিন্তাতে বাধা পড়ে। শেলী প্রশ্ন করে, "আচ্ছা আপনি কি আমাদের ভুলে যাবেন?"

"হঠাৎ এ কথা বলছেন কেন?"

"আপনারা সভ্য ও শিক্ষিত। আমাদের কথা কি মনে থাকবে আপনার?"

"মানুষের পরিচয় তার মন। গারো পাহাড়ের মানুষ অসভ্য ও অশিক্ষিত কিনা জানি না। কিন্তু ইতিমধ্যেই তাদের যে উদার ও সুন্দর মনের পরিচয় পেয়েছি, সে মন আমাদের দেশে সচরাচর মেলে না। আর আমি কেমন করে আপনাদের এ অযাচিত উপকার ভুলে যাব? এতটা অকৃতজ্ঞ হব? আপনারা একজন অজ্ঞাতকুলশীল নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিয়েছেন, আপনাদের ভুলে যাওয়া যে সম্ভব নয় আমার পক্ষে।"

শেলী আর কোনো কথা বলে না। কিছুক্ষণ শুয়ে থাকে। তারপরে উঠে বসে। অবিন্যস্ত বেশ-বাস ঠিক করে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

খানিকক্ষণ বাদে শেলী ঘরে আসে। সুপ্রিয় আশায় থাকে, সে কিছু বলবে। কিন্তু শেলী নিঃশব্দে নিজের কাজ করে যায়।

সুপ্রিয় কিছু বলতে চায। কিন্তু কি বলবে? কিছুই ভেবে উঠতে পারে না। ভাবতে ভাবতে সময় কেটে যায়, শেলী আবার চলে যায়। আর সুপ্রিয় ভেবে চলে শেলীর কথা।

কিছুক্ষণ বাদে তু'কাপ চা নিয়ে শেলী ঘরে আসে। নিঃশব্দে এক কাপ চা এগিয়ে ধরে সুপ্রিয়র সামনে। তাড়াতাড়ি উঠে বসে সুপ্রিয়। কাপটা হাতে নেয়। শেলী অন্য কাপটি নিয়ে উইলিয়মের কাছে যায়। তাঁকে ডেকে তুলে চায়ের কাপটা তাঁর হাতে দেয়। শেলী আবার চলে যায় রান্নাঘরে।

উইলিয়ম বলেন, "গুড মর্নিং মিস্টায় বোস।"

প্রভাতী রোদ এসেছে ঘরে। তুরার বিশ্রামভবন আলোয় আলোময়।

ডিস্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার সুপ্রিয়কে কাজ-কর্ম সব বুঝিয়ে দিলেন। দিলেন পরামর্শ ও উপদেশ। ভদ্রলোককে ভালই লাগে সুপ্রিযর। কিন্তু ফিরে আসতে অনেক দেরী হয়ে। সে যখন ডাকবাংলোয় ফিরে এলো, বেলা তখন প্রায় একটা।

শেলী বসে আছে বারান্দায়। কেন? সে কি তারই প্রতীক্ষারতা? না, না, তা কেন হবে? সুপ্রিয় কে, যে তার জন্য বসে থাকবে শেলী! সে এমনি বসে আছে। খাওয়ার পরে বিশ্রাম করছে। জায়গাটি ভারী সুন্দর।

তাহলেও সুপ্রিয় লজ্জিত হয়। তারই জন্য শেলী আজ বাড়ি যেতে পারল না। সকালে রওনা হলে ওরা এতক্ষণে প্রায় অর্ধেক পথ পেরিয়ে যেত। সুপ্রিয় সঙ্গে যাবে বলে ওরা রওনা হতে পারে নি। সুপ্রিয় বলে গিয়েছিল, ন'টার মধ্যে ফিরে আসবে। অবশ্য সেই বা বুঝবে কেমন করে যে ডিস্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার অত সকালে কোয়ার্টারে থাকবেন না, ইনসপেক্‌শানে বেরিয়ে যাবেন। সুপ্রিয় কি করবে, তাকে যে ঠায় বসে থাকতে হল এগারোটা পর্যন্ত। কাজ-কর্ম বুঝে নিতে বাকি সময়টা চলে গেল।

বারান্দায় উঠে আসে সুপ্রিয়। শেলীও উঠে দাঁড়ায়। একটু হেসে সুপ্রিয় বলে, "কি, খুব চটে গেছেন তো।"

শেলী চুপ করে থাকে। সুপ্রিয় আবার বলে, "সত্যি বড্ড দেরি হয়ে গেল। কিন্তু কি করব বলুন, নতুন চাকরি। আজ বোধহয় আর রওনা হওয়া যাবে না। ছিঃ ছিঃ আপনাদের একটা দিন নষ্ট করে দিলাম।"

এবারে শেলী কথা বলে, "পেটে কিছু পড়েছে, না বড়সাহেবের উপদেশামৃত পান করেই জঠরজ্বালা মেটাতে হয়েছে ?"

হো হো করে হেসে ওঠে সুপ্রিয়।

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে শেলী জিজ্ঞেস করে, "অমন করে হেসে উঠলেন যে, হাসির কি হল ?"

"নিশ্চয়ই কিছু একটা হয়েছে। নইলে হাসছি কেন ?"

উইলিয়ম বেরিয়ে আসেন ঘর থেকে। জিজ্ঞেস করেন সুপ্রিয়কে, "কি ব্যাপার ?"

"আপনার মেয়ে সত্যি চমৎকার বাংলা বলেন।" সুপ্রিয় হাসতে হাসতে বলে।

"বলবেই তো। ও যে ছোট-বেলা থেকে বাঙালী মেয়েদের মধ্যে মানুষ। তাছাড়া আর একটা মজার কথা কি জানেন···"

শেলী উইলিয়মকে ধমক দেয়, "আবার তুমি ঐ সব আজেবাজে কথা আরম্ভ করলে।" একবার থামে শেলী। তারপরে সুপ্রিয়কে বলে, "আমি কিন্তু আমার বাংলা বলার তারিফ শুনতে চাই নি, শুনতে চেয়েছি—যার কাছে এতক্ষণ ছিলেন, তিনি কি কিছু খেতে দিয়েছেন ?"

"হ্যাঁ।" সুপ্রিয় ঢোক গেলে।

"কি ?" শেলী তার দিকে তাকায়।

"চা · বিস্কুট·· আর···"

"না। আর কিছু নয়। কেন বানিয়ে বলার চেষ্টা করছেন ! আমি জানতাম চা-বিস্কুটের বেশি আর কিছু জুটবে না। অথচ যাবার সময় যখন বললাম, একটু দেরি করুন, খাবার বানিয়ে দিচ্ছি, তখন জোর গলায় বলা হয়েছিল—ডিস্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার নিশ্চয়ই ব্রেকফাস্ট খাওয়াবেন।" শেলী থামে।

সুপ্রিয় অপরাধীর মত চুপ করে থাকে।

উইলিয়ম মুচকি হাসছেন।

শেলী আবার বলে, "বাথরুমে জল রাখা হয়েছে। তাড়াতাড়ি স্নানটা সেরে নিয়ে খেতে বসলে বাধিত হই। আমার বড্ড খিদে পেয়েছে।"

"সেকি আপনারা খান নি এখনও !" সুপ্রিয় বিস্মিত।

শেলী কোন উত্তর দেয় না।·

উইলিয়ম বলেন, "আমি খেয়ে নিয়েছি, অসময়ে খেলে আমার আবার অম্বল হয়। শেলী খায় নি, আপনার জন্ত বসে আছে।"

"ছিঃ ছিঃ, কি কাণ্ড বলুন দেখি! কি দরকার ছিল আমার জন্ম বসে থাকার ?"

"সে প্রশ্নের মীমাংসা না হয় পরেই হবে, এখন স্নান করতে যাবেন কি ?" শেলীর কণ্ঠে উষ্মা।

"হ্যাঁ, এই যাচ্ছি।" সুবোধ বালকের মতো সুপ্রিয় ঘরে প্রবেশ করে।

খাওয়া শেষ হতে দুটো বেজে যায়। কিচেন থেকে সুপ্রিয় ঘরে আসে। উইলিয়ম বিছানায় উঠে বসেন। বলেন, "আজ যে আমাদের যাওয়া হচ্ছে না, সে-কথা শেলী নিশ্চয়ই আপনাকে বলেছে।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। এখন রওনা হলে নাকি রংগ্রামে পৌছতেই রাত হয়ে যাবে। তা বেশ তো, কাল সকালেই যাওয়া যাবে।" সুপ্রিয় বলে।

"হ্যাঁ, তাই ভাল হবে। আমরা রংগ্রামে পৌছে আপনার কোয়ার্টার্সে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করে নিতে পারব।"

"তা তো করতেই হবে। কেবল বিশ্রাম কেন, আপনারা আমার ওখানে লাঞ্চ সেরে নেবেন। ঘোড়াওয়ালা মাল নিয়ে খুব ভোরে রওনা হয়ে যাচ্ছে, তার কাছে খবর দিয়ে দেব। আপনাদের জন্য রান্না করে রাখবে।"

"বেশ তো আপত্তির কি আছে।" উইলিয়ম বলেন, "ঠিক কথা, চৌকিদার এসেছিল। আমি পাশের ঘরের চাবিটা রেখে দিয়েছি। আপনি ইচ্ছে করলে, এখন ও ঘরে গিয়ে বিশ্রাম নিতে পারেন।"

শেলী ঘরে আসে। সে বাসন মেজে রান্নাঘর গুছিয়ে রেখে তবে ঘরে এলো। শেলী বলে, "হ্যাঁ এই নিন চাবি।" সে ব্র্যাকেটে ঝুলিয়ে রাখা লেডিজ-ব্যাগটার দিকে হাত বাড়ায়।

বাধা দেয় সুপ্রিয়, "না, না, এখন চাবির দরকার নেই।"

"আপনি তাহলে এ ঘরেই বিশ্রাম করুন, বাবার সঙ্গে কথাবার্তা বলুন, আমি পাশের ঘরে যাচ্ছি।"

"না।" সুপ্রিয় শেলীকে বলে, "আপনি এ ঘরেই থাকুন।"

শেলী বিস্মিতা। কি বলছে সুপ্রিয় ?

"আমি একটু বের হব।" সুপ্রিয় বলে।

"কোথায় যাবেন ?"

"জানি না।"

"মানে ?"

"আজ যখন থাকতেই হল এখানে, তখন শহরটাকে একটু ঘুরে দেখব না!"

"কিন্তু যাবেন কোথায়?" উইলিয়ম বলেন।

"যাব আর কোথায়, রাস্তায় রাস্তায় পায়চারি করব!" সুপ্রিয় জবাব দেয়।

"বেশ তো যান না। কিন্তু আপনার যে অচেনা শহর।" উইলিয়ম যেন চিন্তিত।

"তাতে কি হয়েছে?" সুপ্রিয় বলে, "আমি জিজ্ঞেস করে করে সারা শহর টহল দিয়ে, ঠিক ঘুরে আসব দেখবেন।"

"জানি তা পারবেন, আপনি কলকাতার ছেলে। কিন্তু তার দরকার কি? শেলী যাক্ না আপনার সঙ্গে।" উইলিয়ম শেলীর দিকে তাকান। বলেন, "তুই তো কাল থেকে একদম ঘরের বাইরে যাস নি।"

প্রস্তাবটা মন্দ নয়। সুপ্রিয় পুলকিত হয়। কিন্তু শেলী যে চুপ করে আছে। সে শেলীর দিকে তাকায়। দুজনে চোখাচোখি হয়। শেলী মুখ ফিরিয়ে নেয়।

উইলিয়াম আবার শেলীকে বলেন, "যা না, মিস্টার বোসকে তুরা শহর দেখিয়ে নিয়ে আয়। কলকাতার মানুষ হলেও, আমাদের এই ছোট্ট শহরটিকে ওর খুব খারাপ লাগবে না।"

"কিন্তু তুমি যে একা থাকবে।" শেলী বাবাকে বলে।

"তাতে কি হয়েছে? আমি বেশ থাকব। বিকেলে বাজারে গিয়ে চা খেয়ে আসব। তোরা ঘুরে আয়।"

"কিন্তু যার সঙ্গে যেতে বলছ, তিনি যে একেবারে নীরব। আমি সঙ্গে গেলে তার আবার কোন অসুবিধে হবে না তো?"

সুপ্রিয় কিছু বলতে পারার আগেই, উইলিয়ম বলে ওঠেন, "অসুবিধে কেন, বরং ওর সুবিধেই হবে। তুই ওকে সব দেখিয়ে আনতে পারবি।"

"তাহলে " শেলী শেষ করতে পারে না।

"তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিন। আপনি আমার সহযাত্রী হচ্ছেন।" সুপ্রিয় শেষ করে।

আধঘণ্টার মধ্যে ওরা পথে বেরিয়ে পড়ে। পাথরের সঙ্কীর্ণ পথ। জনবিরল পথ। ওরা বড় রাস্তায় আসে। শেলী জিজ্ঞেস করে, "কোন দিকে যাবেন?"

"যে দিকে আপনি নিয়ে যান।"

"অতটা নির্ভর করা কি উচিত হবে?" শেলী সুপ্রিয়র দিকে তাকায়।

"করতেই যখন হবে, তখন পুরোপুরি নির্ভর করাই ভাল নয় কি ?"

"তাই ভাল বুঝি ?"

"হ্যাঁ।"

"তাহলে তাই করুন। চলুন বাজারে যাওয়া যাক্।"

"বেশ চলুন।"

ওরা বাজারের পথে এগিয়ে চলে।

ছোট বাজার। মুদি-মনোহারী, হোটেল-রেস্তোরাঁ, ডাক্তারখানা, দর্জি, পোশাক ও আসবাবের দোকান। আর কয়েকটি আড়ত।

সুপ্রিয় শুনেছে শতকরা নব্বুই জনের বেশি গারোদের জীবিকা কৃষিকার্য। চাষের সঙ্গে তারা অবশ্য পশুপালন, সুতোকাটা ও বেত-বোনার কাজ করে। কিন্তু শস্য নয়, তুলাই গারো পাহাড়ের প্রধান কৃষিজাত সম্পদ। তার পরে বাঁশের স্থান। গারো পাহাড় বনময়। ৩১৫২ বর্গমাইল বিস্তৃত জেলায় বনের আয়তন প্রায় ২৮০৯ বর্গমাইল। কিন্তু গাছ নয়, বাঁশই বনের প্রধান সম্পদ। তুরা বাজারে তাই বাঁশ ও তুলার অনেকগুলি আড়ত দেখতে পাচ্ছে সুপ্রিয়।

দেশ-বিভাগের আগে গারো পাহাড়ের তুলা ও বাঁশ তুরা থেকে রংপুর ও ময়মনসিংহের মধ্য দিয়ে সমতলে রপ্তানী হত। শুধু গারো পাহাড় নয়, সংযুক্ত খাসিয়া জয়ন্তিয়া ও মিজো পাহাড় জেলার আমদানী-রপ্তানীও রংপুর এবং ময়মনসিংহের ভেতর দিয়েই হত। বৃটিশ আমলে গারো পাহাড় আসামের অন্তর্ভুক্ত থাকলেও তখন বাংলাই তুরার এই বাজার নিয়ন্ত্রণ করত।

১৮৭৬ সালে তুরা বাজারে পঁয়ত্রিশটি দোকানের অধিকাংশই ছিল বাঙালীর দোকান।

মুর্শিদাবাদের রাজা মেজরাজবাহাদুর ছিলেন সবচেয়ে বড় মহাজন। তাঁর একজন প্রতিনিধি এখানে থেকে ব্যাসা পরিচালনা করতেন।

আর আজ ? সুপ্রিয় দুঃখের সঙ্গে ভাবে, আজ তুরা বাজারে বাঙালীর স্থান নেই। কিন্তু সে-স্থান গারো পাহাড়ের মানুষরা দখল করতে পারে নি।

তুরা বাজার অনেক বড় হয়েছে। অথচ তাতে গারো পাহাড়ের মানুষদের কোন সুবিধে হয় নি। দেশ-বিভাগের পরে রংপুর ও ময়মনসিংহের সঙ্গে গারো পাহাড়ের সম্পর্ক ঘুচেছে। আমদানী-রপ্তানীর সহজ পথ রুদ্ধ হয়েছে। বিকল্প ব্যবস্থা অপর্যাপ্ত। ফলে তুরা বাজারে আমদানীর দাম বেড়েছে, রপ্তানীর দাম কমেছে। জনজীবনে অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দিয়েছে। গারো পাহাড়ের দরিদ্র মানুষেরা দরিদ্রতর হয়ে পড়েছে।

"আমি চলে যাব কি ?"

শেলীর আকস্মিক প্রশ্নে সুপ্রিয় চমকে ওঠে, সে বাস্তবে ফিরে আসে। তাড়াতাড়ি বলে, "না, না, চলে যাবেন কেন ?"

"মনে হচ্ছে আমি সঙ্গে আসায় আপনার অসুবিধা হচ্ছে।"

"এমন মনে হবার কারণ ?"

"আপনি কথা বলছেন না।" শেলী উত্তর দেয়।

"দুঃখিত", সুপ্রিয় বলে, "বলুন, কি বলব ?"

শেলী হেসে ওঠে, "তাও বুঝি আমাকে বলে দিতে হবে।"

"হ্যাঁ।"

"তাহলে বলুন, এতক্ষণ অমন চুপ করে ছিলেন কেন ?"

"এমনি।" একবার থামে সুপ্রিয়, "এই একটু ভাবছিলাম আর কি।"

"কার কথা ? যাকে একা ছেড়ে আসতে হয়েছে, তার কথা কি ?"

সুপ্রিয় একটু হাসে। বলে, "আমি তো কাউকে একা ছেড়ে আসি নি।" একবার থামে সে। তারপরে আবার বলে, "তেমন কেউ এখনও আসে নি আমার জীবনে।"

শেলী চুপ করে থাকে। সুপ্রিয়ও নীরব।

সহসা শেলী বলে, "তাহলে কার কথা ভাবছিলেন ?"

"আপনার কথা।" সুপ্রিয় উত্তর দেয়।

শেলী চমকে ওঠে, "মানে ?"

"মানে, গারো পাহাড়ের মানুষদের কথা।"

"আপনি তাহলে আমাদের মানুষ বলে মনে করেন ?" তীক্ষ্ণ কণ্ঠে শেলী প্রশ্ন করে।

"নিশ্চয়ই।" সুপ্রিয় শান্ত স্বরে উত্তর দেয়।

"আপনার সমাজের অনেকেই কিন্তু করেন না।"

"জানি। কিন্তু আমি তাদের দলে নই।"

"জেনে খুশি হলাম।"

হাঁটতে হাঁটতে ওরা বাজারের শেষে এসে পৌছয়। সুপ্রিয় বলে, "এর পরে কোথায় যাবো !"

"চলুন কলেজ ও ডেপুটি কমিশনারের অফিসটা দেখে আসা যাক্।"

"ডেপুটি কমিশনারের অফিস আমি সকালেই দেখেছি আর কলেজেরই বা কি দেখব। তার চেয়ে চলুন ওপরে যাওয়া যাক্।"

"ওপরে ?"

"হ্যাঁ। চলুন না পাহাড়ের ওপর থেকে ঘুরে আসি। শুনেছি, ওখান থেকে ব্রহ্মপুত্রকে বড়ই সুন্দর দেখায়।"

"কেবল ব্রহ্মপুত্রের শতাধিক মাইল আঁকাবাঁকা প্রবাহ নয়, গারো পাহাড় জেলাকেই ওখান থেকে ছবির মতো দেখায়। আকাশ পরিষ্কার থাকলে দেখা যায় কাঞ্চনজংঘায় ধবলরেখা। কিন্তু ··" শেলী নিজের হাতঘড়ি দেখে। বলে, "চারটে বাজে, ওখান থেকে ফিরে আসতে রাত হয়ে যাবে যে—অন্ধকার রাত।"

"কেন ভয় করবে কি ?" সুপ্রিয় একটু হাসে।

"ভয় ?" শেলী হাসে, "তা করবে বৈকি, অন্ধকারকে তো ভয় করাই উচিত।"

"আপনি নির্ভয়ে থাকুন।"

"বেশ। চলুন।"

ওরা চড়াই পথ বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করে। একটু বাদে শেলী বলতে থাকে, "গারো পাহাড় জেলার প্রধান দুটি গিরি শ্রেণী হল তুরা ও আরবেলা। এই তুরা গিরিশ্রেণী জেলার প্রায় মধ্যস্থলে পুব থেকে পশ্চিমে প্রসারিত হয়েছে। আরবেলা এর সমান্তরাল আর উত্তরে অবস্থিত। তুরা গিরিশ্রেণীর উচ্চতম শৃঙ্গ হল নোকরেক—৪৬৫২ ফুট উঁচু। ঐ যে দেখা যাচ্ছে।" শেলী ইশারা করে।

সুপ্রিয় জিজ্ঞেস করে, "এখান থেকে কতটা দূর ?"

"খুবই কাছে মনে হচ্ছে, তাই না ?"

"হ্যাঁ। মনে হচ্ছে, যেন খানিকটা ছুটে গেলেই ওর কাছে পৌছন যাবে।"

"পাহাড়ে অমনি মনে হয়। নোকরেক এখান থেকে প্রায় আট মাইল।"

"আচ্ছা, আমাদের এই পাহাড়টা নোকরেক থেকে নেমে আর তো উঁচু হয় নি।"

"না, নোকরেক থেকে গিরিশ্রেণীটা আস্তে আস্তে নেমে গিয়ে উপত্যকায় মিশেছে।"

"আর ক'টি শৃঙ্গ আছে তুরা গিরিমালায় ?"

"তাদের সংখ্যা অনেক। তবে দুটি ছাড়া আর সবগুলোই দু' হাজার ফুটের চেয়ে নিচু।"

"সে দুটির নাম কি ? আর তাদের উচ্চতাই বা কত ?"

"৩৩৭৫ ফুট উঁচু কৈলাস আর ২৮৩১ ফুট বালপাক্রাম। কৈলাসকে আমরা

বলি ছিট্‌মাং। কালো পাথরের ভারী সুন্দর একটি স্তূপ। চারিপাশের সমস্ত পাহাড়ের ওপরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। সুদূর অতীত থেকেই গারো পাহাড়ের মানুষদের কাছে এটি পরম-পবিত্র শৃঙ্গ। তাঁদের বিশ্বাস, পরলোকগত প্রিয়জনদের আত্মা এই পবিত্র-শিখরে বাস করছেন।"

বাড়ি-ঘরের সীমা পেরিয়ে ওরা ওপরে উঠে এসেছে। এতক্ষণ পায়ে-চলা পথ বেয়ে ওপরে উঠেছে। এখন সেই সঙ্কীর্ণ চড়াই পথ গেল ফুরিয়ে। পাহাড়ের গায়ে ঝোপ-ঝাড়। কাঁটাগাছের ঝোপ আর বাঁশঝাড়। বড় গাছ খুবই কম। পাহাড়টা বেশ খাড়া। সেই পাহাড় বেয়েই ওপরে উঠেছে ওরা। সুপ্রিয়র কষ্ট হচ্ছে পথ চলতে। তবু একটানা চলতে হচ্ছে তাকে, কারণ শেলী থামছে না। সে অক্লেশে ওপরে উঠে যাচ্ছে। একবারও পেছনে তাকাচ্ছে না। দেখছে না যে সুপ্রিয় ক্রমেই পেছিয়ে পড়ছে।

না, দেখেছে। শেলী পেছন ফিরে দাঁড়িয়েছে। নেমে আসছে। কাছে এসে বলে, "একটু জিরিয়ে নিন।"

সুপ্রিয়র পৌরুষে বাধে। কিন্তু সে কিছুই বলতে পারে না।

শেলীই তার সম্মান রক্ষা করে। বলে, "আপনি কলকাতার ছেলে। এমন পথ পাড়ি দেবার অভ্যেস নেই আপনার। আমার কথা ছেড়ে দিন, আমি পাহাড়ী মেয়ে।"

সুপ্রিয় বসে পড়ে।

বেশ কয়েকবার বিশ্রাম নিয়ে অবশেষে শেলীর সঙ্গে সুপ্রিয় উঠে আসে তুরা পাহাড়ের ওপরে। সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। তাড়াতাড়ি বসে পড়ে। এবারে শেলীও বসে। আর বসে তার পাশে। সুপ্রিয়র ভাল লাগে। হয়তো বা শেলীরও।

গোধূলির ছায়া নামছে তুরা পাহাড়ের শিখরে, নিচের ঐ সমতলে আর রুপোলী ব্রহ্মপুত্রের সবুজ তটে তটে। কুয়াশায় ঘোমটায় ঢেকে যাচ্ছে চারিদিক। একটু বাদে আঁধারে ডবে যাবে সব। তবু ওরা উঠছে না। কিন্তু কেউ কারও সঙ্গে কথা বলছে না। দুজনে আপন মনে ভেবে চলেছে।

সুপ্রিয় ভাবছে—কি বিচিত্র এই জীবন! সে কি কোনোদিন কল্পনা করতে পেরেছে, এমনি এক গোধূলি বেলায় তুরা পাহাড়ের নির্জন শিখরে শেলীর মতো একটি সুন্দরী যুবতীর পাশে বসে থাকবে। কাল এ সময় তো দু'জনের কেবল পরিচয় হয়েছে, আর আজ? একটি দিনের ব্যবধান কত বিরাট হয়ে উঠতে পারে!! শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ধর্মের পার্থক্য নিতান্তই তুচ্ছ।

মনের মিলই মানুষকে মানুষের কাছে এনে দেয়। তাহলে কি তাদের দুজনের মনেও কিছু মিল আছে? সুপ্রিয় ভেবে চলে। ভাবনার শেষ নেই।

আর শেলী? সেও ভাবছে। ভাবছে—তুরা পাহাড়ের এই শিখরে সে তো আজ প্রথম এলো না। আরও কতবার কতজনের সঙ্গে সে এসেছে এখানে। কিন্তু আজকের মতো এমন ভাল কি লেগেছে কখনও? আজ যেন সে জেগে থেকে স্বপ্ন দেখছে—সুন্দর একটি স্বপ্ন। আচ্ছা, এই স্বপ্নময় গোধূলি কি ক্ষণস্থায়ী? এমন মধুময় মুহূর্ত কি আবার আসবে তার জীবনে?

গোধূলির বুক বেয়ে সন্ধ্যা নেমে আসে তুরা পাহাড়ের শিখরে। তবু ওরা বসে থাকে। বসে থাকে নিঃশব্দে। দুজনেই ভাবনার তরী দিয়েছে ভাসিয়ে, কূল পাচ্ছে না। ঝিঁঝি পোকার গান কিংবা জোনাকীর আলো ওদের ভাবনা ভাঙাতে পারে না।

না, চমক ভেঙেছে শেলীর। সে ফিরে এসেছে বাস্তবে; সে উঠে দাঁড়ায়। শান্ত স্বরে সুপ্রিয়কে বলে, "রাত হয়ে এলো। চলুন, ফেরা যাক্। বাবা একা বসে আছেন।"

শিউরে ওঠে সুপ্রিয়। সে যে উইলিয়মের কথা ভুলেই গিয়েছিল। শুধু উইলিষম কেন, অতীত আর ভবিষ্যৎকেও গিয়েছিল ভুলে। কেবল বর্তমানকে আঁকড়ে থাকতে চেয়েছিল। কিন্তু তা যে হবার নয়।

সুপ্রিয় তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায়। বলে "চলুন।"

"বড্ড অন্ধকার। নামতে হয়তো কষ্ট হবে আপনার।"

"না, কষ্ট হবে কেন? আস্তে আস্তে পথ চলব। আর আঁধার তো অন্তহীন নয়, দূরে আলো দেখা যাচ্ছে '

"দূরের আলো যে আলেয়ারই মতো, কোনো কাজে আসে না।" শেলী চলতে শুরু করে।

সুপ্রিয় শেলীকে অনুসরণ করে। কিন্তু তার উক্তির উত্তর দিতে পারে না।

দুজনেই নীরব। ওদের কি সব কথা ফুরিয়ে গেল!

না। দুজনেই কথা বলতে চাইছে, কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারছে না। কেন এমন হল? বুঝতে পারে না ওরা:

অতর্কিতে সুপ্রিয়র পা ফস্কায়। অসীম আঁধারে ছেয়ে আছে সব। বুঝতে পারে নি. জায়গাটা এত পিচ্ছিল। বুঝে উঠবার আগেই সে সশব্দে আছাড় খায়।

শেলী থমকে দাঁড়ায়। পেছন ফিরে চেঁচিয়ে ওঠে, "কি হল? পড়ে গেলেন

নাকি ?" সে সুপ্রিয়র কাছে আসে। তাড়াতাড়ি দু হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে তাকে। তারপরে শেলী সুপ্রিয়কে টেনে তোলে। জিজ্ঞেস করে, "খুব লেগেছে নিশ্চয় ?"

"না। সামান্য।" সুপ্রিয় কোনোমতে বলে।

শেলী সুপ্রিয়কে ছেড়ে দেয়। বলে, "অন্ধকারে চলতে অসুবিধে হচ্ছে আপনার।"

"না।"

"না না করবেন না তো। নিশ্চয়ই হচ্ছে। আর হবেই বা না কেন। আপনার কি আঁধার রাতে এমন পথে চলার অভ্যেস আছে ?" একবার থামে শেলী। কি যেন ভাবে। তারপরে বলে ওঠে, "এই নিন।"

"কি ?"

"আমার হাত। নিন আমার হাত ধরুন।"

সুপ্রিয় শেলীর আদেশ পালন করে।

শেলী বলে, "এবাবে পা টিপে টিপে আমার সঙ্গে পথ চলুন।"

শেলীর হাত ধরে সুপ্রিয় ফিরে চলে।

কাল যা ভাবা গিয়েছিল, আজও কিন্তু তা হল না। রওনা হতে বেলা দশটা বেজে গেল। তবে আজ আর সুপ্রিয়র জন্য দেরি হয় নি। আজ দেরি করেছে শেলী। কারণটা এখনও সুপ্রিয়র কাছে স্পষ্ট নয়।

কাল অনেক রাত অবধি ঘুমোতে পারে নি সুপ্রিয়। জেগে জেগে তুরা পাহাড়ের কথা ভেবেছে, সেই সুন্দর সন্ধ্যার কথা ভেবেছে আর শেলীর কথা ভেবেছে। স্বভাবতঃই তার ঘুম ভেঙেছে দেরিতে। আশ্চর্য হয়েছে। কথা ছিল শেলী ঘুম ভাঙাবে। কিন্তু শেলী তো ডাকে নি তাকে। তাহলে কি শেলী এখনও পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছে ?

তাড়াতাড়ি দরজা খুলেছে সুপ্রিয়। অবাক হয়েছে। বারান্দায় বসে আছে শেলী। দরজা খোলার শব্দে পেছন ফেরে নি সে। বোধহয় শুনতে পায় নি। কিন্তু এত বেলা পর্যন্ত শেলী এখানে বসে আছে কেন ? কথা ছিল, সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে সুপ্রিয় ও উইলিয়মের ঘুম ভাঙাবে। ব্রেকফাস্টের

ব্যবস্থা করবে। উইলিয়াম ঘোড়াওয়ালাকে ডেকে নিয়ে আসবেন। কিন্তু তিনি যে এখনও ঘুমোচ্ছেন। তাঁকেও ডাক দেয় নি শেলী। অথচ সে ঘুম থেকে উঠেছে। আশ্চর্য!

"এখানে বসে আছেন যে?" সুপ্রিয় প্রশ্ন করেছিল।

শেলী যেন চমকে উঠেছে। খসে পড়া আঁচলখানি তাড়াতাড়ি বুকের ওপর তুলে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে সে। কেমন যেন অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছে। লজ্জায় তার মুখখানি লাল হয়ে উঠেছে। চোখ দুটিও কেমন রক্তিম। সারামুখে শ্রান্তির ছাপ। শেলী কি কাল রাতে ঘুমোয় নি নাকি? সুপ্রিয়র মতই কি তুরা পাহাড়ের কথা ভেবেছে, সেই সুন্দর সন্ধ্যার কথা ভেবেছে আর···

মুহূর্তের মধ্যে শেলী কিন্তু সামলে নিয়েছে নিজেকে। একটু হেসে বলেছে, "এমনি বসেছিলাম। আপনারা ঘুমোচ্ছেন। কি করব একা একা। তাই সকালের সোনালী রোদে গারো পাহাড়কে দেখছিলাম।"

"কিন্তু আপনি বোধহয় টের পান নি, ইতিমধ্যে রোদের রং পালটে গেছে—সোনালী রোদ রূপোলী হয়েছে। বেলা যে আটটা বেজে গেছে।"

"আটটা বেজে গেছে?" শেলী আবার চমকে উঠেছে।

"হ্যাঁ।" সুপ্রিয় একটু হেসেছে।

"তাই তো। এতটা সময় চলে গিয়েছে, একদম খেয়াল করি নি। ছিঃ ছিঃ কত কাজ পড়ে আছে। ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা, গোছগাছ ···।" শেলী তাড়াতাড়ি ঘরে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছে।

সুপ্রিয় বাধা দিয়ে বলেছে, "এমন আনমনা হয়ে কার কথা ভাবছিলেন?"

শেলী সুপ্রিয়র দিকে তাকিয়েছে। দুজনের চোখে দুজনের চোখ পড়েছে। শেলী চোখ নামিয়ে নিয়েছে। সে মাথা নিচু করে রয়েছে। কোন উত্তর দেয় নি। একটুকাল নীরবে দাঁড়িয়ে থেকেছে। তারপরে হঠাৎ ত্রস্ত পায়ে ঘরে চলে গিয়েছে।

সুপ্রিয়ও নীরব রয়েছে। সে কি তার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছে?

ফলে রওনা দিতে বেলা দশটা বেজে গেছে। দুটি ঘোড়ায় মালপত্র চলে গেছে ঘণ্টাখানেক আগে। তিনটে ঘোড়ায় চলেছে ওরা তিনজন। চলেছে তুরা থেকে রংগ্রামের পথে। চড়াই-উৎরাই হলেও পথ মোটেই দুর্গম নয়। তবু তাড়াতাড়ি চলতে পারছে না ওরা। সুপ্রিয়র জন্যই দেরি হচ্ছে। ঘোড়ায় চড়ার অভ্যেস নেই তার। সে বড়ই অস্বস্তি বোধ করছে। কেবলই পেছিয়ে পড়ছে। মাঝে মাঝেই ঘোড়া থেকে নেমে হাত-পা খেলিয়ে নিচ্ছে। বাধ্য

হয়ে উইলিয়ম আর শেলী ঘোড়া থেকে নামছে। সুপ্রিয়র সঙ্গে বিশ্রাম করছে, পায়চারি করছে।

স্বাভাবিক ভাবেই শেলী শাড়ি পরে নি আজ, সে শ্ল্যাক্স পরেছে। বড়ই স্মার্ট দেখাচ্ছে। ফিগারটি ভারী সুন্দর। সুপ্রিয়র খুব ভাল লাগছে। সে সুযোগ পেলেই শেলীকে দেখছে। এ দেখার প্রলোভন আদি ও অনন্ত— কিছুতেই আশ মেটে না।

সদা হাস্যময় মানুষ উইলিয়াম। হাসতে হাসতে তিনি নানা গল্প বলেন সুপ্রিয়কে। বলেন গারো পাহাড়ের মানুষদের কথা। এ সব কথা শেলীর অজানা নয়, তবু সে চুপ করে শোনে। শেলী আজ পথে বেরিয়ে বড়ই নীরব রয়েছে। প্রশ্ন করলেও বেশি কথা বলছে না। 'হ্যাঁ' বা 'না' বলে দায়-সারা গোছের উত্তর দিচ্ছে।

উইলিয়ম বলছেন—"গারো পাহাড়ের ইতিহাস মানে গারো জাতির ইতিহাস। তবে সে ইতিহাস মোটেই সুপ্রাচীন নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যকাল পর্যন্ত সে ইতিহাস নীরব। গারোদের বাইরের জগতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল খুবই সামান্য। নিজেদের ধর্ম, বিশ্বাস ও সম্পদ নিয়ে তাঁরা ছিলেন স্বয়ংসম্পূর্ণ। ফলে বাইরের মানুষের কাছে গারো পাহাড় ছিল অজানা, ছিল এক রহস্যময় জগৎ, এক রোমাঞ্চকর এলাকা।

"যতদূর জানা যায় আমাদের পূর্বপুরুষরা তিব্বত থেকে এসেছিলেন। তাঁরা সম্ভবতঃ প্রথম কুচবিহারে বসতি স্থাপন করেন। তারপরে উত্তর-পূর্ব দিক দিয়ে আসামে প্রবেশ করেন। সারা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাতেই ছড়িয়ে পড়েছিলেন তাঁরা। গৌহাটি পর্যন্ত গিয়েছিলেন। সেখানে অসমীয়াদের সঙ্গে তাঁদের সংঘর্ষ ঘটে। অসমীয়ারা তাঁদের বন্দী করেন। কিন্তু অনতিকাল পরেই জনৈক খাসিয়া রাজকুমার তাঁদের মুক্ত করেন। তিনি তাঁদের বোকোর কাছে বসতি স্থাপনের পরামর্শ দেন। কিন্তু বোকো তখন নররাক্ষসে পরিপূর্ণ ছিল। গারোরা সেখানে থাকতে পারলেন না। তাঁরা এলেন হাবরাঘাট পরগণায়। সেখান থেকে এই গারো পাহাড়ে।

"মোগল আমল থেকেই গারো পাহাড়ের পাদদেশে গোয়ালপাড়া ও ময়মনসিংহ জেলায় কয়েকজন দুর্ধর্ষ জমিদার বাস করতেন। তাঁদের প্রত্যেকেরই লোভ ছিল গারো পাহাড়ের ওপরে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে এদের সঙ্গে গারোদের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু হয়। মেছমারা ও কড়িবাড়ির জমিদাররা গারো পাহাড় দখল করতে চাইলেন। সৈন্য-সামন্ত নিয়ে ১৭৭৫ সালে তাঁরা গারো

পাহাড়ে এলেন। কয়েক বছর বাস করলেন। অনেক চাষের জমি উদ্ধার করলেন এবং জোর করে গ্রামবাসীদের কাছ থেকে কর আদায় করলেন। স্বাধীনতাপ্রিয় গারোদের ওপর তাঁরা দুঃসহ অত্যাচার চালালেন। অবশ্য তাঁদের পক্ষে বেশিকাল গারো পাহাড়ে বাস করা সম্ভব হল না। তাঁরা দেশে ফিরে গেলেন।

"জমিদারদের অত্যাচার কিন্তু শান্তিপ্রিয় গারোদেরও অত্যাচারী করে তুলল। তাঁরা প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠলেন। জমিদাররা চলে যাবার পর সুযোগ পেলেই তাঁরা জমিদারদের প্রতিনিধিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেন। কেবল তাই নয়, মাঝে মাঝেই পাহাড়ের পাদদেশের গ্রামবাসীদের ওপর চড়াও হতেন। এই অবস্থা চলেছে প্রায় উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নকাল পর্যন্ত। ক্ষিপ্ত গারোদের শান্ত করতে বৃটিশ শাসকদের বহু বেগ পেতে হয়েছে। কিন্তু সে কথা পরে হবে। আগে বিদ্রোহী গারোদের কথা বলে নিই।

"১৮০৬ সাল থেকে ১৮১৬ সালের মধ্যে গারোরা সমতলে আক্রমণ চালিয়ে ১৫৭টি গ্রাম পুড়িয়ে দেন এবং ১৭৮ জনকে মেরে ফেলেন। এদেশে কিন্তু তখন বৃটিশ রাজত্ব কায়েম হয়েছে। স্বভাবতঃই গভর্নর জেনারেল প্রমাদ গণলেন। তিনি স্কট্ নামক একজন পদস্থ অফিসারকে গারো পাহাড়ে পাঠালেন। মিস্টার স্কট্ ১২১ জন গারো সর্দারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে তাঁদের অভিযোগ শুনলেন। ফিরে গিয়ে গভর্নর জেনারেলকে তাঁর রিপোর্ট দাখিল করলেন।

"গভর্নর জেনারেল গারো পাহাড়কে জমিদারদের প্রাধান্যমুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। কিন্তু নানা কারণে এই প্রতিশ্রুতি কার্যকর করতে সময় অতিবাহিত হতে থাকল। আর জমিদাররাও মাঝে মাঝেই গারো পাহাড়ে এসে খাজনা আদায় করতে লাগলেন। খাজনা না দিলে তাঁরা গারোদের অত্যাচার করতেন। গারোরাও সুবিধা পেলেই সমতলের মানুষদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেন। ১৮২৫ সালে ৭০০ জন গারো ময়মনসিংহ জেলার শেরপুরের জমিদারকে আক্রমণ করে অনেক ক্ষতি সাধন করেন।

"অবস্থার কোন পরিবর্তন হচ্ছে না দেখে, ১৮৩৭ সালে গভর্নর জেনারেল মিস্টার স্ট্রংকে গারো পাহাড়ে পাঠালেন। তিনি আবার গারো সর্দারদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করলেন। তিনি পুনরায় জমিদারদের অত্যাচার বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। গারোরাও বৃটিশরাজকে কর দিতে স্বীকৃত হলেন। গ্রামের মোড়লদের কর আদায়ের ক্ষমতা দিয়ে মিস্টার স্ট্রং গারো পাহাড় থেকে চলে গেলেন।

"কয়েকটা বছর শান্তিতে কেটে গেল। কিন্তু ১৮৪৮ সালে আবার গোলমাল শুরু হল। সেবারের ব্যাপারটা ছিল অন্যরকম। অনৈক মোড়ল তাঁর গ্রামবাসীদের কাছে ১৮৩৪ সাল থেকে বকেয়া খাজনা দাবি করেছিলেন। সামান্য বচসার পরে গ্রামবাসীরা সেই মোড়লকে সপরিবারে হত্যা করলেন। তারপরে ১৮৫২ সালে গারোরা পর পর সাতবার গোয়ালপাড়া জেলায় হানা দিয়ে ৪৪ জনকে হত্যা করলেন।

"বৃটিশ শাসকদের পক্ষে আর চুপ করে থাকা সম্ভব হল না। ১৮৫২ সালেই বৃটিশ সৈন্য গারো পাহাড়ে এলো। তারা একটি গারো গ্রামে আগুন ধরিয়ে দিল। কিন্তু হানাদারদের ধরতে পারল না। তখন তারা সমতলে ফিরে গিয়ে সমস্ত পথ বন্ধ করে দিল। বেত, বাঁশ ও তুলা বিক্রি করতে গারোদের সমতলে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। তবু তাঁরা বাগে এলেন না। ১৮৫২ থেকে ১৮৫৯ সালের মধ্যে তাঁরা নয় বার গোয়ালপাড়া জেলায় হানা দিয়ে বিশজনকে হত্যা করেন।

"১৮৬১ সালে বৃটিশবাহিনী গোয়ালপাড়া ও ময়মনসিংহ জেলা থেকে সাঁড়াশী অভিযান চালালো গারো পাহাড়ে। যে সব গ্রাম থেকে সমতলে হানা দেওয়া হত, সেই সব গ্রামের অধিবাসীদের শাস্তি দেওয়া হল। নতুন লোককে মোড়ল নির্বাচিত করা হল। মোড়লরা দুষ্কৃতকারীদের ধরিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ ব্যবস্থাও কার্যকর হল না।

"ক্যাপ্টেন উইলিয়ামসন তখন দক্ষিণ-পশ্চিম আসামের ডেপুটি কমিশনার। তিনি অতিশয় সাহসী, সুদক্ষ ও সহানুভূতিশীল শাসক ছিলেন। তিনি বুঝতে পারলেন গারো পাহাড়ে বাস না করতে পারলে এ সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে না। কিন্তু গারো পাহাড় দুর্গম, গারো পাহাড় অস্বাস্থ্যকর—ম্যালেরিয়ার প্রকোপ খুবই বেশি। তবু উইলিয়ামসন ১৮৬৭ সালে তুরাতে বাস করতে শুরু করেন। তাঁর অনুমান সত্য হয়। ১৮৬৭ থেকে ১৮৭১ সালের মধ্যে শতাধিক গারো গ্রাম স্বেচ্ছায় বৃটিশের অধীনতা মেনে নেয়।

"১৮৭০ সাল থেকে উইলিয়ামসন গারো পাহাড়ে জরিপ আরম্ভ করেন। বছরখানেক বেশ শান্তিতেই কাজ চলল, তারপরেই ঘটল এক দুর্ঘটনা।

"জরিপের জন্য একটি পাহাড়ের শিখরদেশ পরিষ্কার করার প্রয়োজন পড়ল, কিন্তু মজুর নেই। দুজন ভিনদেশীয় মালবাহককে নিকটবর্তী গাঁয়ে পাঠানো হোল মজুর যোগাড় করতে। তারা কিন্তু স্থানীয় ভাষা জানত না।

"মালবাহকরা গাঁয়ে গিয়ে দেখে, সেখানে ভোজের আয়োজন চলেছে। গ্রামবাসীরা তাদের নেমন্তন্ন করলেন। ওরাও সানন্দে সম্মত হল। যথাসময়ে

গ্রামবাসীরা তাদের মদ ও মাংস খেতে দিলেন। মদ খেয়ে মাতাল হল মাল-বাহকরা। আর তারপরেই সশস্ত্র গ্রামবাসীরা ঝাঁপিয়ে পড়লেন তাদের ওপরে। একজন আহত হয়ে কোনরকমে পালিয়ে এলো। কিন্তু আরেকজনকে গ্রাম-বাসীরা হত্যা করলেন। তার গলা কেটে মুণ্ডটা রেখে দিলেন বিজয়চিহ্ন রূপে।

"খবর পেয়ে বৃটিশবাহিনী তিনদিক থেকে আবার গারো পাহাড় আক্রমণ করল। কোন লাভ হবে না বুঝতে পেরে কেউ তাদের বাধা দিলেন না। গারো মোড়লরা উইলিয়ামসনের প্রস্তাবে রাজী হলেন। তাঁরা গাঁয়ের মানুষদের নিয়ে রাস্তা তৈরির কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। উইলিয়ামসন বুঝতে পেরেছিলেন যোগাযোগ ব্যবস্থাই গারো পাহাড়ের উন্নতির প্রধান অন্তরায়। শুধু তাই নয়, তিনি জমিদারদের অত্যাচার থেকে গারো পাহাড়কে চিরমুক্ত করবার জন্য মেছুয়ারা ও কড়িবাড়ীর জমিদারদের ক্ষতিপূরণের দাবি পেশ করার নির্দেশ দিলেন। বলা বাহুল্য সে দাবি যথাসময়ে পূরণ করা হয় এবং উইলিয়ামসনের সুশাসনে গারো পাহাড়ে স্থায়ী শান্তি ফিরে আসে।

"তার পরের ইতিহাস বৈচিত্র্যহীন। অনতিকালের মধ্যে সারা গারো পাহাড় বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। মিশনারীরা আসেন। প্রেম ও ক্ষমার বাণী প্রচার করেন। তাঁদের সুশিক্ষায় আমরা শান্ত ও ভদ্রজাতিতে পরিণত হলাম। আজ আর বলতে কোন বাধা নেই যে উত্তর-পূর্ব ভারতের পার্বত্য-জাতি সমূহের মধ্যে আমরা এখন সবচেয়ে শান্তিপ্রিয় জাতি। আপনি নিশ্চিন্ত মনে যতদিন ইচ্ছা গারো পাহাড়ে চাকরি করতে পারেন।"

থামলেন উইলিয়ম। গারো পাহাডের কথা শুনতে শুনতে শিউরে উঠেছিল সুপ্রিয়। কাজেই উইলিয়মের আশ্বাসে আশ্বস্ত হয় সে। ভালই লাগে শেষের কথাগুলি।

গল্পের মাঝে অনেকটা পথ পেরিয়ে এসেছে সুপ্রিয়। অশ্বারোহণে কোন অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে নি এতক্ষণ। কিন্তু উইলিয়ম থামতেই যেন তার পা-দুখানি টনটন করতে শুরু করল। তাড়াতাড়ি ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল সে। পিতা-পুত্রীও বাধ্য হয়ে নেমে পড়ে। তারা পথের ধারে একটা গাছের ছায়ায় বসে। বেশ চড়া রোদ উঠেছে।

জনবিরল পথ। তবে মাঝে মাঝে গারো পাহাড়ের মানুষরা আসা-যাওয়া করছে। ছোটখাটো শক্ত-সমর্থ নর-নারী, ছেলে-মেয়ে। অধিকাংশেরই নাক চ্যাপ্টা, গায়ের রং নিকষ কালো। ওরা তাকিয়ে তাকিয়ে তাদের দেখে কিন্তু থামে না। ওরা যে মেহনতী মানুষ। ওরা চাষ করে, তাঁত বোনে, কাঠ কাটে,

বোঝা বয়। মেয়েরাই বেশি কাজ করে। বড় বড় বোঝা পিঠে নিয়ে গারো মেয়েরা অক্লেশে পথ চলেছে। ওদের যেন শ্রান্তি নেই, ক্লান্তি নেই। ওদের বিরামবিহীন চলার সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে পথের পাশে পাশে একটি ঝর্ণা যাচ্ছে বয়ে।

বড় ভাল লাগছে সুপ্রিয়র। এই সরল অনাডম্বর মানুষগুলিকে ভালবাসতে হবে। এদের ভাল করতে হবে। কিন্তু কেমন করে? সুপ্রিয় যে কিছুই জানে না এদের। এমনকি এদের ভাষা পর্যন্ত বুঝতে পারে না। আচ্ছা শেলী যদি তাকে সাহায্য করে! কিন্তু করবে কি?

হঠাৎ কথা বলে ওঠেন উইলিয়ম। বলেন সুপ্রিয়কে, "আপনার বোধহয় অসুবিধে হচ্ছে আমার সঙ্গে চলতে।"

"না। অসুবিধে হবে কেন?" সুপ্রিয় প্রতিবাদ করে।

উইলিয়ম একটু হাসেন। বলেন, "আমি বেশ বুঝতে পারছি, তাড়াতাড়ি চলতে কষ্ট হচ্ছে আপনার।" একবার থামেন তিনি। তারপরে যোগ করেন, "আমার আবার একটা বদভ্যাস, ঘোড়ায় চাপলে কেবলই ছুটতে ইচ্ছে করে। তাছাড়া আমার রংগ্রামে একটা কাজও আছে। তাই ভাবছি আমি একটু এগিয়ে যাই, আগে গিয়ে কাজটা সেরে ফেলি। আপনি আস্তে আস্তে আসুন। আমি আপনার কোয়াটার্সের সামনে অপেক্ষা করব।"

"তা বেশ তো, আপনারা এগিয়ে যান না।"

"না, না, আমরা নই, কেবল আমি। শেলী আপনার সঙ্গেই থাকবে। আপনারা গল্প করতে করতে আসুন।" একটু থেমে শেলীকে বলেন, "আর তুই বা সকাল থেকে এমন চুপ করে আছিস কেন রে। তোর কি শরীর খারাপ করেছে?"

"না।" শেলী মৃদু কণ্ঠে উত্তর দেয়।

"তাহলে কথা বলছিস না কেন?"

"কি বলব? তোমরাই তো কথা বলছিলে।"

"বেশ, এবারে আমি চলে যাচ্ছি। তুই মিস্টার বোসকে গারো পাহাড়ের গল্প বল।"

শেলী কিছু বলতে পারার আগেই উইলিয়ম লাফ দিয়ে ঘোড়ায় ওঠেন। সবেগে তাঁর ঘোড়া এগিয়ে চলে। একটু বাদেই তিনি পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে যান।

*   *   *

"চলুন।" শেলী উঠে দাঁড়ায়।

সুপ্রিয় শেলীর দিকে তাকায়।

শেলী আবার বলে, "এবারে রওনা হওয়া যাক্।"

"হ্যাঁ চলুন।" সুপ্রিয় বলে।

ওরা ঘোড়ায় চড়ে। পাশাপাশি দু'টি ঘোড়া এগিয়ে চলে, পাশাপাশি দুটি মানুষ পথ চলে। কিন্তু কেউ কথা বলে না। সময় বয়ে যায় নীরবে।

কিছুক্ষণ পরে। হঠাৎ সুপ্রিয় জিজ্ঞেস করে, "কি ভাবছেন?"

"কই, কিছু না তো।" শেলী চমকে ওঠে। তারপরে একটু হাসে। সে সহজ হতে চায়।

"তাহলে চুপ করে আছেন কেন?"

"এমনি।" শেলীর মুখের হাসি মিলিয়ে যায়। সে একটু থামে। তারপরে ভারী গলায় বলে ওঠে, "আমি না হয় চুপ করে আছি, কিন্তু আপনিও তো কোনো কথা বলেন নি আমার সঙ্গে, শুনতে চান নি আমার কথা।"

কথাটা মিথ্যে নয়। সুপ্রিয় মুশকিলে পড়ে। কি বলবে ভেবে পায় না।

"কি, জবাব দিচ্ছেন না যে?" শেলীর কণ্ঠস্বর যেন আরও ভারী হয়ে উঠেছে।

তবু সুপ্রিয় কিছু বলতে পারে না। সে কেবল একটু হাসে। অর্থহীন হাসি।

শেলী যেন সহসা কেমন হয়ে যায়। সে উত্তেজিত স্বরে বলে ওঠে, "বলুন, শিগগির বলুন, আজ পথে বেরিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলেন নি কেন…একটাও কথা…"

সুপ্রিয় দিশাহারা, সুপ্রিয় বিহ্বল, সুপ্রিয় মুগ্ধ।

অশ্রুধারা নেমে এসেছে শেলীর গাল বেয়ে। তার ঠোঁটদুটি কাঁপছে।

সুপ্রিয় কোনোমতে বলে, "এ নিতান্তই ভুল। আমি সব সময়েই আপনার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছি। কিন্তু সুযোগ পাই নি। আপনার বাবার কথা শুনতে শুনতেই সময় কেটে গেছে।"

"আমার বুঝি ইচ্ছে করে না কথা বলতে।" শেলী কেঁদে ফেলে।

সুপ্রিয় বিভ্রান্ত।

নীরব কিছুক্ষণ।

তারপরে শেলী চোখ মোছে। একটু যেন স্বাভাবিক হয়।

সুযোগ বুঝে সুপ্রিয় কোনোমতে বলে ফেলে, "আমারও শুনতে ইচ্ছে করে। আপনার কথা শুনতে ভাল লাগে আমার।"

"সত্যি বলছেন ?"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু আমি যে গারো, আমি যে খৃষ্টান।"

"তাতে কিছু যায় আসে না!" আপনি সুন্দর, আপনি শিক্ষিত, আপনি ভাল।...... আপনাকে ভাল লাগে আমার।"

শেলী কোন কথা বলে না। বোধহয় বলতে পারে না। সে মাথা নত করে। নিঃশব্দে পথ চলে।

সুপ্রিয় শঙ্কিত হয়ে পড়ে। সে কি আবার কোন অন্যায় করল ? কথায় কথায় সে তার মনের গোপন কথা প্রকাশ করে ফেলেছে। যা ভাবা যায়, তা-ই বলা যায় না। এমন অনেক কথা আছে, যা মানুষকে মনের মধ্যেই বন্দী করে রাখতে হয়। সে শিক্ষিত, সভ্য, ভদ্র। তাই উইলিয়ম বিশ্বাস করে তাঁর যুবতী কন্যাকে রেখে গেছেন তার কাছে। সুপ্রিয় কি সে বিশ্বাসের অমর্যাদা ঘটালো ?

কিন্তু সে সব ভাবার যে সময় নেই এখন। চুপ করে থাকলে আরও খারাপ হবে; শেলী না জানি কি ভাবছে। সে তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, "বাঃ, বেশ তো। এই বুঝি আপনার কথা বলা।"

শেলী তবু নীরব।

সুপ্রিয় তাগিদ দেয়, "বলুন।"

"কি বলব ?" শেলী সুপ্রিয়র দিকে তাকায়।

"তার আমি কি জানি ? আপনার যা বলতে ইচ্ছে করছে, তাই বলুন।"

"আপনার কি শুনতে ইচ্ছে করছে ?" শেলী পাল্টা প্রশ্ন করে।

সুপ্রিয় বলতে চায়—আপনার কথা। কিন্তু তা বলতে পারে না। সে বলে, "গারো পাহাড়ের কথা বলুন।"

"গারো পাহাড়ের কথা ?" শেলী যেন বিস্মিত।

"হ্যাঁ।" সুপ্রিয় উত্তর দেয়।

"বেশ শুনুন।" শেলী বলতে থাকে, "গারো পাহাড় আসাম পর্বতমালার পশ্চিমাংশ ২৫° ৯′ ও ২৬° অক্ষাংশ এবং ৮৯° ৪৭′ ও ৯১° ২′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। এ জেলার উত্তরে গোয়ালপাড়া, পশ্চিমে গোয়ালপাড়া ও ব্রহ্মপুত্র, দক্ষিণে ময়মনসিংহ ও পুবে খাসিয়া-জয়ন্তিয়া। আয়তন ৩১৫২ বর্গ-মাইল, লোকসংখ্যা তিন লাখের একটু বেশি। প্রতি বর্গমাইলে মাত্র শ'খানেক লোক বাস করে অর্থাৎ জনবসতি খুবই কম। তার চেয়েও দুঃখের কথা শতকরা শিক্ষিতের সংখ্যা মাত্র বিশজন—পূর্ব ভারতের সবচেয়ে অল্প শিক্ষিত জেলা।

"এ জেলায় কোন মহকুমা নেই। জেলা দশটি মৌজায় বিভক্ত। পাহাড়ী জেলা হলেও উচ্চতা খুবই কম, ফলে গ্রীষ্মপ্রধান আবহাওয়া। কেবল নভেম্বর ডিসেম্বরে একটু ঠাণ্ডা পড়ে। মে থেকেই বর্ষাকাল। বেশ বৃষ্টি হয়। বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় একশ' দশ ইঞ্চি।" একবার থামে শেলী। বোধহয় দম নেয়। তারপরে আবার বলতে শুরু করে।

সুপ্রিয় শুনে যায়। শুনতে ভাল লাগছে তার। ভাবতে ভাল লাগছে, শেলী তার দেশকে এত ভাল করে জানে।

শেলী বলে যায়, "আপনি জানেন যে কৃষিকার্য গারোদের প্রধান জীবিকা, এ জেলার শতকরা ৯৪ জন কৃষিজীবী। কিন্তু আপনি বোধহয় জানেন না, বিচিত্র নিয়মে চাষ করা হয় এ জেলায়। এই নিয়মকে বলে ঝুম্।"

"কি রকম?" সুপ্রিয় জিজ্ঞেস করে।

"কালও দেখেছেন, আজও দেখছেন—গারো পাহাড় বনময়। এ জেলার প্রায় সব কৃষিক্ষেত্রই বন থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য রাজ্যে যেমন বন কেটে বসত, কিংবা ক্ষেত তৈরী হয়, এখানে তেমন হয় না। এখানে বন পুড়িয়ে ক্ষেত উদ্ধার করা হয়। আর সেই ক্ষেতের ধারে চাষী বাসা বাঁধে। গড়ে ওঠে গ্রাম।"

"একটু বিশদ ভাবে বলুন।" সুপ্রিয় অনুরোধ করে।

শেলী বলে চলে, "সাধারণতঃ ডিসেম্বর-জানুয়ারীতে জমি পছন্দ করা হয়। শীতের শেষে বনের বড় বড় গাছ ও বাঁশ কেটে ফেলা হয়। সেগুলি মার্চ মাস পর্যন্ত সেখানেই পড়ে থাকে, শুকিয়ে যায়। তারপরে তাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। যে সব গাছের গুঁড়ি অদাহ্য থাকে, সেগুলিকে ফেলে দেয়া হয়। কিন্তু পুড়ে যাওয়া গাছের ছাই পড়ে থাকে জমিতে। আর এপ্রিলের মাঝামাঝি সেই ছাইয়ের উপরই বীজ ছড়িয়ে দেওয়া হয়। প্রথম বছর সব ফসলেরই কিছু

কিছু বীজ ছড়ানো হয়। পরের বছর কেবল ধান। এই নিয়মকেই বলে ঝুম্। আগে এ নিয়মের অনেক সমালোচনা করা হয়েছে। কিন্তু এখন অনেকেই এ নিয়ম সমর্থন করেন। কারণ ঢালু পাহাড়ের গায়ে লাঙ্গল দেয়া সম্ভব নয় আর পাহাড়ের গায়ে ধাপে ধাপে ক্ষেত অর্থাৎ টেরেস তৈরী করা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। দরিদ্র চাষীদের পক্ষে তা করা সম্ভব নয়।

"ধানের জন্য ফেব্রুয়ারী ও মার্চে সামান্য বৃষ্টি এবং এপ্রিল ও মে মাসে বেশি বৃষ্টির দরকার গারো পাহাড়ে। জুলাই-আগস্টে ধান পাকে, কাজেই আবহাওয়া ভাল থাকা দরকার। আবার সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে সামান্য বৃষ্টির দরকার, কারণ তখন তুলার মরশুম। তুলা গারো পাহাড়ের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ।" শেলী থামে।"

সুপ্রিয় হেসে বলে, "আপনার তো দেখছি চাষাবাদের নিয়মকানুন সব কণ্ঠস্থ।"

"খুবই স্বাভাবিক। আমি চাষীর মেয়ে। আমার বাবা লেখাপড়া শিখেও চাষাবাদ নিয়েই জীবন কাটিয়ে দিলেন।" শেলী গর্বিতকণ্ঠে বলে।

সুপ্রিয় প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে, "আচ্ছা, এই যে আমরা এতটা পথ পেরিয়ে এলাম, কোন নদী দেখলাম না তো। অথচ শুনেছি, গারো পাহাড়ে অনেকগুলি নদী আছে।

"হ্যাঁ, কিন্তু বড় নদী একটিও এদিক দিয়ে প্রবাহিত হয় নি।" একবার থামে শেলী। তারপরে বলতে থাকে, "প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় গারো পাহাড়ে। কাজেই অসংখ্য ছোট-ছোট নদী আছে এ জেলায়। কিন্তু কেবল পাঁচটি নদী হোল নাব্য।"

"তাদের নাম?" শেলী থামতেই সুপ্রিয় প্রশ্ন করে।

"কৃষ্ণাই, কালু, ভুগাই, নিতাই ও সোমেশ্বরী।"

"তাদের বিষয়ে বলুন না একটু।"

"কৃষ্ণাই নদীর স্থানীয় নাম ড্যামরিং। আরবেলা গিরিশ্রেণী থেকে সৃষ্ট হয়ে রং-গ্রেন-গিরি, থাপা, সংমা ও জিরা গ্রাম হয়ে গোয়ালপাড়া জেলায় প্রবেশ করেছে। ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে ডেকাচ্যাং ও জিরা গ্রামের মধ্যবর্তী অংশে এই নদীগর্ভে আট মাইল দীর্ঘ ও এক মাইল প্রশস্ত একটি হ্রদের সৃষ্টি হয়েছে। হ্রদটি বড়ই সুন্দর। তাসেক হ্রদ। কৃষ্ণাই নাব্য হলেও শীতকালে আমাদের গ্রাম রং-গ্রেন-গিরি পর্যন্তই জল থাকে। আর তাই গারো পাহাড়ে নৌকোর ব্যবহার খুবই কম।"

"থামলেন কেন ?" সুপ্রিয় বলে, "আর চারটি নদীর কথা বলুন।"

"গারো পাহাড়ের কথা শুনতে ভাল লাগছে আপনার ?" শেলী প্রশ্ন করে।

"হ্যাঁ। আমি যে গারো পাহাড়ের মানুষকে ভালবাসি।"

শেলী কি বোঝে বোঝা যায় না। তবে তাতে তার কোন ভাবান্তর হয় না। সে বলে চলে, "আমরা কালু নদীকে বলি গানোল। তুরা গিরিশ্রেণী থেকে সৃষ্ট হয়ে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়ে গোয়ালপাড়া জেলায় চলে গেছে।

"ভুগাই নদীর গারো নাম বুগি। সে-ও তুরা গিরিশ্রেণী থেকে বেরিয়ে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে পূর্ববঙ্গে প্রবেশ করেছে।

"নিতাই নদীকে আমরা বলি দারেং। এটিও তুরা গিরিশ্রেণীর জল-বিভাজিকা থেকে উদ্ভূত হয়ে ময়মনসিংহ জেলায় চলে গেছে।" শেলী থামে।

কিন্তু সুপ্রিয় থামতে দেয় না তাকে। সঙ্গে সঙ্গে ফরমাশ করে, "এবারে সোমেশ্বরীর কথা বলুন। সে শুনেছি গারো পাহাড়ের বৃহত্তম নদী।" গারো নাম শিমসাঙ্।

"হ্যাঁ।" শেলী বলে, "আমরা এই নদীকে বলি শিম্‌সাঙ্। তুরা গিরি-শ্রেণীর উত্তরাঞ্চলকে বিধৌত করেছে। সৃষ্ট হয়েছে তুরা ও আরবেলা গিরি-শ্রেণীর মধ্যাঞ্চল থেকে। গতিপথ বড়ই আঁকাবাঁকা। প্রথম তিরিশ মাইল পূর্ববাহিনী, তারপরে দক্ষিণবাহিনী হয়ে ময়মনসিংহ জেলায় প্রবেশ করেছে।" থামে শেলী। বোধহয় হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

সুপ্রিয় বলে, "অনেক পরিশ্রম হল আপনার। কিন্তু আমার বড় ভাল লাগল শুনতে।"

"বেশ, পারিশ্রমিক দিন।" শেলী হাসতে হাসতে বলে।

সুপ্রিয়ও হাসে, "সে সাধ্য কোথায় ? আমি যে দরিদ্র।"

"তা বৈকি। হাজার গ্রামের মানুষ যাকে সেলাম ঠুকবে, সে দরিদ্র না হলে আর কে দরিদ্র হবে ? তার চেয়ে বলুন না, দেবেন না কিছু।"

"কি দিতে হবে বলুন ?"

"আমি কেন বলতে যাব ?"

সুপ্রিয় মুশকিলে পড়ে। কি চাইছে শেলী ? কি দেওয়া যায় তাকে ? কিছুই সে বুঝতে পারছে না।

শেলী হাসে। বলে, "ভারী বিপদে পড়ে গেছেন, না ?"

"তা একটু পড়েছি বৈকি।"

শেলী হো হো করে হেসে ওঠে।

"হাসছেন কেন?" সুপ্রিয় জিজ্ঞেস করে।

"আপনি বড্ড বোকা।"

"হবো হয়তো।"

শেলী আবার হাসে। বলে, "আমি যখন পারিশ্রমিকের কথা বললাম তখন আমাকে আপনার একটি সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ বা গ্রেটফুল থ্যাঙ্কস্ দেওয়া উচিত ছিল।"

"বেশ দিলাম—থ্যাঙ্কস্।" সঙ্গে সঙ্গে সুপ্রিয় বলে।

"বাধিত হলাম।" শেলী বলে।

"আপনি দেখছি সহজ মেয়ে নন।"

"মেয়েদের সহজ হওয়া উচিত নয়।"

"কেন?"

"ছেলেরা পেয়ে বসে।"

শেলী কি তাকে কিছু বলল? বুঝতে পারে না সুপ্রিয়। সে চুপ করে থাকে। নীরবে পথ চলে।

পথের পাশে ক্ষেতের মাঝে অদ্ভুত একটি আশ্রয়। বড় একটা গাছের দুটি শাখার মাঝে মাচা বেঁধে তার ওপরে তৈরি করা হয়েছে সুন্দর একখানি ঘর। বাঁশ আর বিচালির ঘর। ঝুলানো বারান্দার মতো সামনে খানিকটা খোলা জায়গা। মাটি থেকে একটি মই উঠে গেছে ঘরে।

সুপ্রিয় ঘোড়া থামায়। বাধ্য হয়ে থামতে হয় শেলীকে। সে জিজ্ঞেস করে, "কি দেখছেন?"

"ওটা কি?" সুপ্রিয় ঘরখানি দেখায়।

"বোরাং।"

"মানে?"

"ক্ষেত-চৌকী। জন্তু-জানোয়ারের থেকে ফসল রক্ষার প্রয়োজনে দু'বছরের জন্য ক্ষেতের মালিকরা এমনি সব ঘরে বাস করেন।"

"ভারী সুন্দর কিন্তু।"

"কখনও বাস করতে হবে না বলেই এমন সুন্দর মনে হচ্ছে।" শেলী তীক্ষ্ণস্বরে মন্তব্য করে।

সুপ্রিয় হাসে। লাগামে টান দেয়। শেলীও চলা শুরু করে। চলতে চলতে সুপ্রিয় বলে, "মনের মতো সঙ্গী পেলে, আমি এমন ঘরে বাসা বাঁধতে রাজী আছি।"

"আপনার সঙ্গী কিন্তু রাজী হবে না।"

"কেন ?"

"প্রথমত লোকালয় থেকে বহুদূরে, দ্বিতীয়ত জীবন মোটেই নিরাপদ নয়।"

"কারণ ?"

"গারো পাহাড় কেবল বনময় নয়, বন্যজন্তু পরিপূর্ণ। হাতি, বাঘ, লেপার্ড, বুনো মোষ, ভালুক, শুয়োর ও সাপ ইত্যাদি যে প্রায় নিত্যসঙ্গী ঐ ঘরে।"

বাধ্য হয়ে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করতে হয় সুপ্রিয়কে। বলে, "আচ্ছা এ জেলার দ্রষ্টব্যস্থল কি কি ?"

"তুরা ছাড়া আর তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নেই। তবে অনেকে বাগমারা যান, দোবোকলের গুহা দেখতে।"

"সে আবার কোথায় ?"

"বাগমারা তুরা থেকে বাহাত্তর মাইল। দোবোকলের বিখ্যাত গুহা সেখান থেকে মাত্র ষোল মাইল। এছাড়াও গারো পাহাড়ে কয়েকটি কয়লার খনি আছে।"

"এবার আমি একটু আপনাদের সামাজিক অবস্থাটা জানতে চাইছি। বললে বাধিত হব।"

"গারো পাহাড়ে মোটামুটি দু'টি সমাজ—খৃষ্টান ও সংসারী সমাজ। মিশনারীরা আমাদের দেশে এসেছেন একশো বছর আগে। তাঁরা দলে দলে মানুষকে খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষা দিয়েছেন। ১৯১১ সালের মধ্যে পাঁচ হাজার মানুষ খৃষ্টান হয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে শিক্ষার ব্যবস্থাও করেছেন। মিশনারীরা লেখাপড়া শেখাবার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা জিনিস শিখিয়েছে, তা হোল পাশ্চাত্য প্রীতি। সুখের কথা ভারত স্বাধীন হবার পরে আমরা এই দোষমুক্ত হয়েছি। সংসারী গারোদের সঙ্গে মিলে-মিশে আমরা গারো পাহাড়ের উন্নয়নে মন দিয়েছি। স্বাধীনতার পরে পূর্ববাংলা থেকে চল্লিশ হাজার বাঙালী খৃষ্টান গারো পাহাড়ে এসেছেন। ফলে বাংলার সঙ্গে আমাদের আত্মিক যোগাযোগ আরও সুদৃঢ় হয়েছে।"

"এবারে সংসারী গারোদের কথা বলুন।" সুপ্রিয় ফরমাশ করে।

"ওদের সমাজ এখনও মাতৃতান্ত্রিক। মায়ের নামে ছেলে-মেয়েদের নাম রাখা হয়। বিয়ের পর জামাই আসে মেয়ের বাড়িতে আর ছেলে চলে যায় শ্বশুর বাড়ি।"

"মেয়ের মা-বাবা ?" সুপ্রিয় প্রশ্ন করে।

শেলী উত্তর দেয়, "ছোট মেয়ে তাদের ভরণপোষণ করে, তাই ছোট মেয়ে বাপ-মায়ের বেশী আদরের।"

"আপনিও ছোট মেয়ে নাকি ?" সুপ্রিয় অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করে।

শেলী হেসে বলে, "না। আমি বাবার একমাত্র মেয়ে। দু'ভাই আমার। দাদা শিলংয়ে চাকরি করে, ছোটভাই জন স্কুলে পড়ে।"

"তাই আপনি এমন আদুরে আর এত অভিমানী।"

"অভিমান আবার কখন করলাম !"

"এই তো কিছুক্ষণ আগে।"

"অভিমান করি নি তো, এমনি একটু কেঁদে ফেলেছিলাম।"

"কেন, বলুন ?"

"বললাম যে এমনি !"

"না, নিশ্চয়ই কারণ আছে।"

"কোনো কারণ নেই, মনটা ভাল লাগছিল না তাই।"

"কেন ভাল লাগছিল না ?"

শেলী চুপ করে থাকে। সুপ্রিয়ও নীরব হয়। ওরা নিঃশব্দে পথ চলতে থাকে।

কিছুক্ষণ বাদে শেলী হঠাৎ বলে ওঠে, "আরে, একটা কথা তো বলা হয় নি আপনাকে! গারো পাহাড়ে আর একটি জাতি বাস করে। তাদের নাম কোচ্। সংখ্যায় অবশ্য তারা খুবই সামান্য। তবে এরা আলাদা ভাষা বলে, আর হিন্দুদের আচার আচরণ মেনে চলে।"

সুপ্রিয় বুঝতে পারে শেলী তাকে অন্য প্রসঙ্গে নিয়ে যেতে চাইছে, তবু সে চুপ করে থাকে।

শেলী বলে চলে, "এবারে গারো পাহাড়ের সামাজিক উৎসবের কথা বলি। নবান্ন হচ্ছে এ জেলার সবচেয়ে বড় সামাজিক উৎসব। নবান্নকে আমরা বলি ওয়াঙ্গালা। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে সমস্ত অখৃষ্টান গ্রামে সাতদিন ধরে এই উৎসব হয়। তার পরেই বলতে হয় বিহুর কথা। জানুয়ারী মাসে সমস্ত হাজং ও কোচ্ গ্রামে তিন দিন ধরে এই উৎসব হয়। জন্মাষ্টমী, চড়ক, দুর্গাপূজা, কালী-পূজা, মনসা পূজা এবং বুদ্ধ পূর্ণিমাও পালন করা হয় গারো পাহাড়ে। মুসলমানদের প্রধান উৎসব ইদ্-উল্-ফিতর ও ইদ্-উজ্-জোহা আর আমাদের ক্রিস্‌মাস, ঈস্টার ও নব-বর্ষ। সব উৎসব উপলক্ষেই হয় নাচগান আর মদ্যপান। সুরা আর সুর। জাতিধর্ম নির্বিশেষে সবাই মেতে ওঠে পান আর গানের উৎসবে।"

শেলী চুপ করা মাত্র সুপ্রিয় বলে, "একটি অনুরোধ করব, রাখবেন ?"

"চেষ্টা করব।"

"আজ আপনাদের বাড়ি পৌঁছতে রাত হয়ে যাবে। তাই বলছিলাম, আজ আমার ওখানে রাতটা কাটিয়ে কাল সকালে যাবেন।"

"বাবা বোধহয় রাজী হবেন না। তাঁর নাকি আজই বাড়ি পৌঁছান দরকার।"

"তাঁকে রাজী করাবার দায়িত্ব আমার, আপনার আপত্তি আছে কি না বলুন।"

"আপত্তি কি থাকতে পারে! তবে আপনিও তো আজই প্রথম যাচ্ছেন, আমাদের নিয়ে অসুবিধায় পড়তে পারেন।"

"কোনো অসুবিধা হবে না। কাল আপনাদের অতিথি হয়েছিলাম, আজ আমাকে অতিথি-সেবার সুযোগ দিন।"

"ঋণ শোধ করতে চাইছেন ?"

"না, কারণ সব ঋণ শোধ করা যায় না।"

উইলিয়ম কিন্তু সানন্দে সম্মত হয়ে যান, "এ তো খুব ভাল প্রস্তাব।" আমাদের গ্রাম আরও অনেক দূর। পৌঁছতে রাত হয়ে যাবে। শেলীর নাকি এরই মধ্যে কোমরে ব্যথা হয়ে গেছে, পা-দু'টো টনটন্ করছে।"

অতএব পিতা ও পুত্রীকে নিয়ে সুপ্রিয় প্রবেশ করে তার কোয়ার্টার্সে।

রং বেশ বড় গ্রাম। ... হাজার খানেক লোকের বাস। চারিপাশের কয়েকখানা গ্রামের পোস্ট-অফিস। এখানে আছে একটি হেলথ্ সেণ্টার, ব্লক ডেভেলপমেণ্টের অফিস ও সুপ্রিয়র দপ্তর—নির্মাণ বিভাগের সাব-ডিভিশনাল অফিস।

সুপ্রিয় আজ আসবে তা আগেই ঠিক ছিল। তাই তার ক্লার্ক অর্থাৎ অফিসের বড়বাবু, সুপারভাইজার ও কয়েকজন খালাসী সেখানে অপেক্ষা করছিল। অপেক্ষা করেছিলেন ডাক্তার সিং এবং বি. ডি. ও. মিস্টার শ্রীবাস্তব। সবাই তাকে অভ্যর্থনা জানায়। ভাল লাগে সুপ্রিয়র। শেলী রয়েছে সঙ্গে। শেলী সব দেখছে।

কোয়ার্টারটি মন্দ নয়। তিনখানি ঘর ও বারান্দা। চারপাশে দেয়াল, ওপরে টিন। রংগ্রামে এত ভাল বাড়ি আর নেই। এখানকার অধিকাংশই কাঁচা

বাড়ি। বাঁশ কিংবা কাঠের খুঁটি দিয়ে গোলপাতার ছাউনি। বাঁশের বেড়া ও দরজা-জানলা, কাঠের পাটাতন বা মেঝে। সবই প্রায় দো-চালা ঘর। কোনোটিতে বারান্দা আছে, কোনোটিতে নেই। বিভিন্ন ধরনের ও বিভিন্ন আকারের ঘর। তবে তাদের অধিকাংশ আশী থেকে একশ' ফুট লম্বা। ভেতরে বেড়া দিয়ে ভাগ ভাগ করা একটি ঘর নিয়েই বাড়ি—বাসঘর, রান্নাঘর ও গুদাম। প্রায় পঁচাত্তর হাজার ঘর আছে গারো পাহাড়ে। অধিকাংশই আলো-বাতাস বিহীন। পাটাতনের নিচে শুয়োর, ভেড়া বা গরুর গোয়াল। টিনের বাড়ি খুবই কম গারো পাহাড়ে।

এক একটা টিলার ওপরে কয়েকটি করে বাড়ি। এমনি কয়েকটি টিলা আর চাষের জমি নিয়ে রংগ্রাম।

গ্রামবাসীরা প্রত্যেকেই উইলিয়মকে চেনে। চেনে শেলীকেও। তাই তাদের সঙ্গে ওদের পরিচয় করিয়ে দিতে হয় না সুপ্রিয়র। বরং উইলিয়মই তাকে পরিচয় করিয়ে দেন সবার সঙ্গে, "তোমাদের নতুন ডিপটি সাহেব—সুপ্রিয় বোস।"

একজন খালাসী চা নিয়ে আসে। সবাইকে চা দেওয়া হল। শেলী পথের জন্য নিয়ে আসা খাবারের বাকিটুকু ভাগ করে দেয়। ডাক্তার ও শ্রীবাস্তব চা খেয়ে চলে যান। অন্যান্যরাও চলে যায়, কেবল বড় বাবু ও দু'জন খালাসী থাকে সব ব্যবস্থা করে দেবার জন্য।

ব বস্থা হয়ে যায় কিছুক্ষণের মধ্যে।

ঘর-দোর আগেই পরিষ্কার করে রাখা হয়েছিল। জিনিস-পত্র ঘরে এনে, বাসন-পত্র ধুয়ে মুছে, উনুন ধরায় একজন খালাসী। শেলী সেই ফাঁকে স্নান সেরে নেয়।

খালাসী সুপ্রিয়কে জিজ্ঞেস করে, "সাব্ কি রান্না হবে?"

সুপ্রিয় মুশকিলে পড়ে। কি বলবে সে? সে যে কিছুই জানে না।

শেলী বুঝতে পারে তার অবস্থা। সে বলে ওঠে "আজ তোমাকে রান্না করতে হবে না। কাল থেকে তুমি রাঁধবে। আজ আমি রাঁধব। তবে তুমি আমার সঙ্গে থাকবে। দেখে নেবে সব।"

সুপ্রিয় হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে শেলীকে বলতে হয় তার, "আপনার কষ্ট হবে। এতটা পথ ভেঙে এসেছেন, আপনার বিশ্রাম দরকার।"

শেলী বলে, "আমি পথ ভাঙি নি, ঘোড়া ভেঙেছে। অতএব আমার

বিশ্রামের প্রশ্নই আসে না। আপনি শ্রান্ত বোধ করলে বিশ্রাম নিন। বাজে কথা বলে আর সময় নষ্ট করবেন না। দেরি হয়ে যাচ্ছে, আমি তাড়াতাড়ি সব ব্যবস্থা করে নিচ্ছি।"

শেলীকে আর কিছু বলা নিরর্থক। উইলিয়ম খাটে আশ্রয় নিয়েছেন! সুপ্রিয় পাশের ঘরে এসে বিছানায় গা এলিয়ে দেয়।

মানুষ অন্যমনা হতে পারে কিন্তু শূন্যমনা হতে পারে না। কিছু-না-কিছু ভাবতেই হয় মানুষকে। সুপ্রিয়ও ভেবে চলে। অকারণেই ভাবে। ভাবে—দেশের কথা, মায়ের কথা, তুরার কথা, নিজের কথা আর শেলীর কথা। আজকের কথা, আগামী কালের কথা। কাল এমন সময় শেলী থাকবে না এখানে।

ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিল খেয়াল নেই সুপ্রিয়র। হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখে শেলী পাশে দাঁড়িয়ে হাঁসছে। তার দিকে তাকাতে শেলী জিজ্ঞেস করে, "ডিপটি সাহেব কোন ঘরে শোবেন ?"

"হঠাৎ এ প্রশ্ন ?"

"কারণ বিছানা করতে হবে। রান্না হয়ে গেছে।"

"খালাসীকে বললেই তো সে বিছানা করে দিত। কেন আপনি এত হাঙ্গামা করছেন ?"

"করতে ইচ্ছে করছে বলে।"

"ভাল লাগছে ?"

"হ্যাঁ।"

"কেন ?"

"জানি না যান। এবারে উঠে আমাকে কাজ করতে দিন তো।"

সুপ্রিয় আর শেলীর অবাধ্য হয় না।

খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকতে রাত দশটা বেজে যায়। খালাসী চলে যায় বাড়ি। উইলিয়ম শুয়ে পড়েন দক্ষিণ দিকের ঘরে। উত্তর দিককার ঘরখানি নির্দিষ্ট হয়েছে সুপ্রিযর জন্য। আর মাঝের ঘরে শেলী।

সুপ্রিয় এসে শুযে পডে বিছানায়। শেলীও দোরে খিল দেয়।

কিছুতেই কিন্তু ঘুম আসে না সুপ্রিয়র। কিসের একটা অব্যক্ত অস্বস্তিতে বারবার বিচলিত হয়ে ওঠে। অজানা একটা বেদনাবোধ তাকে কেমন যেন অস্থির করে তুলেছে। পরিবার-পরিজন সবাইকে ছেড়ে আসার সময়ও সুপ্রিয় এমন বেদনাহত হয় নি।

কেন এই বেদনা? মেয়েদের সংস্পর্শে আসা তার জীবনে এই প্রথম নয়। কলকাতার ছেলে সুপ্রিয়। কত মেয়ের সঙ্গে আলাপ আছে তার। কিন্তু তাদের সঙ্গে শেলীর যেন কোথায় তফাৎ? তারা কেউ শেলীর মতো মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। অথচ কতক্ষণেরই বা পরিচয়? তবু কেন মন এত উতলা হচ্ছে? সে কি শেলীকে ভালোবেসে ফেলেছে?

তা কেমন করে সম্ভব। দু'জনার মাঝে যে ব্যবধান বিস্তর। সমাজ, ধর্ম ও পারিপার্শ্বিকতার কোনো মিল নেই তাদের মধ্যে। নেহাতই পথের দেখা। আর কখনও এমন কাছাকাছি হবে না ওরা। হয়তো কোনদিন দেখাই হবে না। তাহলে কেন এই আকুলতা? কেন এই দুঃসহ দহন জ্বালা?

যুক্তি দিয়ে মনের মুক্তি মেলে না। দুঃসহ জ্বালায় ক্রমেই অস্থির হয়ে ওঠে সুপ্রিয়। এ জ্বালা যৌবন-ধর্ম জেনেও সে আর শুয়ে থাকতে পারে না। দরজা খুলে বারান্দায় বেরিয়ে আসে। একখানি চেয়ার টেনে বসে। পাশের ঘরে শেলী। কত কাছে অথচ কত দূরে! অন্ধকার চারিদিক। অন্তহীন অন্ধকার। সুপ্রিয় শিউরে উঠে। এ কি তার জীবনের ছবি? সে কি তার মনের আলো ফেলেছে হারিয়ে?

"এ কি, এখানে এভাবে বসে রয়েছেন?"

চমকে ওঠে সুপ্রিয়। কখন শেলী এসে তার পেছনে দাঁড়িয়েছে, তা টের পায় নি।

"কথা বলছেন না যে!" শেলী আবার প্রশ্ন করে।

"ভাবছি।"

"কি?"

উঠে দাঁড়ায় সুপ্রিয়। এগিয়ে আসে শেলীর কাছে। কম্পিত কণ্ঠে বলে, "ভাবছিলাম তোমার কথা।"

শেলী চুপ করেই থাকে।

ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায় সুপ্রিয়র। সে শেলীর একখানা হাত তার হাতে তুলে নেয়।

শেলী হাত ছাড়িয়ে নেয় না। কিন্তু সুপ্রিয় বুঝতে পারে শেলী কাঁপছে। সুপ্রিয় তাকে কাছে টেনে নেয়।

নীরব ঝর্ণা আছড়ে পড়ে কলস্বনা সাগরে। শেলী মুখ লুকায় সুপ্রিয়র বুকে।

*　　*　　*

পরদিন সকালে শেলী চলে যায়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সুপ্রিয় তৈরি হয়ে অফিসে আসে। কর্মচারীদের সঙ্গে কথা বলে। ফাইল-পত্র দেখে। কাজের অবস্থাটা মোটামুটি বুঝে নেয়। সুপ্রিয়র পদে এখানে এসে কেউ বেশি দিন থাকে না। তাই সব কাজই অসম্পূর্ণ। সরেজমিনে তদন্ত করা দরকার। সে পথে বের হয়। রংগ্রামের পথে।

গ্রাম প্রায় জনশূন্য। সমর্থ মেয়ে-পুরুষরা সবাই শেষরাতে উঠে রান্না সেরে ফেলেছে। কিছু মুখে দিয়ে, কিছু সঙ্গে নিয়ে চলে গেছে ক্ষেত-খামারে, পথে প্রান্তরে—দিনের কাজে। দিনের শেষে মজুরী নিয়ে ঘরে ফিরবে। রান্নার পাট চুকিয়ে রাতের খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়বে। এই হলো গারো পাহাড়ের জীবন। যে জীবনের সঙ্গে জীবন মেলাতে সুপ্রিয় এসেছে এখানে।

পরিদর্শন শেষে অফিসে এসে সুবিধা-অসুবিধার কথা লিখে জানায় একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারকে। কর্মচারীদের নির্দেশ দেয়। তারপরে ফিরে আসে কোয়াটার্সে। কাজের লোকের অভাব নেই। অফিসের খালাসীরাই বাড়ির সব কাজ করে দেয়। ওরা আজ্ঞাবহ, সব সময়েই আদেশের প্রতীক্ষায় থাকে।

এই কর্মমুখর প্রাচুর্যভরা জীবনেও বারবার উন্মনা হয়ে যায় সুপ্রিয়। একটা অভাববোধ তাকে কেবলই বিচলিত করে তোলে। দুঃসহ এই মানসিক যন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে সে চিঠি লিখতে বসে।

সুপ্রিয় চিঠি লেখে মাকে। মনের দাবানল নেভে না। লেখে বৌদিকে। নিজের অলক্ষ্যেই শেলীর কথা লিখতে শুরু করে। লিখতে লিখতে আনমনা হয়ে পড়ে। খেয়াল হয় না কখন হাতের কলম নিশ্চল হয়ে মনের কলম সচল হয়েছে।

কিন্তু শেলীকে চিঠি লিখতে পারে না সুপ্রিয়। নানা ভাবনা এসে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

হঠাৎ একদিন শেলীর চিঠি আসে।

'যুক্তির সঙ্গে আবেগের লড়াইয়ে হেরে গেলাম। তিনরাত শুধু চোখের জল ফেলেছি। আজ কিছুতেই নিজেকে সংযত করতে পারলাম না। কলম নিয়ে বসলাম।

কিন্তু কি লিখব? কার কথা, তোমার না আমার? না সেই পরম মুহূর্তের কথা। শহরের কোলাহল থেকে বহুদূরে, প্রকৃতির অনির্বচনীয় শান্ত স্তব্ধতার মাঝে আমার প্রেম তোমার স্বীকৃতি পেল। ঘন তমসার মাঝে নিরালায় তোমাকে পাওয়ার সে ক্ষণটুকু খুবই সংক্ষিপ্ত। আমি তাকে দীর্ঘতর করতে চাই, চিরস্থায়ী করতে চাই।

হয়তো এ আমার অতিরিক্ত আশা। তুমি কত বড়, আমি কত ছোট। অথচ সেদিন তো তুরা ডাকবাংলোয় তোমাকে দেখার পর থেকেই তোমাকে আমার ভাবার স্পর্ধা দেখা দিয়েছিল মনে। সেই স্পর্ধাই প্রেরণা জাগিয়েছে তোমাকে ভালোবাসার। জানি না এ ভালোবাসা দুঃখের কারণ হবে কি না? যদি হয়, সে-দুঃখকে পরম সমাদরে বরণ করে নেব। তোমার কাছে শুধু একটি অলিখিত অনুমতি চাই। আমি যেন তোমার বিনিদ্র রজনীর সহচরী হয়ে থাকি তোমার মধুময় স্মৃতিতে। তোমার যশ, তোমার খ্যাতিতে আনন্দ পাওয়ার দাবি যেন আমার থাকে।

তোমার আনন্দোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি। কামনা করি তোমার যশ এবং সুখ্যাতি। তোমার সুস্থ জীবন। তুমি প্রণম্য, তাই তোমাকে প্রণাম জানাই অকপটে।'

বিনিদ্র রাত্রির সমাপ্তি ঘোষণা করে প্রভাতের সোনা-ঝরা আলো। দিন আসে আশার বাণী নিয়ে, কাজের তাগিদ নিয়ে। খালাসী চা দিয়ে যায়। নিয়ে আসে খবরের কাগজ। পাঁচ দিন পরে কাগজ আসে এখানে। কিন্তু সেই পুরনো খবরই নতুন হয়ে ওঠে সুপ্রিয়র কাছে। সে মন দিয়ে কাগজ পড়ে। গারো পাহাড়ের বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে পুরনো কাগজের মাধ্যমে।

তারপর সুপ্রিয় হাঁটতে হাঁটতে অফিসে এসে হাজির হয়। অফিস তখন জনশূন্য। সুপ্রিয় কাজ করতে থাকে। কিছুক্ষণ বাদে কর্মচারীরা আসতে শুরু করেন। আসেন বড়বাবু। প্রথম দিন তিনি একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলেন। হাসতে হাসতে বলেছিলেন, "স্যার এত সকালে এসে গেছেন!"

"সকাল কোথায়, দশটা বাজে যে।"

"আজ্ঞে, আগের সাহেব বারোটায় আসতেন।"

"খুব অন্যায় করতেন।"

সবার আগে রোজই অফিসে আসে সুপ্রিয়। এসে ওভারশিয়ারদের টেবিলের কাগজপত্র উল্টে-পাল্টে দেখে। দেখে কার কাছে কি রকম কাজ জমে আছে। তারপরে ওরা এলে ওদের একে একে ডাকে। হাতের কাজ শেষ করে ফেলতে বলে। নতুন কাজের ফিরিস্তি দেয়।

অফিসের কাজ শেষ হলে সুপ্রিয় পথে বের হয়। যেখানে পথ, পুল কিংবা বাড়ি তৈরি হচ্ছে, সেখানে যায়। স্বচক্ষে কাজ দেখে। মালপত্র ও মজুরদের হিসেব নেয়। বুঝতে পারে তার এই কর্মতৎপরতা ওভারশিয়ারদের মনঃপুত নয়। কণ্ট্রাক্টররাও অখুশী। কিন্তু সুপ্রিয় কাজ করে যায়। সে কাজ করতেই এসেছে। বিশেষ করে কাজেই মধ্যেই সে যতক্ষণ সম্ভব শেলীকে ভুলে থাকতে চায়। স্মৃতির ওপর কাজের সাময়িক প্রলেপ লাগায়।

খানিকটা সফলও হয়। রাতে ছাড়া এখন আর শেলীর কথা বিশেষ মনে পড়ে না। কেমন করে পড়বে? শুধু তো কাজ নয়, কাজের সঙ্গে যে অকাজও জুটে যায়। এই যেমন আজ পথ-তৈরির কাজ দেখে নোকফাস্থেব পাশ দিয়ে দপ্তরে ফিরছিল সুপ্রিয়। সঙ্গে ওভারশিযার জেফারসন ও খালাসী যোগেশ। নোকফাস্থের দোবে দাঁড়িযেছিল নকমা অর্থাৎ মোড়ল। সে তাঁকে নমস্কার করে বলে, "ডিপটিসাহেব! একবার আমাদেব নোকফাস্থেটা দেখে যাবেন না।"

নোকফাস্থে শব্দের অর্থ অবিবাহিতদের নিদ্রানিবাস। নোক মানে আবাস, ফাস্থে মানে অবিবাহিত যুবক। গারো পাহাড়ের প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই এরকম একটি নিবাস আছে। গ্রামের সবাই মিলে এটি বানায। গাঁযের যে সব অবিবাহিত যুবকদের বাড়িতে শোবার জায়গা নেই, তারা গ্রামের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এই রমণীয় নিকেতনে রাত্রি বাস করে। রাতে মেয়েদের প্রবেশ নিষেধ এই নিবাসে। এটি কেবল অবিবাহিতদের জন্যই নির্দিষ্ট নয়। ভিন-গাঁয়ের কিংবা ভিন-দেশের পুরুষ মানুষ গ্রামে এলে তারাও এখানে বাস করে। এটি গ্রামের গেস্ট হাউস বা অতিথিশালা। গ্রামের সব চেয়ে সুন্দর ও ভাল বাড়ি। বেড়া ও চালে নানারকম কারুকার্য। যথাসাধ্য নয়নাভিরাম করা হয়েছে ঘরখানিকে।

জেফারসন ও যোগেশকে নিয়ে ভেতরে ঢুকল সুপ্রিয়। নকমার অনুরোধে সে একটু বসে। নকমার মেয়ে বোতলে করে আনারসের মদ নিয়ে আসে।

মদ গারো পাহাড়ের প্রিয়তম পানীয়। বাড়িতেই মদ তৈরি হয়।

দু'রকমের মদ আছে। পচাই ও আনারসের মদ। পচাইকে ওরা বলে ছু-বিচ্ছু। মাটির জালায় ভাত ভরে একখানি সরা দিয়ে মুখ বন্ধ করে জালাটি মাটিতে পুঁতে রাখে। নির্দিষ্ট সময় পরে মাটি খুঁড়ে জালা তুলে ফেলা হয়। ব্যস, মদ তৈরি। আনারসের মদও প্রায় একই পদ্ধতিতে তৈরি। আনারস গারো পাহাড়ে খুবই সস্তা। আনারসের রস বোতলে ভরে গালা দিয়ে মুখ বন্ধ করে, মাটির নিচে রেখে দেওয়া হয়। রোজ ঐ জায়গাটা জল দিয়ে নিকানো হয়। কয়েকমাস বাদে সেই মাটিতেও ফাটল ধরে। তখন মাটি খুঁড়ে বোতল বের করা হয়। এই মদ স্পিরিটের মত অগ্নিদাহ্য।

মদ গারো পাহাড়ের সকল উৎসবের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ। আশি বছরের বৃদ্ধ থেকে এক বছরের শিশু পর্যন্ত সবাই মদ খায় এখানে। তাই সুপ্রিয়কেও নকমার মেয়ের হাত থেকে বোতলটা নিতে হয়।

পান-পর্ব শেষে সবার সঙ্গে সুপ্রিয় বাইরে এল। আর আসার সঙ্গে সঙ্গেই ঘটনাটা ঘটল।

সবার আগে ছিল নকমা, তারপরে যোগেশ ও জেফারসন। শেষে সুপ্রিয়। কয়েকজন গ্রামবাসী দাঁড়িয়ে ছিল পথের ধারে। তাদের দেখেই যোগেশ চমকে ওঠে। সে থমকে দাঁড়ায়। আর ওরা ছুটে আসে তার দিকে। সুপ্রিয় কিছু বুঝতে পারার আগেই যোগেশ আক্রান্ত হয়। লোকগুলো জড়িয়ে ধরে যোগেশকে। যোগেশ চেষ্টা করে মুক্ত হতে।

ক্রুদ্ধ সুপ্রিয় ওকে সাহায্য করতে এগিয়ে যেতে চায়। কিন্তু বাধা আসে জেফারসনের কাছ থেকে, "এখন ওর কাছে যাবেন না স্যার!"

"কি বলছ তুমি? আমার সামনে ওরা আমার লোককে মারছে আর আমি তাকে সাহায্য করব না।"

"ওরা যোগেশকে মারছে না, কেবল ধরে নিয়ে যাচ্ছে।"

"তুমি দেখছি অদ্ভুত মানুষ। আমাদের একজন লোককে গুণ্ডারা ধরে নিয়ে যাচ্ছে আর আমাকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে বলছ।"

"এরা কেউ গুণ্ডা নয়, সবাই ভাল। এমনি ভাবেই এখানে ধরে নিয়ে যায়।"

"তোমাদের এখানে তাহলে মানুষ চুরি হয়?"

"তা বলতে পারেন! বর চুরি। অখ্রীষ্টান গারো সমাজে এমনি করেই বর ধরে নিয়ে যাওয়া হয়।"

ব্যাপারটা বুঝতে পারে না সুপ্রিয়। কিন্তু আর কোনো প্রশ্ন করে না।

কেবল তাকিয়ে থাকে অসহায় যোগেশের দিকে। চারদিক থেকে ধরে টানতে টানতে ওকে নিয়ে চলেছে। কোথায় কে জানে!

নকমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সুপ্রিয় চলতে শুরু করে। কিছুক্ষণ বাদে জেফারসনকে জিজ্ঞেস করে, ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বল তো!"

জেফারসন বলতে থাকে, "আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন স্যার, মেয়েরাই হচ্ছে এদের সংসারের কর্ত্রী। তারা পুরুষের চেয়ে বেশি পরিশ্রমী। গারো মেয়েরা মোটেই লজ্জাবতী নয়, তারা নিজেরাই মনের মানুষ বেছে নেয়।"

"কেমন করে?" সুপ্রিয় কুতূহলী হয়।

"ছেলেমেয়েদের মেলামেশায় কোনো বাধা নেই সমাজে। ধরুন কোনো কোনো মেয়ের পছন্দ হোল কোনো ছেলেকে। কিন্তু ছেলেটি বিয়ে করতে রাজি নয় মেয়েটিকে। তখন মেয়েটি তার পছন্দের কথা জানাবে তার আত্মীয়-স্বজনদের। তারা এমনি করে ছেলেটিকে ধরে নিয়ে যাবে।"

"তারপরে?"

"ছেলেটিকে নিয়ে যাওয়া হয় মেয়ের বাড়িতে। রাতে দু'জনকে একটা ঘরে ঢুকিয়ে বাইরে পাহারা বসে, যাতে ছেলেটি পালিয়ে যেতে না পারে। মেয়েটি মনের-মানুষকে বশীভূত করার চেষ্টা করতে থাকে। যদি সে নিজের যৌবনের বিনিময়ে তাকে বশীভূত করতে পারল তো গোলমাল মিটে গেল, নয়তো ছেলেটি পালাতে চেষ্টা করে।"

"পারে?"

"পারে বৈ কি! একসময় শ্রান্ত হয়ে মেয়েটি ঘুমিয়ে পড়ে। আর বাইরে যারা পাহারা দেয় তারা মদ খেয়ে বেহুঁশ হয়ে থাকে। সেই সুযোগে ছেলেটা পালিয়ে যায়।"

"তাহলেই কি সে মুক্তি পায়?"

"না। আরও দু'বার তাকে ধরে এনে অমনি করে মেয়েটির ঘরে রাখা হয়। তিনবারেও যদি ছেলেটি বশীভূত না হয়ে সুযোগ করে পালিয়ে যেতে পারে, তবেই তার মুক্তি।"

গোয়ালপাড়া থেকে ফুলবাড়ি। সেখান থেকে দুটি মোটর পথ এসেছে তুরা। একটি রংচুগিরি হয়ে আরেকটি গারোবাঁধা হয়ে। তুরা থেকে একটি

মোটর পথ আড়ুগিরি হয়ে ডালুতে গিয়েছে। ডালু বাংলাদেশ সীমান্তের শেষ গারো গ্রাম। তুরা থেকে গিয়েছে রংমাগিরি·····

কিন্তু এসব কি দেখছে সুপ্রিয়। এ-সব পথ তো এখন তার দেখার দরকার নেই। সে মানচিত্রের অন্যদিকে নজর দেয়। অফিসে বসে গারো পাহাড়ের মানচিত্র দেখছে সুপ্রিয়।

সুপ্রিয় খুঁজে পায়—রংগ্রাম থেকে একটি পথ মেগাগিরি হয়ে রংরেনগিরি গিয়েছে। সিমসাং নদীর তীরে রংরেনগিরি গ্রাম। কেমন সে গ্রাম? শেলী যে সেই গ্রামেরই মেয়ে।

মাত্র পনেরো মাইল। রংগ্রাম থেকে রংরেনগিরি মাত্র পনেরো মাইল। ঘোড়া আছে সুপ্রিয়র। কতক্ষণই বা লাগে যেতে!

তবু যায় নি সুপ্রিয়। যেতে পারে নি।

না, ঠিক তা নয়। এ কথা সত্য যে সুপ্রিয় সারাদিন ব্যস্ত থাকে। তার অনেক কাজ। আগের অফিসাররা কিছুই করেন নি। এখানে নাকি মন টিঁকতো না তাঁদের। তাই তাঁরা দিনগত পাপক্ষয় করে গেছেন। বদলীর তদবির করেই কাজের সময় নিঃশেষ করেছেন। সব কাজই ছেড়ে দিয়েছিলেন ওভারসিয়ার ও কনট্রাকটারদের ওপর। ফলে এসেছে দুর্নীতি। কাজ হয় নি কিন্তু খরচ হয়েছে। সরকারী হিসেবে বলা হয়েছে উন্নয়নের জন্য এত টাকা খরচ হয়েছে, কিন্তু উল্লেখযোগ্য কোন উন্নতি হয় নি গারো পাহাড়ের।

কিন্তু কতদিন শেলীকে দেখে নি সে। অথচ তাকে কথা দিয়েছিল, অফিসের কাজটা একটু গোছাতে পারলেই, একদিন যাবে তাদের গ্রামে।

অফিসের কাজ থেকে অবসর নেওয়া সম্ভব নয় কিন্তু কাজ গোছানো হয়েছে বহুদিন। দিন দুয়েকের জন্য ঘুরে আসতে পারত অনায়াসে।

তবু যায় নি সুপ্রিয়। ইচ্ছে করেই যায় নি। যাবার কথা ভাবতেই সে কেমন একটা সংকোচ বোধ করেছে, কুণ্ঠিত হয়ে পড়েছে, দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছে। শেলীর বাবা সহজ মানুষ। তিনি খুবই খুশি হবেন। কিন্তু তার মা, পরিবারের অন্যান্যরা? তাঁরা কি ভাববেন? তাঁদের কাছে কি ওদের দুজনের প্রকৃত সম্পর্কের কথা গোপন থাকবে?' এ কথা কি গোপন রাখা যায়?

কিন্তু শেলীরই বা দিন কাটছে কেমন করে? সামনে পরীক্ষা। হয়তো পড়াশুনাই করতে পারছে না। খোলা বই পড়ে আছে সামনে আর শেলী সুপ্রিয়র চিন্তায় বিভোর হয়ে রয়েছে। নিজেকে দিয়েই সুপ্রিয় বুঝতে পারে শেলীর অবস্থা। সারাদিনের শত কাজের মাঝেও শেলী তার মন জুড়ে বসে

আছে। সর্বদাই সে শেলীর কথা ভাবছে। শুধু কি ভাবা, তাকে দেখার জন্য, তাকে কাছে পাবার আকুলতায় ব্যাকুল হয়ে থাকে সে।

তবু সে যায় নি শেলীর কাছে। কিন্তু আর যে না গেলেই নয়। শেলীর মা ও অন্যান্যরা যা-ই ভাবুন, সুপ্রিয়কে কাল যেতেই হবে রংরেনগিরি। আজ যে আবার শেলীর চিঠি এসেছে—

সু,

বর্ষণমন্দ্রিত মধ্যাহ্নে তোমাকে মনে পড়ছে। আমার মনের আকাশও মেঘমেদুর। তাই আজকের এই বৃষ্টিভেজা গাছপালার সঙ্গে আমার চোখের পাতাও ভিজে উঠেছে। আর তোমার জন্য অজানা আশঙ্কায় বুকটা বার বার কেঁপে উঠছে। তোমার ভাবনায় আমার দিনের কাজ আর রাতের ঘুম নিঃশেষ হযেছে! কিন্তু কাউকে জানাতে পারছি না আমার ব্যথা।

অনেক, অনেক দিন তোমাকে দেখি না। তোমার কথা শুনি না। আবার কবে তোমাকে দেখব জানি না। কবে তোমাকে আমার করে পাবো, তাও জানি না। কিন্তু আমার মনের দেবালযে আমি তোমারই আলো রেখেছি জ্বালিযে।

তোমাকে আমি দেখতে চাই অনেক উঁচু আসনে। তোমার অক্লান্ত পরিশ্রম তোমাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করুক সেই আসনে। তুমি একদিন পূজিত হবে গারো পাহাড়ের ঘরে ঘরে।

সেদিন তোমার সংখ্যাতীত গুণমুগ্ধের ভিড়ে হযতো আমি যাবো হারিয়ে। তবু কোন দুঃখ করব না ' কারণ সবচেযে বড় ত্যাগ যে আমাকেই করতে হবে। মনের সব বাসনাকে মনের মাঝে বন্দী রেখে আমি তোমাকে এগিযে দেব যশের সর্বোচ্চ সোপানে। চোখের জলে বুক ভাসিয়ে মাথা উঁচু করে দেখতে পাবো—আমার তুমি কত বড হয়েছ·· ·'

আর পডতে পারে নি সুপ্রিয। চোখ মুছে সে তাড়াতাড়ি মানচিত্র নিযে বসেছে। নিজের প্রতি একটা ধিক্কার এসেছে ' শেলীর এই ভালোবাসাকে অবহেলা করেছে সে। কর্তব্য ও সৌজন্যের কথা ভেবে সে শেলীর সঙ্গে দেখা করে নি। প্রেম ও প্রীতি সহজাত মানসিক বৃত্তি। অথচ সে সেই বৃত্তিকে যুক্তি ও বুদ্ধির নিরিখে নিরূপণ করতে চেয়েছে।

মানচিত্র গুটিয়ে রেখে সুপ্রিয় ঘণ্টা বাজায়। বেয়ারা ঘরে আসে। সুপ্রিয় বলে, "বড়বাবুকে সেলাম দাও।" সে শেলীর চিঠিখানি পকেটে রাখে।

বড়বাবু আসেন, "আমাকে ডেকেছেন স্যার ?"

"হ্যাঁ বসুন।" সুপ্রিয় বলে, "আমি কাল রংরেনগিরি যেতে চাই।"

"মিস্টার উইলিয়মের ওখানে উঠবেন ?"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু কাল যে সেই টেণ্ডারটার লাস্ট ডেট।" বড়বাবু বলেন, "আপনি না থাকলে········ "

বড়বাবু শেষ করার আগেই সুপ্রিয় জিজ্ঞেস করে, "কবে খুলতে হবে ?"

"পরশু বিকেল চারটায়।"

"আমি তার আগেই ফিরে আসব।"

"তাহলে কাল সকালেই বেরিয়ে পড়ুন।" বড়বাবু পরামর্শ দেন। "আমি ঘোড়া ঠিক করে রাখতে বলছি। কে কে আপনার সঙ্গে যাবে স্যার ?"

"কেউ নয়।" সুপ্রিয় একটু হাসে, "বড়বাবু, আমি ইন্‌স্‌পেকশানে যাচ্ছি না, বেড়াতে যাচ্ছি। অফিসের লোকজন আমার কাজের সঙ্গী, বেড়াবার সাথী নয়। আমি একাই যাবো।"

"একা যাবেন!" বড়বাবু বিস্মিত। এমনটি তিনি কখনও দেখেন নি। আগের অফিসাররা কেউ এমন কথা বলেন নি। তবু তিনি বলেন, "স্যার, রংরেনগিরি আমাদের সাব-ডিভিশানের একটি গ্রাম। আপনাকে দেখলেই গ্রামবাসীরা নানা অভিযোগ করবে। বেড়াতে গেলেও আপনাকে শেষ পর্যন্ত ইন্‌সপেকশান করতে হবে। তাছাড়া অচেনা বনপথ, একজন খালাসী অন্তত আপনার সঙ্গে যাক স্যার।"

আবার হাসে সুপ্রিয়। বলে, "গ্রামবাসীদের অভাব-অভিযোগের কথা আমি একাই শুনতে পারব। আর বনময় গারো পাহাড়ে বন্যজন্তু থাকলেও মানুষ বাস করে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমার সঙ্গে রাইফেল থাকবে।"

স্বপ্ন ও সুপ্তির টানাটানিতে রাতটা কোনমতে কেটে যায়। খুব সকালেই শয্যাত্যাগ করে সুপ্রিয়। খালাসীকে ডেকে তোলে। চা ও খাবার খেয়ে বেরিয়ে পড়ে পথে। রংরেনগিরির পথে। সেখানে শেলী আছে।

পথের প্রকৃতি একই রকম। দু-দিকেই বন—বাঁশবন। গারো পাহাড়ের লক্ষাধিক টাকা আয় হয় এই বাঁশ রপ্তানী করে। তবে আরও অনেক বেশি আয় হতে পারে যদি আধুনিক পদ্ধতিতে এই বনসম্পদের উন্নয়ন করা

যায। এ বিষয়ে সুপ্রিয় একটি বিস্তৃত পরিকল্পনা পেশ করবে সরকারের কাছে।

নানা কথা ভাবতে ভাবতে পথ চলেছে সুপ্রিয়। ভাবনা কিন্তু তার চলার গতি কমাতে পারছে না। বেশ জোরে ঘোড়া ছুটিয়েছে সে। সুপ্রিয় শেলীর কাছে চলেছে। তাব যে আব তব সইছে না।

পথের পাশে ছোট-বড় গ্রাম। আড়াই হাজারেব মতো গ্রাম আছে গারো পাহাড়ে। উত্তর-পূর্ব ভারতের সবচেয়ে বেশি গ্রাম এ জেলায়। এর কারণ গারো চাষীরা যেখানেই চাষের জমি পায়, সেখানেই বাসা বাঁধে। গড়ে ওঠে গ্রাম। এমন অনেক গ্রাম আছে, যাদের জনসংখ্যা দশজনেরও কম। তবু সেগুলি গ্রামের মর্যাদা পায় গারো পাহাড়ে। মিজো বা খাসিয়াদের মতো মতো গ্রাম প্রতিষ্ঠার কোন বাঁধা-ধরা নিয়ম নেই গারো পাহাড়ে। তবে পাহাড়ী গ্রামগুলি সাধারণতঃ উঁচু জমিতে জলের উৎসের কাছে গড়ে ওঠে।

গ্রামের চেয়ে গ্রামের বাড়ি বেশি আকর্ষণীয়। সুপ্রিয় পথে বের হলেই বাড়িগুলির দিকে চেয়ে থাকে। এতদিন দেখেও সে দেখার আশ মেটে নি। আজও দেখছে। দেখছে ছোট-ছোট বাড়িগুলির আঙিনা। দেখছে কাঠের সেই বিচিত্র খুঁটিগুলি—যেগুলি পরিবারের মৃত ব্যক্তিদের স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত। কম পক্ষে দুটি খুঁটি পোঁতা আছে প্রত্যেক বাড়ির সামনে। কোন কোন বাড়ির উঠানে চল্লিশ-পঞ্চাশটি খুঁটি। সাধারণ খুঁটি নয়। গাছের গুঁড়িকে মানুষের আকারে খোদাই করে পুঁতে রাখা হয়েছে। খুঁটিগুলির গায়ে মৃত ব্যক্তিদের পোষাক

স্মৃতিরক্ষার এই পদ্ধতিটি প্রাচীন। কাজেই শহরে বা গঞ্জে, যেখানে আধুনিকতার হাওয়া বইছে, সেখানে এই সব স্মৃতিচিহ্ন দেখা যায় না। তুরাতে নেই বললেই চলে, বংগ্রামেও খুব কম বাড়ির সামনে আছে। সুপ্রিয় মনোযোগ দিয়ে স্মৃতিস্তম্ভগুলি দেখছে। দেখতে দেখতে পথ চলেছে। বংগ্রাম থেকে রংরেনগিরির পথ। শেলীর গাঁয়ের পথ। সুপ্রিয় শেলীর কাছে চলেছে।

চলতে চলতে এক সময় পথ যায় ফুরিয়ে। সুপ্রিয় পৌঁছয় শেলীদের বাড়ির সামনে। যে ভাবেই হোক, খবরটা রটে গিয়েছে। উইলিয়ম বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। সঙ্গে কয়েকজন লোক। তারই জন্য অপেক্ষা করছেন। সুপ্রিয়কে দেখতে পেয়ে তাঁরা ছুটে আসেন কাছে। উইলিয়ম বলেন, "আসুন, কি সৌভাগ্য আমার।"

"হ্যাঁ, কষ্ট দিতে এলাম।" সুপ্রিয় উত্তর দেয়। সে ঘোড়া থেকে নামে।

একজন লোক এগিয়ে এসে লাগামটা সুপ্রিয়র হাত থেকে নেয়। ঘোড়াটিকে নিয়ে যায়।

"বহুদিন আগের থেকেই যে এই কষ্টটুকু পাবার জন্য প্রতীক্ষা করছি।" উইলিয়ম উত্তর দেন। তাঁর সঙ্গীরা মৃদু হাসেন। উইলিয়ম তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। তাঁরা সবাই গ্রামবাসী।

কথা বলতে বলতে সুপ্রিয় চারিদিকে তাকায়। না, শেলীকে দেখতে পায় না কোথাও।

আশ্চর্য! সুপ্রিয় এসেছে শুনেও শেলী বাড়ির বাইরে আসে নি। সে তো পর্দানশীন নয়। তাহলে কেন আসে নি?

অভিমানে ভরে ওঠে সুপ্রিয়র মন। কিন্তু সে-কথা প্রকাশ করা যাবে না। নিজের মনের মাঝে নিজেই জ্বলতে থাকে। দুঃসহ জ্বালা। তবু সইতে হয়।

উইলিয়ম বলেন, "চলুন, ভেতরে যাওয়া যাক্।"

"চলুন।" বলে সুপ্রিয় তাঁর সঙ্গে বাড়ির ভেতরে রওনা হয।

উইলিয়ম জিজ্ঞেস করেন "গারো পাহাড় কেমন লাগছে?"

"ভাল।" সুপ্রিয় সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়।

বেশ বড বাড়ি। টিন আর কাঠের বাড়ি। কথা বলতে বলতে ওরা বারান্দায় উঠে আসে। বারান্দার এক দিকে ছোট একখানি ঘর। অন্যদিকে কয়েকখানি চেয়ার ও বেঞ্চি—বৈঠকখানা। আরও কয়েকজন লোক বসে আছেন সেখানে। ছোট ঘরখানি দেখিযে উইলিয়ম বলেন, "ঐ ঘরে আপনার থাকার ব্যবস্থা করেছি। কিন্তু আসুন একটু এখানে বসা যাক। এরা আপনারই জন্যে বসে আছেন।"

"আমার জন্য!" সুপ্রিয় বিস্মিত।

"হ্যাঁ। ওরা গ্রামের রাস্তা-ঘাট উন্নয়নের জন্য আপনার কাছে দরবার করতে এসেছেন।"

সুপ্রিয় আর কোন কথা বলে না। সে এগিয়ে আসে গ্রামবাসীদের কাছে। মনে মনে ভাবে—'ঢেকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।' বড়বাবুও কাল এই কথাটাই বলতে চেযেছিলেন। যে জন্যই সুপ্রিয় আজ এখানে এসে থাকুক, সে সরকারী অফিসার—পাবলিক সারভেণ্ট।

কাছে আসতেই গ্রামবাসীরা উঠে দাঁডান, সুপ্রিয়কে নমস্কার করে। প্রতি-নমস্কার করে সুপ্রিয় একখানি চেয়ারে বসে। গ্রামবাসীদের বসতে বলে।

উইলিয়ম বাড়ির ভেতর চলে যান। গ্রামবাসীরা কাজের কথা পাড়েন।

গ্রামের জল-নিষ্কাষণ, পানীয় জল সরবরাহ ও পথের দুরবস্থার কথা বলেন। বহু বছর হল কোনো এস. ডি. ও আসেন নি এ গ্রামে।

"আপনি যখন কষ্ট করে এতদূর এলেন", ওরা সুপ্রিয়কে বলেন, "একবার সচক্ষে দেখে যান আমাদের দুর্দশা। আমরা বিকেলে আসব। আপনাকে নিয়ে যাবো গ্রামের ভেতরে।"

"বেশ তো আসবেন। আমি যাবো আপনাদের সঙ্গে। আর তাই তো এলাম এখানে।" সুপ্রিয় বলে। অবস্থার বিপাকে মানুষ অনেক সময় মিথ্যে কথা বলতে বাধ্য হয়।

উইলিয়ম ফিরে আসেন। সঙ্গে জনৈক পরিচারক। তার হাতে চা ও জল-খাবারের পাত্র। আশ্চর্য, এবারেও শেলী এলো না, কেন? গ্রামবাসীরা রয়েছেন বলে। কিন্তু শেলী তো গ্রামের মেয়ে, তার ওপরে কলেজ গার্ল।

চা খাবার পরে আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা চলে। সুপ্রিয়র ব্যবহারে গ্রামবাসীরা মুগ্ধ হন। সে প্রতিশ্রুতি দেয়—গ্রামের উন্নয়নে যথাসাধ্য সাহায্য করবে। তাকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ দিয়ে গ্রামবাসীরা বিদায় নেন।

উইলিযম সুপ্রিযকে নিযে আসেন ছোট ঘরখানিতে। বলেন, "আপনি পোশাক পালটে একটু বিশ্রাম করুন। তারপর স্নান সেরে নিন। আমি একবার খামার থেকে ঘুরে আসছি।"

উইলিয়ম চলে যান।

সুপ্রিয় ঘরখানি দেখে। একপাশে তক্তপোষের ওপরে বিছানা পাতা। আর এক পাশে একটি টেবিল ও দুখানি চেয়ার। টেবিলের ওপরে ফুলদানিতে কয়েকটি তাজা ফুল। ঘরের এক কোণে একটা কুঁজো। ঘরখানিতে সুপ্রিয় শেলীর হাতের পরশ পায়।

কিন্তু কোথায় শেলী? প্রায় এক ঘণ্টা হল সে এখানে এসেছে। এখনও শেলীর সঙ্গে দেখা হল না।

কি পোশাক পালটাবে! সুপ্রিয় শুযে পড়ে। শুযে শুযে সেই একই ভাবনায় অস্থির হয়ে ওঠে। কেন আসছে না শেলী। সে কি কোন কাজে ব্যস্ত আছে? কি সে কাজ? সুপ্রিযর কাছে আসার চেয়ে তার এমন কি বড় কাজ থাকতে পারে?

"এ কি শুযে রয়েছেন কেন? স্নান করতে যাবেন না।"

তাড়াতাড়ি উঠে বসে সুপ্রিয়। শেলী এসেছে। কখন? টের পায় নি।

শেলী হাসছে। সুপ্রিয় কথা বলে না। শেলী জিজ্ঞেস করে। "অমন করে

চেয়ে রয়েছেন কেন ? কি দেখছেন ?"

"আমার শেলীকে।" সুপ্রিয় মুগ্ধ।

"আস্তে।"

"কেন ?"

"কেউ শুনতে পাবে।"

"শুনলে কি হবে ?"

"জানি না, যান।"

"উঁহু।"

"কি ?"

"যান নয়, যাও।"

"প্রকাশ্যে বলার অসুবিধে আছে।"

"এখানে আর কেউ নেই।"

"যদি অভ্যেস হয়ে যায় ?"

"কি হবে তাতে ?"

"কারও সামনে বলে ফেললে বিপদে পড়ব।"

"কি বিপদ ?"

"দুঃসাহসের বিপদ। গারো পাহাড়ের মেয়ের একজন বাঙালী ইঞ্জিনিয়ারকে তুমি বলার অধিকার নেই।"

"যদি তাকে সে অধিকার দেওয়া হয় ?"

শেলী সে প্রশ্নের উত্তর দেয় না, চুপ করে থাকে।

সুপ্রিয় আবার বলে, "সে অধিকার তো আমি দিয়েছি শেলী! তাহলে তোমার এ দ্বিধা কেন ? তুমি কি আমাকে বিশ্বাস করতে পারছ না।"

"ছি, ছি, এ তুমি কি বলছ ? অবিশ্বাসীকে কি কেউ কখনও ভালোবাসে ? তবে আমার বড্ড ভয় করে, পাছে তোমার কোন ক্ষতি হয়।"

সুপ্রিয় হাত বাড়িয়ে শেলীর একখানি হাত ধরে। শেলী তার কাছে এগিয়ে আসে। সুপ্রিয় শান্ত স্বরে বলে, "তুমি নির্ভয়ে থাকো, তোমাকে পেলে আমার জীবনের খাতায় লাভের ঘরই ভরে উঠবে। তোমার মাঝে আমি বেঁচে থাকার সার্থকতা খুঁজে পাবো।"

শেলীর চোখদুটি কখন জলে ভরে উঠেছিল, টের পায় নি সুপ্রিয়। টের পেল যখন সেই জলভরা চোখ উপচে দু-ফোঁটা উষ্ণ-অশ্রু তার হাতের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ে।

"তুমি কাঁদছ শেলী?" সুপ্রিয় বিচলিত।

শেলী তাড়াতাড়ি হাত ছাড়িয়ে নেয়। দু-হাতে চোখ মোছে। একটু ম্লান হাসে।

"কাদছ কেন?" সুপ্রিয় আবার প্রশ্ন করে।

"আনন্দে।" শেলী আবার হাসে।

সুপ্রিয় চুপ করে থাকে।

শেলী বলে, "এ আনন্দের স্বাদ আমি যে জীবনে আর পাই নি। তাই অবাধ্য আনন্দাশ্রুর বন্যাকে রোধ করতে পারলাম না।" একবার একটু থামে সে। তারপরে স্থির কণ্ঠে বলে, "বেশ, তোমার কথাই থাকবে। আমি সবার সামনেই তোমাকে 'তুমি' বলব। তাতে হয়তো সুবিধাই হবে।"

"এই তো বুদ্ধিমতী মেয়ের মতো কথা।" সুপ্রিয় শেলীকে কাছে টেনে নেয়। কিছুক্ষণ নীরবে কেটে যায়। ওরা অপলক নয়নে দুজনে দুজনকে দেখে।

"বুদ্ধিমতী মেয়েকে আর বেশিক্ষণ এভাবে এ ঘরে আটকে রাখলে, বাড়ির লোক তাকে খুঁজতে আসবে।"

"আসুক্ গে।" সুপ্রিয় শেলীকে ছেড়ে দেয় না।

"অবুঝ হয়ো না, লক্ষ্মীটি! এখন আমাকে যেতে দাও। তুমি আরও অনেকক্ষণ এখানে আছো। সারা বিকেল ও সারা রাত পড়ে আছে।"

"রাতে তুমি আসবে কি?"

"আসব বৈ কি।"

"কখন?"

"যখন তুমি চাইবে।"

"যদি বলি, সবাই ঘুমিয়ে পড়লে?'

"সে সময় এখনও হয় নি সু! আর তার অসুবিধেও আছে। লক্ষ্মীটি, অবুঝ হয়ো না। আমি আসব। যখুনি সুযোগ পাবো, তখুনি আসব। আসব না! আজ তুমি এসেছ আমার ঘরে। আজকের এ দিনটি যে আমার বহু বিনিদ্র রাতের সাথী, আমার কুমারী জীবনের পুণ্যতম তিথি।"

*   *   *   *

প্রায় মাসখানের পরে। ছুটির পর সুপ্রিয় একা অফিসে বসে আছে। জরুরী একটা ফাইল দেখছে। একজন লোক ঘরে ঢোকে। সুপ্রিয় তাকিয়েই বলে ওঠে, "আরে যোগেশ যে!"

"হ্যাঁ, সাহেব।"

"তারপরে তোর খবর কি? পালিয়ে এলি বুঝি?"

"না-হুজুর!" মাথা নত করে সে বলে, "আমারই ভুল হয়েছিল। মেয়েটা বেশ ভালই।"

"ও, তুই বুঝি রাজী হয়ে গেলি।"

যোগেশ নিরুত্তর।

"কবে বিয়ে?" সুপ্রিয় আবার জিজ্ঞেস করে।

"আজ্ঞে কাল।" আপনাকে কিন্তু যেতে হবে। ও বিশেষ করে বলে দিয়েছে। আমার ভাই এসে আপনাকে নিয়ে যাবে।"

প্রথমে আপত্তি জানালেও পরে সুপ্রিয় ভাবে মন্দ কি। যোগেশের বিয়ের প্রথম পর্ব সে প্রত্যক্ষ করেছে নোকপ্রান্তের সামনে। শেষ পর্বটা দেখতে পারলে তার অভিজ্ঞতার ঝুড়ি ভারী হবে।

পরদিন সন্ধ্যায় সুপ্রিয় আসে বিবাহ বাসরে। গ্রামের বহু লোক উপস্থিত সেখানে। সকলেই ঝকমকে পোশাক পরেছে। এখন গ্রীষ্মকাল। গরমের দিনে এরা খালি গায়েই থাকে। কিন্তু আজ এখানে সবারই গায়ে চাদর। যুবক-যুবতীরা মাথায় গুঁজেছে পাখির পালক আর বনফুল। গলায় পরেছে গালা, কাচ কিংবা হাড়ের মালা।

কোনো কোনো মেয়ের গলায় পেতল অথবা রুপোর হার। তবে তাদের সংখ্যা খুবই কম। কিন্তু সবারই কানে দুল। একটি নয়, দুটি নয়—অসংখ্য আংটা দিয়ে তৈরি দুল। আগে নাকি ওরা এক এক কানে ষাটটি পর্যন্ত আংটার দুল পরত। এখন আংটার সংখ্যা কমে গেছে। তাহলেও সুপ্রিয় দেখে প্রত্যেক মেয়ের কানেই অনেকগুলি রুপো কিংবা পেতলের আংটা দিয়ে তৈরি দুল—ছ-সাত ইঞ্চি পরিধি বিশিষ্ট এক একটি আংটা। একটির সঙ্গে

আরেকটি ঝুলে আছে। এক কানের কর্ণাভরণের ওজন প্রায় এক সের। কান ছিঁড়ে যাবে বলে দড়ি দিয়ে মাথার সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে। সব চেয়ে আশ্চর্যের কোনো কোনো ছেলের কানেও আংটার মালা ঝুলছে।

কয়েকজন যুবক সেজেছে যুদ্ধের বেশে। হাতে তাদের তীর-ধনুক, বল্লম ও ঢাল। কয়েকজনের গলায় ঝুলছে ঢোলক ও শিঙ্গা। উৎসব শেষে নাচ-গানের আসর বসবে। উপস্থিত নর-নারীরা প্রায় প্রত্যেকেই অংশ নেবে। গারোদের নাচ-গানেব বিষযবস্তু একান্তই নিজস্ব। সবই প্রায় কৃষিকার্যকে কেন্দ্র করে।

সুপ্রিয় ওদের সম্মানিত অতিথি। সে আসতেই সবাই উঠে দাঁড়ায়। নকমা এগিযে এসে তাকে মাচার ওপর বসতে অনুরোধ করে। নকমাও আজ জমকালো পোশাক পরেছে। মাথায তার নক্সা-কাটা পাগড়ি। সুপ্রিয বসলে সবাই বসে। আস্তে আস্তে কথাবার্তা শুরু হয়।

ইতিমধ্যে সুপ্রিয সংসারী গারো সমাজের আরও অনেক নিয়মকানুন জেনে নিযেছে। তবু সে নকমাকে নানা প্রশ্ন করে। নকমা উত্তর দেয়, "আমাদের সমাজেও বিযের বাধা-নিষেধ আছে। যেমন ধরুন গারো পাহাড়ের প্রধান তিনটি সম্প্রদায হল—সাঙ্গমা, মোমিন ও মারাক। কোনো মেযে তার নিজের সম্প্রদাযের ছেলেকে বিযে করতে পারে না। বিবাহযোগ্য পিসতুতো ভাই থাকলে মেযের বর নির্বাচনের প্রশ্ন ওঠে না। কারণ পিসতুতো ও মামাতো ভাই-বোনের বিযে আমাদের সমাজে রাজযোটক।

"মার সম্পত্তি মেযেরা পায। বিযের পরে স্বামী স্ত্রীর বাড়িতে এসে বাস করতে থাকে। সে স্ত্রীর সম্পত্তি ভোগ-দখল করতে পারে কিন্তু বিক্রি করতে পারে না।"

থামতে হয নকমাকে বর-কনে আসরে এসেছে। কনে মোটেই লাজনম্রা নয, ঘোমটা বা ওডনা নেই তার মাথায। সে খিলখিল করে হাসছে। সখীদের সঙ্গে ঠাট্টা ইযারকি করছে। মনে হচ্ছে ওর আনন্দ যেন উপচে পড়ছে! পড়বেই তো, সে যে তার মনের মানুষকে পেয়েছে কাছে, একান্ত নিজের করে।

বর সবার সঙ্গে কনের পরিচয় করিয়ে দেয়। সবাইকে সাক্ষী রেখে তাকে নিজের স্ত্রী বলে ঘোষণা করে। সঙ্গে সঙ্গে সমবেত কণ্ঠের উল্লাসে মুখরিত হয়ে ওঠে চারিদিক।

বর-কনে আসরে বসে।

পুরোহিত এগিয়ে আসেন। সভা শান্ত হয়। পুরোহিত দেবতার কাছে নবদম্পতির সুখ ও শান্তি কামনা করেন।

তার পরে একজোড়া মোরগ-মুরগী এনে ছেড়ে দেয়া হল আসরের মাঝখানে। উপস্থিত অভ্যাগতরা আবার উল্লসিত। ভয় পেয়ে মোরগ-মুরগী-দুটি ছটফট্ করছে। এবারে ছেলে-মেয়েরা তাদের পেছনে লাগল। নানাভাবে তাদের খেপাতে শুরু করল। অসহায় প্রাণীদুটি বৃথাই আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে।

কিন্তু সে চেষ্টাও তারা বেশিক্ষণ করতে পারল না। সেই নৃশংস ঘটনা সংঘটিত হয়। তুমুল হট্টগোলের মধ্যে মোরগ-মুরগীকে মেরে ফেলা হল। ব্যস্, বিবাহ উৎসব সমাপ্ত।

বাড়ির ছেলেমেয়েরা ধরাধরি করে পচাই মদের একটা বিরাট জালা এনে আসরের মাঝখানে রাখে! সবাই উঠে তার চারপাশে ভিড় জমায়। কয়েক মিনিটের মধ্যে জালা নিঃশেষ হয়ে গেল। যে যার জায়গায় ফিরে আসে। যুবক-যুবতীরা হাত ধরে অর্ধচন্দ্রাকারে দাঁড়ায়। ঢোলকে চাঁটি পড়ে। শুরু হয় নাচ গান।

সুপ্রিয়র কর্মজীবনে আর একটি মাস কেটে গেছে। শেলী পরীক্ষা দিতে গোয়ালপাড়া চলে গেছে। যাবার সময় রাত কাটাতে পারে নি। তাড়াতাড়ি ছিল। তবে কিছুক্ষণ থেকে গেছে তার কোয়ার্টার্সে। এইখানে একটি কথা বলে নেওয়া ভাল। তখন ফুলবাড়ি-রংগ্রাম-তুরা মোটরপথ তৈরি হয় নি। ফলে রংরেনগিরির মানুষ রংগ্রাম হয়ে তুরা এসে মানকাচর-লখিপুর-গোয়াল-পাড়া পথের বাস ধরতেন।

এর মধ্যে সুপ্রিয় মোটামুটি গারো ভাষা শিখে নিয়েছে। নিজের জন্য নয়, শেলীর জন্য। শেলী সুপ্রিয়র ভাষা জানে, সুপ্রিয়রও শেলীর ভাষা জানা দরকার। ভাষা শিখতে গিয়ে একটা জিনিস সুপ্রিয় সবিস্ময়ে লক্ষ্য করেছে। গারোদের নিজস্ব ভাষা আছে, কিন্তু বর্ণমালা নেই। ইংরিজি হরফে ওরা নিজেদের ভাষা লেখে। যেমন ধানকে গারো ভাষায় বলে মীরং, ওরা লেখে— Meerang, চালকে বলে মী, লেখে Mee। মিশনারীরা এই হরফের প্রচলন করেছেন। করে অবশ্য ভালই হয়েছে। অন্য ভাষাভাষীদের গারো ভাষা শেখা অতি সহজসাধ্য হয়েছে।

সুপ্রিয় সহজেই ওদের ভাষা শিখে ফেলেছে। অবশ্য উচ্চারণ নাকি ঠিক

হয় না, শেলী বলে গেছে। পরীক্ষার পরেই শেলী ফিরে আসবে। তারিখটা সুপ্রিয়কে বলে গেছে। সুপ্রিয় তুরা ডাকবাংলোয় সেদিন অপেক্ষা করবে ওর জন্য।

শুধু ভাষা নয়, ওদের সামাজিক আচার আচরণ সম্পর্কে আরও অনেক কথা জেনেছে সুপ্রিয়। জেনেছে বহুবিবাহ প্রথা এখনও চালু আছে গারোদের মধ্যে। অনেক ক্ষেত্রেই শালীরা জামাইবাবুকে বিয়ে করে। ওদের সমাজ অবৈধ সন্তানকে অস্বীকার করে না। কুমারী মেয়েরা মা হলেও সমাজে পতিতা হয় না। তাদের বিয়ে হয় স্বাভাবিক ভাবে। এমন কি অন্য পুরুষের ঔরসজাত সন্তান প্রতিপালিত হয় সস্নেহে।

অন্য দেশী কিংবা অন্য জাতের মানুষকে বিয়ে করতে সমাজ উৎসাহিত করে থাকে মেয়েদের। ওদের ধারণা অসবর্ণ বিবাহে ওদের সমাজ উন্নত হবে। পর্দানশীন নয় ওরা। পুরুষের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে মেলামেশা করে মেয়েরা। ক্ষেত-খামারে একসঙ্গে কাজ করে। মনের মানুষ খুঁজে পেলে তাকে ভালোবাসে।

গ্রামের মানুষ ভালোবাসে সুপ্রিয়কে। তিনমাসের মধ্যে সে দু'টি নির্মীয়মাণ রাস্তা নির্মাণ শেষ করেছে। তাই গাঁয়ের মানুষ তাকে অভিনন্দন জানিয়েছে। তারা স্কুলের বার্ষিক উৎসবে তাকে সভাপতি পদে বরণ করেছে। সুপ্রিয়র ডাকে তারা সর্বদাই সাড়া দেয়। তারাও বিপদে-আপদে সব সময় সুপ্রিয়কে কাছে পায়। চিতা বা ভালুকের উৎপাত হলে গারো শিকারীদের সঙ্গে সে-ও বন্দুক হাতে বেরিয়ে পড়ে। এন সি. সি-র বিদ্যাটা বেশ কাজে লাগছে।

চিতা ও ভালুক ছাড়া মাঝে মাঝে ময়াল সাপের দেখা পাওয়া যায়। অবশ্য ওরা ময়াল মারতে তাকে তলব করে না, নিজেরাই তার ভবলীলা ঘুচিয়ে দেয়। একদিন সুপ্রিয় খবর পেল একটা ময়াল মারা হয়েছে। তাড়াতাড়ি ছুটে এল দেখতে। দেখে হাত বিশেক লম্বা ও হাত দুয়েক মোটা একটা ময়াল মেরেছে ওরা। কয়েকজন দা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সুপ্রিয়র দেখা শেষ হতেই ওরা দা দিয়ে সাপটাকে টুকরো টুকরো করতে থাকল। এ দৃশ্যটা দেখতে ভাল লাগল না ওর। সে ভিড় ঠেলে সরিয়ে এল। সঙ্গে ছিল একজন খালাসী। তাকে সুপ্রিয় জিজ্ঞেস করে, "মরা সাপটাকে ওরা অমন টুকরো টুকরো করছে কেন?"

"কেন আবার? মাংস ভাগ করছে।"

"তোমরা কি সাপ খাও নাকি?

"হ্যাঁ, খাব না কেন? আর ময়ালের মাংস তো খুবই ভাল।"

আর প্রশ্ন করে না। নীরবে বাড়ি ফিরে আসে সুপ্রিয়। নতুন এক দুর্ভাবনা হল তার। শেলীও তো ওদেরই একজন, তবে কি শেলীও সাপ খায়?

না, না। শেলী কেন সাপ খাবে? ওরা শিক্ষার আলো পেয়েছে তিন পুরুষ আগে। শেলীরা নিশ্চয়ই ওদের মতো নয়। শেলী শিক্ষিতা, শেলী স্নেহ-শীলা। শেলী সুপ্রিয়র মানস-প্রিয়া।

অবশেষে গোয়ালপাড়ার বাস আসে। হাসতে হাসতে শেলী বাস থেকে নামে। নেমেই ছুটে আসে সুপ্রিয়র কাছে। বলে, "কেমন আছ?"

"ভাল।" সুপ্রিয় বলে।

"চিঠি সময়মত পেয়েছিলে?"

"হ্যাঁ।"

"আমার যা ভয় হচ্ছিল।"

"কেন?"

"যদি চিঠি না পাও। বাড়িতেও চিঠি লিখি নি। তুমি না এলে কেমন করে বাড়ি যাব?"

"আমি আসব না?" সুপ্রিয় একটু হাসে। বলে, "যাক্ সে ভয় তো এখন কাটল! এবারে বল পরীক্ষা কেমন হল?"

"ভাল না।"

"কেন?"

"তোমার জন্য

"আমার জন্য?" অবাক হয় সুপ্রিয়।

"হ্যাঁ, তোমার জন্যই তো। মন দিয়ে পড়তেই পারি নি। পড়তে বসে কেবলই অন্যমনস্ক হয়ে যেতাম, তোমার কথা ভাবতাম।"

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে সুপ্রিয়, "মালপত্র কোথায়?"

শেলী দেখিয়ে দেয়।

সুপ্রিয় বলে, "এবারে চল ডাকবাংলোয় যাই।"

একজন কুলির পিঠে মালপত্র চাপিয়ে ওরা ডাকবাংলোয় এসে ওঠে। অফিসের মারফৎ তিনদিনের জন্য পুরো ডাকবাংলো ভাড়া করেছে। এখানেই ওদের প্রথম পরিচয়।

শেলী কিন্তু এসেই গিন্নিপনা শুরু করে। চৌকিদারকে দিয়ে বাসন-পত্র আনিয়ে, বাজার করিয়ে রান্নার তোড়জোড় করে। প্রতিবাদ করেছিল সুপ্রিয়। শেলী সে কথায় কান না দিয়ে নিজের কাজ করে যায়। সুপ্রিয় একবার রান্না-ঘর আর একবার বড় ঘর করতে থাকে।

খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকতে রাত দশটা বেজে যায়। সুপ্রিয় এসে বসে নিজের খাটে। শেলী পাশের ঘরে শোবে। হাতের কাজ শেষ করে এক গ্লাস জল নিয়ে সুপ্রিয়র ঘরে আসে।

সুপ্রিয় বলে, "বস।"

শেলী বলে, "না। এখন শুয়ে পড়ি। বড্ড ক্লান্ত লাগছে।"

"লাগবেই তো। সারাদিন বাস চড়ে এসে কি দরকার ছিল এই হাঙ্গামার।

"ছিল বৈ কি! তোমাকে রান্না করে খাওয়াবার সাধ যে আমার অনেক দিনের।"

চুপ করে থাকে সুপ্রিয।

একটু বাদে শেলী বলে, "আমি তবে যাই!"

"কোথায়?"

"কেন পাশের ঘরে।"

"না, এখানে—।"

"না, না, তা হয় না।"

"কেন?"

"শেলী কোনো উত্তর দেয় না।"

সুপ্রিয় হাত বাড়ায়। কিন্তু শেলী ধরা দেয় না। সে পায়ে-পায়ে পেছিয়ে যায়। দু'ঘরের দোরগড়ায় গিয়ে দাঁড়ায়। কোনো মতে বলে "গুড নাইট।" তারপর পাশের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়।

সুপ্রিয় কিছুক্ষণ বসে থাকে। বসে বসে ভাবে। ভাবতে ভাবতে উঠে আসে বারান্দায়।

সময় বয়ে যায়। কিন্তু আজ আর আসে না সুপ্রিয়র সুপ্রিয়া। আশাহত সুপ্রিয় বাইরের দিকে তাকায়। স্তব্ধ আঁধার রাত্রি জেগে আছে বাইরে। কিন্তু প্রেমের দীপশিখা নিয়ে আজ আর শেলী আসে না তার কাছে। কেন?

সুপ্রিয় ঘরে আসে। আলো নিভিয়ে দেয়। অন্ধকারে শুয়ে পড়ে। নানা কথা ভেবে চলে। নিজের কথা, শেলীর কথা, সমাজের কথা।

ঘুম আসে না কিছুতেই। অশান্ত সুপ্রিয় অতৃপ্ত যৌবনের জ্বালায় ছটফট করে। রাতের আঁধার বার বার বলে—তুমি কি জান না বসুন্ধরা বীরভোগ্যা। তুমি না যুবক! তোমার প্রেয়সী পাশের ঘরে, আর তুমি এখানে একা।

সুপ্রিয়র মন বলে—কিন্তু সমাজ যে এখনও আমাদের স্বীকার করে না। তাই তো শেলী আমার আহ্বানে সাড়া দিল না।

মানুষকে নিয়েই তো সমাজ। তুমি না মানুষ!

কিন্তু শেলী যে বড়ই সংযমী।

শেলী ওদের স্বভাবধর্মে সংযমী। সে যে নারী। তোমাকে যেতে হবে এগিয়ে, সংযমের বাঁধ ভেঙে দিতে।

কেমন করে?

বন্ধ দরজায় আঘাত কর। নিশ্চয়ই শেলী সাড়া দেবে তোমার ডাকে।

আর শুয়ে থাকতে পারে না সুপ্রিয়। খাট থেকে নেমে এগিয়ে যায় বন্ধ দরজার কাছে। আস্তে আস্তে করাঘাত করে।

কোন সাড়া নেই। আকুল আবেগে সুপ্রিয় ডাকে, "শেলী! শেলী!—দরজা খোল।"

নীরব অপর পক্ষ। কেউ দরজা খোলে না।

আশাহত সুপ্রিয় টলতে টলতে বিছানায় এসে শুয়ে পড়ে। প্রবল উত্তেজনায় তার সর্বশরীর কাঁপছে। আগুন বেরুচ্ছে সারা শরীর দিয়ে। শেলীর সান্নিধ্য তার এই জ্বালার উপশম করতে পারে। কিন্তু কোথায় শেলী?

কতক্ষণ কেটে গেছে খেয়াল নেই। চমকে ওঠে সুপ্রিয়। উষ্ণ কপালে একটা স্নেহঘন শীতল স্পর্শ।

"কে?" দু'হাতে জড়িয়ে ধরে সেই কোমল দু'টি করপল্লব।

"কেন ডেকেছিলে বল?" মধুক্ষরা কণ্ঠে শেলী শুধায়।

আনন্দ-আবেশে বিহ্বল সুপ্রিয় কোনো জবাব দিতে পারে না। পাশ ফিরে শেলীর কোলে মুখ লুকায়।"

শেলী মাথা নত করে। তার অধরের কোমল স্পর্শে সঞ্জীবিত হয় সুপ্রিয়। দু'জনে দু'জনার জীবন-সুধা পান করে। তারপরে একসময় চোখ মেলে তাকায়। অন্ধকার বড় গাঢ়। প্রিয়ার শ্রীমুখ দেখতে পায় না, শুধু তার মধুর পরশ অনুভব করে।

সুপ্রিয় মানুষ। সুপ্রিয় যুবক। অনুভবে মন ভরে না তার। প্রেয়সীকে পেতে চায় একান্ত আপন করে। সেই দাবিতেই শেলীকে কাছে টানে সে।

কাছে আরও কাছে।

বাধা দেয না শেলী। সেও তো যুবতী। তাবও সংযমের সীমা আছে।

সেই সীমার বাইরে দু'টি প্রাণ। দু'জনেব মাঝে হারিয়ে যায দু'জনে। নিস্তব্ধ রাত্রিব সীমাহীন অন্ধকার কেবল ওদের সেই সংলাপের সঙ্গী, সঙ্গীতেব সঙ্গত আর সংঘাতেব সংজ্ঞা।

* * *

তিনটে দিন যেন তিন প্রহব। এই তিন প্রহরেব স্মৃতি সুপ্রিযর মনের মণিকোঠায অক্ষয হযে থাকবে চিবকাল।

তিন দিন পাব শেলীকে নিযে সুপ্রিয ফিবছে রংগ্রামে একটা দিন এখানে থেকে দূব সম্পর্কেব এক আত্মীযেব সঙ্গে শেলী চলে গেছে বাড়ি। যাবাব সময জিজ্ঞেস কবেছে, "কবে দেখা হবে ?"

একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীযাব ইন্সপেকশানে আসবে সামনের মাসে। তিনি চলে গেলেই যাবো তোমাদেব বাড়ি। কিন্তু এত ঘন-ঘন গেলে তোমাব বাবা-মা কিছু মনে করবেন না তো ?"

"কি আবাব মনে কববেন ? তাঁরা সব জানেন।"

"জানেন ?"

"না জানলে এ ক'দিন একসঙ্গে থাকলাম কেমন করে ?"

"তাই বল। আমিও ভাবছিলাম তোমার বাবা তুবা গেলেন না কেন তোমাকে আনতে। কিন্তু কি বলেছ ওঁকে ?"

"যা সত্যি তাই বলেছি।"

"কি সত্যি ?"

"যাব চেযে বড সত্য মানুষের জীবনে নেই, হতে পাবে না।"

সুপ্রিয চুপ করে থেকেছে।

শেলী আবাব বলেছে, "কিন্তু ইন্সপেকশানেব আগে কি একটা দিনের জন্যও যেতে পার না ?"

"চেষ্টা করব।"

"তাই করো। এতদিন তোমাকে না দেখে আমি থাকতে পারব না।

তোমার কি ? কাজের মানুষ। তোমার অফিস আছে, বাইরের জগৎ আছে। আমাকে ভুলে থাকার অনেক উপকরণ আছে তোমার দৈনন্দিন জীবনে। কিন্তু আমার ? আমার তো সে-সব কিছুই নেই। আমি কি নিয়ে থাকব।" শেলীর চোখে জল এসে গিয়েছিল আসন্ন বিরহ বেদনায়।

সুপ্রিয় শেলীকে প্রবোধ দিয়েছে, "বই পড়বে আর এই ক'দিনের স্মৃতির সমুদ্রে অবগাহন করবে। স্মৃতির মাঝেই তো মানুষ জীবনের অর্থ খুঁজে পায়।"

"পাশ করলে কি পড়ব বল তো ?" চোখ মুছে শেলী জিজ্ঞেস করেছিল।

"তোমার কি ইচ্ছে ?"

"ডাক্তারী পড়ার। তুমি ইঞ্জিনীয়ার আর আমি হব ডাক্তার।" শেলীর চোখ দু'টি চকচক করছিল, "আমরা দু'জনে এই দরিদ্র গারো পাহাড়ের সেবা করব।"

"বেশ তাই হবে।" সুপ্রিয় সম্মতি জানিয়েছে।

"তাহলে যে আমাকে শিলং যেতে হবে।"

"বেশ তো যাবে।"

"কিন্তু তুমি যে এখানে থাকবে ?"

সুপ্রিয় ওর আপত্তিটা বুঝতে পেরে সান্ত্বনার স্বরে বলেছে, "ছুটিতে ছুটিতে তো আসবেই, তখন দেখা হবে। তাছাড়া আমিও শিলং যাবো মাঝে মাঝে।"

"তার চেয়ে একটা কাজ কর না।" শেলী বলেছে, "তুমি গৌহাটি বদলি হয়ে চল না, দু'জনে বেশ এক জায়গায় থাকব।"

কি বলবে সুপ্রিয়। অবুঝ মেয়ে, কেমন করে তাকে বোঝাবে, কর্তৃপক্ষ এমন প্রস্তাব কিছুতেই মেনে নেবে না। তাই মিথ্যা স্তোকে ভোলাতে চেয়েছে শেলীকে। বলেছে, "তুমি ভর্তি হও, আমি চেষ্টা করব বদলি হতে।"

খুশি হয়ে বিদায় নিয়েছে শেলী। তবে বারবার অনুরোধ করে গেছে সুপ্রিয়কে যেতে।

কিন্তু সুপ্রিয় যেতে পারে নি। ইন্সপেকশানের কাজে এতই জড়িয়ে পড়েছিল যে অনেক চেষ্টা ক'রেও দুটো দিনের সময় করতে পারে নি।

অভিমানী শেলী চিঠি লিখেছিল—

'তোমাকে ভালোবাসার মধ্যে তো আমার কোন ফাঁকি নেই। তাহলে আমি কেন এত কষ্ট সইছি ? তোমার প্রীতির মধুর স্মৃতি যে কেবল আমাকে দুঃখই দিচ্ছে। মনে হচ্ছে, সুখ আমার জন্য নয়। দুঃখই আমার

আজীবনের সঙ্গী হয়ে রইবে। তাই বার বার ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি, তোমার অবহেলায় যেন আমার প্রেম কলুষিত না হয়। আর তোমাকে অনুরোধ করি—অসত্যের কাছে আত্মসমর্পণ করো না। বিবেককে প্রাধান্য দিও।… …..’

তবু সুপ্রিয় পারে নি যেতে। সে শেলীকে চিঠি দিয়েছে। শেলী শান্ত হয়েছে। উত্তর দিযেছে, তবে সেই সঙ্গে জিজ্ঞেস করেছে, ‘কবে আসবে? তোমাকে বড্ড দেখতে ইচ্ছে করছে।’

ইচ্ছে কি সুপ্রিয়রই কম। কিন্তু কি করবে? একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার ইন্সপেকশানের তারিখ পিছিযেছেন। নতুন কাজের ফর্দ পাঠিয়েছেন। কাজের ভিড়ে সুপ্রিয় সে ইচ্ছাকে দমন করতে বাধ্য হয়।

তারপর একদিন সুখবর আসে—শেলী প্রথম বিভাগে পাশ করেছে। আনন্দ-বিহ্বল সুপ্রিয় তাকে অভিনন্দন জানায় কিন্তু নিজে যেতে পারে না। ভাবে, সে না গেলেও, এবারে দেখা হবে। শেলী যাবে ডাক্তারী পড়তে।

দিন কেটে যায়। শেলী আসে না। তবে কি শেলী আর পড়াশুনা করবে না, বাড়িতে বসে থাকবে?

যে ভাবেই প্রচারিত হয়ে থাক, কথাটা কিন্তু রংগ্রামে আর অজানা নেই। স্থানীয়রা খুবই খুশি। বাঙালী ডিপটি সাহেব গারো মেয়েকে বিয়ে করবেন।

কিন্তু খুশি নয সমতলবাসীরা। খুশি নন ডাক্তার সিং ও মিস্টার শ্রীবাস্তব। একদিন কথায় কথায় সিং বলেন, “ইউ আর এ ব্যাচেলর. ইউ মাস্ট এনজয। বাট ডোণ্ট বি সীরিযাস। ইউ মাস্ট নট ম্যারী দ্যাট গারো গার্ল।”

কথাটা ভাল লাগেনি সুপ্রিযর। কিন্তু এমনই অদৃষ্ট, ওদের নিযেই আজ রওনা হতে হল বংরেনগিরি—শেলীর গ্রামে।

খবরটা শুনতে পেযেছিল কা বিকেলে। নিযে এসেছে সেই খালাসী, যাকে দিযে সে শেলীকে চিঠি পাঠিযেছিল। লোক বলেছে, একপাল বুনো হাতি এসেছে পাশের গ্রামেব বনে। একদিন শেলীদেব গ্রামে ঢুকেও কযেকখানা ঘর ভেঙে রেখে গেছে। মানুষ এখনও মাবতে পারে নি। তবে যে কোনোদিন যে কোনো মুহূর্তে ওরা রংরেনগিরিকে শ্মশানে পরিণত করতে পারে।

“না, না।” সুপ্রিয আঁতকে উঠেছে অজানা আশঙ্কায়। “আমি কালই বন্দুক নিয়ে যাচ্ছি। তুই সঙ্গে যাবি।”

ডাক্তার ও শ্রীবাস্তবকে খবর দিয়েছে সুপ্রিয। ওঁরাও রাজী হযেছেন যেতে। হাতি শিকারের লোভ। রাতের মধ্যেই প্রস্তুতি পর্ব শেষ হয়েছে।

সকালে খাওয়া-দাওয়া করে বন্দুক কাঁধে ওরা রওনা হয়েছে। পাহাড়ী পথ। সুপ্রিয়র ও শ্রীবাস্তবের চেনা পথ। তাছাড়া ওদের সঙ্গে রয়েছে সেই খালাসী ও কয়েকজন মালবাহক। বন ক্রমেই ঘন হচ্ছে। চড়াই বাড়ছে। মাঝে মাঝে ক্লান্ত হয়ে পথের ধারে বিশ্রাম নিচ্ছে। ফ্লাস্ক থেকে চা ঢেলে গলা ভিজিয়ে নিচ্ছে। হ্যাভার-স্যাক থেকে বিস্কুট বার করে খাচ্ছে।

আবার চলা শুরু করছে। কোথাও একঝাঁক বনমোরগের দেখা মেলে। আবার কোথাও দেখতে পায় দূরে একপাল হরিণ দাঁড়িয়ে আছে। শিকারীরা চলা বন্ধ করে ওদের দেখে। ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে। ওরাও কিছুক্ষণ ধরে ওদের দেখে, তারপরে ছুটে পালায়।

ঘন বনেও দেখা হয় মানুষের সঙ্গে। গারো পাহাড়ের পরিশ্রমী মানুষ। পিঠে তাদের বোঝা। শহরের বাজারে বা গ্রামের হাটে যাচ্ছে। মাইলের পর মাইল পাহাড়ী পথ চলে ওরা হাটে পৌঁছবে। পরদিন সকাল থেকে শুরু হবে বেচা-কেনা, চলবে সারাদিন। শ্রান্তি নেই, ক্লান্তি নেই, বিরক্তি নেই, আছে শুধু অফুরন্ত হাসি আর অনাবিল আনন্দ। অদ্ভুত এই পাহাড়ী মানুষগুলো।

সন্ধ্যার একটু আগে ওরা পৌঁছায় রংরেনগিরি। খবর পেয়ে ছুটে আসেন উইলিয়ম। পরম সমাদরে ওদের বাড়িতে নিয়ে আসেন। সহজ স্বাভাবিক ভাবেই তিনি কথা বলেন সুপ্রিয়র সঙ্গে। সুপ্রিয়র কিন্তু সহজ হতে সঙ্কোচ হচ্ছে। চেষ্টা করছে কিন্তু একটা অদৃশ্য লজ্জা বার বার বিব্রত করে তুলছে তাকে। শেলী তো সবই ওর বাবাকে বলেছে।

শেলী আসে কিছুক্ষণ পরে। আসে চা ও খাবার নিয়ে। সিং ও শ্রীবাস্তবকে দিয়ে সবার শেষে আসে সুপ্রিয়র কাছে। জিজ্ঞেস করে, "ভাল আছ?"

"হ্যাঁ।" সুপ্রিয় বলে, "তুমি?"

"ভাল না।"

"কেন?"

"শরীরটা ভাল নেই।"

"কি হয়েছে?"

প্রশ্নের উত্তর দেয় না শেলী। একটু বাদে বলে, "ভাগ্যিস বুনো হাতি এসেছে, নইলে তো আর তুমি আসতে না।"

সুপ্রিয় চুপ করে থাকে।

আর কিছু বলে না শেলী। সে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। সিং ও

শ্রীবাস্তবের দিকে নজর পড়ে সুপ্রিয়র, তাঁরা তার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসছেন।

খাওয়ার পাট চুকতে রাত দশটা বেজে গেল। কাল সকালেই বনপথে বেরোতে হবে। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সবই হয়ে গেছে। চল্লিশজন গারো যুবক ঢাল, ঢোলক ও বল্লম নিয়ে যাচ্ছে তাদের সঙ্গে। উইলিয়মও বন্দুক নিয়ে ওদের সঙ্গী হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ওরা তাঁকে নিষেধ করেছেন। দুর্গম পথ। উইলিয়ম হার্টের রোগী। তাছাড়া তিনটে বন্দুক তো রয়েছেই।

গ্রামের কয়েক মাইল দূরেই সেই গভীর পাহাড়ী বন। যে ভাবেই হোক, বুনো হাতির দলকে তাড়াতে হবে। নইলে যে কোনাদিন যে কোনো সময়ে তারা শ্মশানে পরিণত করবে এই বনময় পাহাড়ী গ্রামখানি। এই গ্রামেরই মেয়ে সুপ্রিয়র মানসী।

বাইরের ঘরে সিং ও শ্রীবাস্তবের শোবার ব্যবস্থা হয়েছে। সুপ্রিয়র জন্য ভেতরের ঘর। খাওয়ার পরে কিছুক্ষণ ওদের সঙ্গে গল্প করে শেলীর ছোটভাই জনের সঙ্গে সুপ্রিয় নির্দিষ্ট ঘরে আসে। জন চলে গেলে পোশাক পাল্টায় সুপ্রিয়। মনে মনে ভেবে চলে আগামী দিনের কথা। জীবনে কখনও বুনো হাতি দেখে নি সে। শুনেছে তারা ভয়ঙ্কর। তারা যখন তেড়ে আসে, সামনে যা কিছু পড়ে, সব ধ্বংস হয়ে যায়। সেই হাতির সম্মুখীন হতে চলেছে সুপ্রিয। কিন্তু না হয়েই বা উপায় কি? এই গ্রামের নিরাপত্তা নির্ভর করছে তাদের এ অভিযানের উপর। গ্রামের নিরাপত্তার সূত্র ধরে শেলীর নিরাপত্তাই সুপ্রিয়র ভাবনা।

শেলীর কাছেই শোনা ঘটনাটি মনে পড়ে তার—বুনো হাতির ভয়ঙ্কর আক্রোশের কথা। কয়েক বছর আগে পূর্ত-বিভাগের জনৈক ওভারসিয়ার সাইকেল করে সদরে ফিরছিলেন হঠাৎ দূরে একদল বুনো হাতি দেখতে পেলেন। সাইকেলটা একটা গাছের গোড়ায় রেখে, তাড়াতাড়ি তিনি গাছে উঠে পড়লেন। একটু রাতে হাতীরা এল। এসেই গাছটাকে চারদিক থেকে ধাক্কা দিতে থাকল। চারদিক থেকে ধাক্কা দেবার ফলে গাছটা পড়ল না, কিন্তু ভীষণ নড়তে লাগল। ভদ্রলোক কাপড় খুলে তাই দিয়ে নিজেকে গাছের সঙ্গে বেঁধে কোনোরকমে ঝুলে রইলেন। গাছটাকে না ফেলতে পেরে কয়েকটা হাতি পাশের নালা থেকে শুঁড়ে করে জল এনে গাছের গোড়ায় দিতে থাকল, আর কয়েকটা হাতি তেমনি গাছটাকে ধাক্কাতে থাকল চারদিক থেকে। গোড়া নরম হলেও গাছটা মাটিতে পড়ল না। বহুক্ষণ চেষ্টার পরে বিফল

হাতিয়া সাইকেলটা ভেঙে রেখে চলে গেল। পরদিন একদল কাঠুরে ভদ্র-লোককে উদ্ধার করে নিয়ে আসে গ্রামে। অদৃষ্ট নেহাত ভাল বলেই তিনি সেবারে বেঁচে গেলেন।

শেলী ঘরে আসে। সুপ্রিয়র চিন্তায় ছেদ পড়ে। শেলীর দিকে চোখ পড়ে, চোখাচোখি হয়। হ্যারিকেনের শিখাটা দপ করে কেঁপে ওঠে, চমক ভাঙে ওদেরও। শেলী বলে, অনেক রাত হয়েছে, শুয়ে পড়।"

"তোমাদের খাওয়া হয়েছে কি?"

"হ্যাঁ।"

"সুপ্রিয় হঠাৎ প্রশ্ন করে, "তোমার বাবাকে সব বলেছ?"

"হ্যাঁ।"

"তিনি কি বললেন?"

"কি বলবেন আবার। তোমাকে কি তাঁর অপছন্দ হতে পারে? তাছাড়া আমাদের সমাজে বিয়ের ব্যাপারে মেয়ের মতই সমাজের মত। কিন্তু তোমার মা কি অনুমতি দেবেন।"

"চেষ্টা করতে হবে। সে কথা এখন না ভাবলেও চলবে। এখন তো শিলং গিয়ে তুমি ডাক্তারীতে ভর্তি হয়ে যাও।"

শেলী চুপ করে থাকে।

সুপ্রিয়র যেন মনে হয়, শেলী তাঁর প্রস্তাব অনুমোদন করছে না। সে উত্তেজিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, "তুমি কি ডাক্তারী পড়বে না?"

"পড়ব"। শান্ত স্বরে শেলী জবাব দেয়, "দরখাস্ত পাঠিয়ে দিয়েছি, আগামী মাসে এ্যাড্‌মিশন টেস্ট।"

"যাবার পথে আমার ওখানে একদিন থাকবে তো?"

শেলী হাসে, "একদিন কেন? তুমি চাইলে সারাজীবন থাকতে পারি। আমি যে সেই চাওয়ার দিন গুনছি সু।"

"চাই বৈকি শেলী, আমার সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে আমি তো তাই চাই। কিন্তু তার আগে চাই, তুমি ডাক্তারী পাশ করে নাও।"

"না, না," শেলী যেন আঁতকে ওঠে, "আমি অতদিন তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না। আর তার দরকারই বা কি? কত মেয়ে তো বিয়ের পরে পড়াশুনা করে।"

সুপ্রিয় নীরব থাকে।

"কি কথা বলছ না যে?" শেলী তাগিদ দেয়। "রংগ্রামে ফিরে গিয়ে

মাকে চিঠি দাও। সব কথা জানিয়ে তার অনুমতি চাও। সত্যি বলছি, তা নইলে আমি ডাক্তারী পড়ব না।"

"বেশ।" সুপ্রিয় বলে, "সব কথাই লিখব মাকে। কিন্তু মা কি সহজে রাজী হবেন ? বুঝতে পারছি না।"

"আমি পারছি। তিনি রাজী হবেন না। কারণ সেটাই স্বাভাবিক।"

"তাহলে তাঁর আশীর্বাদ ছাড়াই আমাদের মিলিত-জীবন শুরু হবে।"

"কেন তুমি এই ত্যাগ করছ ?"

"কারণ তোমাকে পাচ্ছি।"

"আমি কি তোমার কাছে তোমার ধর্ম, তোমার সমাজ, তোমার মা-র চেয়েও বেশী ?"

"তা আমি বলি নি। তবে তোমাকে বিয়ে করে আমি কোনো অধর্ম বা অসামাজিক আচরণ করছি না। মাকে পরিত্যাগ করারও কোনো বাসনা নেই আমার। আমরা মানুষ, আমাদের কাছে 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।' প্রেম নিষ্কণ্টক নয়, কিন্তু নির্দোষ।"

শেলী চুপ করে থাকে। সুপ্রিয় কি যেন ভাবে। একটু বাদে শেলী বলে, "একটা অনুরোধ করব, রাখবে ?"

"অসম্ভব না হলে নিশ্চয়ই রাখব, বল কি ?"

"আমি তোমার সঙ্গে যাব।"

"কোথায় ?"

"হাতি শিকারে।

"সে কেমন করে সম্ভব শেলী ! দুর্গম পথ। তুমি পারবে কেন আমাদের সঙ্গে পথ চলতে।"

"আমি পাহাড়ী মেয়ে। আমা কোনো কষ্ট হবে না, তোমাদের কোনো অসুবিধাও করব না। তুমি আমাকে সঙ্গে নাও। এই বিপদে তোমাকে পাঠিয়ে আমি কিছুতেই নিশ্চিন্ত থাকতে পারব না।"

"তোমার কোনো ভয় নেই শেলী। আমি নিরাপদে তোমার কাছে ফিরে আসব। আমার সঙ্গী হয়ে তুমি আমার বিপদ বাড়িও না।"

এর পরে আব কি করতে পারে শেলী। সে একটুকাল চুপ করে থেকে মৃদুস্বরে বলে, "আমি তাহলে এখন যাই।"

"না।" সুপ্রিয় উঠে দাঁড়ায়। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে শেলীর একখানি হাত ধরে। তাকে কাছে টেনে নেয়। শেলী সুপ্রিয়র বুকে মুখ লুকোয়।

কিছুক্ষণ নীরবে কেটে যায়। তারপরে শেলী সুপ্রিয়র কানের কাছে মুখ এনে বলে, "মা বোধহয় টের পেয়েছে যে আমি এখানে এসেছি।"

"মা তো সবই জানেন।"

"হ্যাঁ।"

"তাহলে এতো ভাবছ কেন?"

"তবু লজ্জা করছে।"

"লজ্জার কি আছে, এই যে জীবনের নিয়ম, যৌবনের ধর্ম।"

শেলী চুপ করে থাকে। কয়েকটা মিনিট নীরবে কেটে যায়। তারপরে ধীরস্বরে জিজ্ঞেস করে, "কিন্তু কতক্ষণ আমি এখানে থাকব?"

"যতক্ষণ না উষার আলো এসে সুপ্ত পৃথিবীর ঘুম ভাঙায়।"

"তার মানে……"

"সারা রাত।" শেলী শেষ করার আগেই সুপ্রিয় বলে ওঠে।

দুজনে আবার নীরব। কেটে যায় কিছুক্ষণ। এক সময় শেলী বলে, "তাহলে আমাকে একবারটি ছেড়ে দাও।"

"কেন!" সুপ্রিয় যেন ক্ষেপে ওঠে।

শেলী শান্তস্বরে বলে, "দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আসি।"

সুপ্রিয় শেলীকে ছেড়ে দেয়।

* * *

সভা শুরু হয়ে গেছে। সভা বসেছে সুপ্রিয়র অফিসে। টেবিল, আলমারী ও অন্যান্য আসবাব সরিয়ে সারা ঘর জুড়ে চেয়ার ও বেঞ্চি পাতা হয়েছে। অতিথিরা বেশ জাঁকিয়ে বসেছেন। সভা ডেকেছে সুপ্রিয়।

নিমন্ত্রিতরা প্রায় সবাই এসেছেন। এসেছেন সুপ্রিয়র সাবডিভিশানের অন্তর্গত গ্রামসমূহের নকমা, লস্কর ও মৌজাদারগণ।

লস্কর হল কয়েকখানি গ্রামের প্রতিনিধি। তারা নকমাদের ভোটে নির্বাচিত। বে-সরকারী প্রতিনিধি হলেও ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল এদের স্বীকার করেন। গ্রামের ছোটখাটো বিবাদের এরাই নিষ্পত্তি করে দেন। এরা গ্রামীণ আদালতের বিচারক। পঞ্চান্নটি গ্রামীণ আদালত আছে গারো পাহাড়ে। এই সব আদালতে সাধারণত দেওয়ানী ও ছোট ফৌজদারী মামলার নিষ্পত্তি

হয়। লস্করর। জেল দিতে পারেন না, কিন্তু পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করতে পারেন। রাজস্ব সংগ্রহ ও যাবতীয় সরকারী কাজে এরা মৌজাদারদের সাহায্য করেন।

মৌজাদাররা সরকারী কর্মচারী। এরা ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল থেকে নিয়মিত বেতন পান। রাজস্ব ও বনকর আদায় করেন। এই দুটি খাতে ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিলের শতকরা প্রায় ষাটভাগ আয় হয়।

ডেপুটি কমিশনার হচ্ছেন জেলা-পরিষদের সভাপতি। গারো পাহাড়ে প্রথম জেলা-পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫২ সালে। বতমান জেলা পরিষদ ১৯৬৬ সালে নির্বাচিত হয়েছে। আগামী মাসে তুরাতে পরিষদের অধিবেশন বসবে। ডেপুটি কমিশনার সুপ্রিয়কে বিশেষ অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। সুপ্রিয় তাই আজকের এই সভার আয়োজন করেছে। গারো পাহাড়ের দুঃখ-দুর্দশার একটি বাস্তব চিত্র সে এই অধিবেশনে পেশ করতে চায়।

কেবল নকমা, লস্কর ও মৌজাদারদের নয়, এ অঞ্চলের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকেও সুপ্রিয় নেমন্তন্ন করেছিল। তাঁরাও এসেছেন। এসেছেন শেলীর বাবা। শেলীর সঙ্গে পরামর্শ করেই সুপ্রিয এই সভার আয়োজন করেছে। পরামর্শটা হয়েছে সেবারে, সেই হাতি শিকার উপলক্ষ্যে সুপ্রিয় যখন শেলীদের বাড়িতে গিয়েছিল। নামেই হাতি শিকার। হাতির খোঁজে ওরা তিন দিন বনে বনে ঘুরে বেড়িয়েছে। হাতির দেখা মেলে নি। তবে প্রমাণ মিলেছে, বুনো হাতির দল গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে। সেবারে ওদের অভিযান অবশ্য একেবারে বিফল হয় নি। দুটি লেপার্ড মারতে পেরেছিল। মৃত চিতা বাঘ-দুটিকে নিয়ে দুপুরে ওরা রংরেনগিরিতে ফিরে এসেছিল। শেলী ছুটে এসে-ছিল বাড়ির বাইরে। সবার সঙ্গে স্বাগত জানিয়েছিল সুপ্রিয়কে।

সুপ্রিয়র আশা ছিল আজ শেলী আসবে। এক দিনের সম্মেলন। কিন্তু প্রতিনিধিরা অনেকেই দু-তিন দিনের পথ পাড়ি দিয়ে এখানে এসেছেন। স্বভাবতঃই আজকের রাতটা, কেউ কেউ হয়তো বা কালকের দিনটাও বিশ্রাম করবেন এখানে। তাঁরা সবাই সুপ্রিয়র অতিথি। তাঁদের থাকা-খাওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা তাকেই করতে হয়েছে। তাই শেলীকে সে আসতে বলেছিল। কিন্তু শেলী আসে নি। কথায় কথায় কারণটা সে জিজ্ঞেস করেছিল শেলীর বাবাকে। তিনি জবাব দিয়েছেন, "প্রথমে তো বলেছিল, আসবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এলো না। ওর মা বললে, শেলীর শরীরটা নাকি ভাল নেই।"

"কি হয়েছে ?" সুপ্রিয় আঁতকে উঠেছে।

"না, না, কঠিন অসুখ-বিসুখ কিছু নয়। চলা-ফেরা করছে ঠিক মতোই, তবু ওর মা বললে, শরীরটা ভাল নেই, আসতে পারবে না। আমি আর ও নিয়ে কোনো প্রশ্ন করি নি।" একবার থেমেছেন উইলিয়ম। তারপরেই কথাটা মনে পড়েছে তাঁর "ও ঠিক কথা, শেলীর মা জিজ্ঞেস করেছে, আপনার নাকি কলকাতায় কি চিঠি লেখার কথা আছে, লিখেছেন কি?"

বিস্মিত সুপ্রিয় কোনোমতে জবাব দিয়েছে, "হ্যাঁ।" তারপরে ভেবেছে—শেলী এত সাধারণ! এখুনি মাকে বলার কি দরকার পড়েছিল তার। কিন্তু পাছে উইলিয়ামের কাছে সে মনোভাব প্রকাশ হয়ে পড়ে, তাই তাড়াতাড়ি বলে ওঠেছে, "শেলীর ডাক্তারী পড়ার কি হল?"

"না।" উইলিয়ম বলেছেন, "এ বছর আর সময় কোথায়? ও তো এ্যাড্‌মিশান টেস্টই দিতে গেল না।"

"কেন?" সুপ্রিয় বিরক্ত হয়েছে।

"তা, আমি ঠিক বলতে পারব না। তবে ওর মা বলেছে, এ বছর শেলী ভর্তি হতে পারবে না।"

সুপ্রিয় আর কিছু বলে নি। তবে সে একটু বিবক্ত হয়েছে। শেলীর এ কি বিচিত্র আচরণ! এত বড় একটা সিদ্ধান্তের কথা তাকে একবার জানাতে পারে নি পর্যন্ত।

কিন্তু এখন সে-কথা ভাবার সময় নেই। এখন সে ভাবনায় মন ভারী হয়ে পড়লে, কর্তব্যে অবহেলা হবে। তাই শেলীর ভাবনা ছেড়ে, সুপ্রিয় সম্মেলন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

শেলীর আচরণে সুপ্রিয় অসন্তুষ্ট হয়েছে, সে না আসায় সুপ্রিয় দুঃখিত হয়েছে। কিন্তু সেজন্য তার কোনো অসুবিধে হচ্ছে না। ওভারসিয়ার থেকে খালাসী পর্যন্ত, অফিসের প্রত্যেক সহকারী সর্বপ্রকারে সাহায্য করছে তাকে। বে-সরকারী সম্মেলন হলেও সুপ্রিয় একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের অনুমতি নিয়েছে। তিনিও এসেছেন। আর তাঁকেই করা হয়েছে সভাপতি।

উপস্থিত নকমা ও লস্কররা একে একে তাদের অঞ্চলের অভাব অভিযোগ ও দুঃখ-দুর্দশার কথা বলছেন। সুপ্রিয়র স্টেনোগ্রাফার তাঁদের বক্তব্যের সারাংশ লিপিবদ্ধ করছে। গারো পাহাড়ের দুঃখ মোচনের জন্য বিভিন্ন বক্তা বিভিন্ন পরামর্শ দিচ্ছেন। তবে দেখা যাচ্ছে, সকলেই এ বিষয়ে একমত যে পথের অভাবই গারো পাহাড়ের উন্নতির সবচেয়ে বড় অন্তরায়। তার পরেই জলাভাব—পানীয় ও চাষের জল। প্রায় সারা বছর বৃষ্টি হয় গারো পাহাড়ে।

কিন্তু সেই জলকে প্রয়োজনে লাগাবার ব্যবস্থা নেই। ম্যালেরিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা, নিমোনিয়া, বসন্ত, আমাশয়, কুষ্ঠ ও চোখের রোগ গারো পাহাড়ে খুবই বেশি। স্বাস্থ্য ভাল নয় এ জেলার। আর বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবেই এ জেলার অধিবাসীদের স্বাস্থ্য এত খারাপ। সেচ-ব্যবস্থার অভাবেই চাষের এই দুর্দশা। কৃষিপ্রধান জেলা হয়েও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় গারো পাহাড়।

কোনো কোনো প্রতিনিধি পশু-সম্পদের উন্নতি, সমবায় প্রথায় ক্ষুদ্রশিল্প গড়ে তোলা ও সমাজ কল্যাণের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করলেন।

শেষ পর্যন্ত সুপ্রিয়র অনুরোধে উইলিয়ম উঠে দাঁড়ালেন। সম্ভাষণের পরে তিনি বলতে শুরু করলেন, "নেফা, উত্তর কাছাড়, সংযুক্ত মিকির, মিজো, সংযুক্ত খাসিয়া-জয়ন্তিযা এবং গারো পাহাড নিযে পূর্ব ভারতের পার্বত্য অঞ্চল। আসামের আযতন ৪৭,২৯০ বর্গমাইল, আর এই পার্বত্য অঞ্চল হচ্ছে ২২,৭৩২ কিন্তু জনসংখ্যা মাত্র ১৩,১৫,১৬১ জন। সমতলে যেখানে প্রতি বর্গমাইলে ৪৩২ জন মানুষ বাস করে, এই পার্বত্য অঞ্চলে সেখানে মাত্র ৫৮ জনের বাস।

"এই পার্বত্যঅঞ্চল অনুন্নত। তার মধ্যে গারো পাহাড আবার সবচেয়ে অনগ্রসর—কি শিক্ষায়, কি আর্থিক স্বচ্ছলতায়। আসাম রাজ্যে মাথাপিছু বাৎসরিক আয় যেখানে ৩০৭ টাকা, গারো পাহাডে সেখানে মাত্র ১৭২ টাকা। অথচ উর্বর এ জেলার মাটি, খনিজ সম্পদে সম্পদশালী এ জেলা।

"স্বাধীনতা পাবার পরে গারো পাহাড়ের কিছু উন্নতি হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রযোজনের তুলনায় তা নিতান্তই কম। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সমতা রেখে আমরা ফসলের উৎপাদন বাডাতে পারি নি। গারো পাহাড় আজও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। বনসম্পদের উন্নয়ন এবং কয়লা ও চুনাপাথরের উত্তোলন এবং পরিবহনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা আজও হয় নি। এর কারণ সরকারী উদাসীনতা। যে পরিমাণ সরকারী আনুকূল্য থাকলে এ সমস্যার সমাধান হতে পারে, আমরা তা থেকে বঞ্চিত।

"কিন্তু সরকারী সমালোচনা করার জন্য আমি আজ এখানে দাঁড়াই নি। সমালোচনা করবও না, কারণ তাতে কেবল তিক্ততাই বাডবে, সমস্যার কোন সমাধান হবে না। আমরা সরকারের সহযোগিতা চাই। আমরা বিশ্বাস করি গারো পাহাড় উন্নত হলে, এ দেশের উন্নতি হবে। দেশের প্রয়োজনে এ জেলার কৃষিসম্পদ, বনসম্পদ ও খনিজ সম্পদের উন্নয়ন প্রয়োজন। কিন্তু সরকারী কর্মচারীরা উদ্যোগী না হলে তা সম্ভব নয়। সরকারী হিসেবে দেখতে পাচ্ছি

প্রতিবছরে পাঁচ থেকে নয় লক্ষ টাকা

খরচ হয়েছে এ জেলার বিভিন্ন উন্নয়ন খাতে। টাকার অঙ্কটা প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই নগণ্য। কিন্তু উন্নতির পরিমাণ টাকার তুলনায় নগণ্যতর। এর কারণ সরকারী কর্মচারীদের অযোগ্যতা। তাঁরা গারো পাহাড়ে আসেন দিনগত পাপক্ষয় করতে। এখানে তাদের মন বসে না। গারো পাহাড়ের মানুষকে তাঁরা ভালবাসেন না। ফলে কাজের সঙ্গে তাদের মনের মিল হয় না। ব্যয়িত অর্থের অধিকাংশই হয় অপব্যয়।

"আনন্দের কথা, গৌরবের কথাও বটে যে আমরা এই গারো পাহাড়ে এমন কয়েকজন অফিসার পেয়েছি, যাঁরা আমাদের ভালোবাসেন, গারো পাহাড়কে উন্নত করতে চান।" একটু থামেন উইলিয়াম। তিনি এগ্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ও সুপ্রিয়র দিকে একবার তাকান। তারপরে বলতে শুরু করেন, "তাই গারো পাহাড়ের পেছিয়ে-পড়া নর-নারীর তরফ থেকে আমি তাঁদের কাছে যেমন সাহায্যের আবেদন করছি, তেমনি দিচ্ছি সহযোগিতার আশ্বাস। ভগবান আমাদের দিকে মুখ তুলে তাকিয়েছেন, নইলে মিস্টার বোস এখানে আসবেন কেন, তিনি আমাদের ভাষা শিখবেন কেন, এই সম্মেলনের আয়োজন করবেন কেন?"

আবার থামেন উইলিয়ম, তিনি সুপ্রিয়র দিকে তাকান। সুপ্রিয় মাথা নত করে। উইলিয়ম বলেন, "ইতিমধ্যেই তাঁর যোগ্যতা ও আন্তরিকতার অনেক প্রমাণ আমরা পেয়েছি, আজকের এই সম্মেলন আর একটি বড় প্রমাণ। তিনি মনের আনন্দে এই অস্বাস্থ্যকর অপরিষ্কার পরিবেশে বাস করছেন, অথচ ভারতের বৃহত্তম মহানগর থেকে তিনি এসেছেন। তাঁকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।"

সমবেত প্রতিনিধিরা সুপ্রিয়র জয়ধ্বনি করে ওঠে।

সভা শান্ত হলে উইলিয়ম আবার বলেন, "এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। মিস্টার বোস বাঙালী—বাংলার মানুষ, যে দেশের সঙ্গে গারো পাহাড়ের যোগাযোগ সুদীর্ঘকালের। আমাদের ইতিহাসের সঙ্গে বাংলা অঙ্গাঙ্গী হয়ে আছে।

"আমাদের এই গারো পাহাড়ে গো-সকট চলাচলের উপযোগী প্রথম পথটি নির্মিত হয়েছিল ১৮৭৫ সালে—তুরা থেকে ডালু গ্রামের মধ্যে। যে ওভারসিয়ারের তত্ত্বাবধানে সেই পথ তৈরি হয়েছিল, তিনি একজন বাঙালী—বাবু অপূর্বকৃষ্ণ মিত্র। গারো পাহাড়ের মানুষ আজ আশা করছে—এ জেলার শেষ রাজপথটিও নির্মিত হবে একজন বাঙালী ইঞ্জিনিয়ারের তত্ত্বাবধানে আর তার

নাম শ্রীসুপ্রিয় বসু।” প্রচণ্ড করতালির মধ্যে উইলিয়ম আসন গ্রহণ করলেন।

সভাপতির আদেশে সুপ্রিয়কে উঠে দাঁড়াতে হয়। আবার করতালি। সভা খানিকটা শান্ত হলে সুপ্রিয় সবিনয়ে সবাইকে ধন্যবাদ জানায়। প্রতিশ্রুতি দেয়, গারো পাহাড়ের উন্নয়নের জন্য সে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। আবার করতালি আর জয়ধ্বনি।

অবশেষে এগ্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের ভাষণের পরে সভা ভঙ্গ হল।

যথা সময়ে জেলা পরিষদের অধিবেশন হয়ে গেছে। সুপ্রিয় গিয়েছিল তুরা, যোগ দিয়েছিল অধিবেশনে। পরিষদের সামনে সে গারো পাহাড়ের উন্নতি সাধনের এক বিস্তৃত পরিকল্পনা পেশ করেছে। ডেপুটি কমিশনার খুশি হয়েছেন পরিকল্পনাটি দেখে। কথা দিয়েছেন তাঁর সুপারিশ সহ সেই পরিকল্পনা তিনি সরকারের কাছে পাঠিয়ে দেবেন।

অধিবেশন শেষে সুপ্রিয় ফিরে এসেছে রংগ্রামে। কাজে মনোনিবেশ করেছে। কাজ, অনেক কাজ। কাজ চলেছে পুরোদমে। কঠোর পরিশ্রম করতে হচ্ছে। সকাল আটটায় শুরু হয় কর্ম-দিবস, শেষ হয় রাত আটটায়। কোয়ার্টার্স থেকে প্রথমে অফিসে আসে। কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে পড়ে পথে। পথে ও প্রান্তরে ঘুরে বিকেলে আবার ফিরে আসে অফিসে। আরম্ভ হয় লেখা-পড়ার কাজ। কাজ সেরে কোয়ার্টার্সে ফিরে আসতে রাত আটটা বেজে যায়।

কাজের মাঝেও মনে পড়ে শেলীকে। কিছুদিন আগে অফিসের কাজে সে রংবেনগিরি গিয়েছিল। সেদিনও দুপুরে সুপ্রিয় শেলীদের বাড়িতেই খাওয়া-দাওয়া করেছে, কিন্তু রাতে থাকতে পারে নি। থাকবে না শুনে শেলী প্রথমে অভিমান করেছিল। পরে সুপ্রিয়র কাজের কথা জেনে আর আপত্তি করে নি।

সুপ্রিয় কথাটা জিজ্ঞেস করেছিল পরে, “তুমি এ বছর ভর্তি হলে না কেন?”

“তুমি যেতে দিলে না বলে।” সঙ্গে সঙ্গে শেলী জবাব দিয়েছে।

বিস্মিত সুপ্রিয় বলেছে, “আমি আবার বাধা দিলাম কবে?”

“দিয়েছ বৈকি। সে-বারে কত করে বললাম, মা-কে চিঠি লিখে অনুমতি নাও, বিয়ের পরে ডাক্তারীতে ভর্তি হবো।”

সেই এক কথা। তবু সুপ্রিয় সেদিন বিরক্ত হয় নি। বরং শেলীকে সান্ত্বনা দিতে চেয়েছে। “চিঠি তো লিখে দিয়েছি, এবারে জবাব আসবে। কিন্তু বিয়ের সঙ্গে তোমার ডাক্তারীতে ভর্তি হবার কি সম্পর্ক?”

“সে তুমি বুঝবে না সু! তবে বিয়ের আগে আমি আর এখান থেকে কোথাও যেতে পারব না! তাইতো তোমাকে বলছি, যা হয় একটা কিছু কর।

সত্যি বলছি, আমি আর দেরি করতে পারছি না।"

"আমি চেষ্টা করছি শেলী।" সুপ্রিয় সেদিন জোর করে প্রসঙ্গটার ওপরে যবনিকা টেনে দিয়েছে। কিন্তু সেদিন শেলীকে ওর বড়ই ভাল লেগেছে। সত্যি শেলীর স্বাস্থ্যটা এখন বেশ ভাল হয়েছে। তাই চলে আসার আগে কথায় কথায় সুপ্রিয় শেলীকে জিজ্ঞেস করেছিল, "এই কদিনের মধ্যে স্বাস্থ্যটি এত ভাল করলে কেমন করে?"

"আমি করি নি।" শেলী উত্তর দিয়েছিল।

"কে করেছে?"

"তুমি।"

"মানে?" কথাটাকে দুর্বোধ্য বলে মনে হয়েছে সুপ্রিয়র। সে তাকিয়ে রয়েছে শেলীর দিকে।

প্রথমে একটু হেসেছে শেলী। তারপরে গম্ভীর স্বরে বলেছে, "তুমি বড্ড বোকা।" সে সহসা বাড়ির ভেতরে চলে গিয়েছে।

ফিরে আসার পথে কথাটার অর্থ খুঁজেছে সুপ্রিয়, পায় নি। ভেবেছে—শেলী ঠিকই বলেছে, সে বড্ড বোকা। ঠিক করেছে, আবার যখন শেলীর সঙ্গে দেখা হবে, তখন কথাটা জেনে নেবে। কিন্তু তারপরে আর দেখা হয় নি। দেখা করতে পারে নি। কাজের মায়া যে বড় কঠিন মায়া। সেই মায়ার বাঁধনে বাঁধা পড়েছে সুপ্রিয়। তবে শত কাজের মাঝেও মনে পড়ে শেলীকে। শেলী যে তার সকল কাজের প্রেরণা।

কেবল কাজ নয়। কাজের সঙ্গে মাঝে মাঝে অ-কাজও জুটে যায়। সুপ্রিয় অবশ্য অ-কাজ বলে না। বলেন ডাক্তার সিং ও মিস্টার শ্রীবাস্তব। সুপ্রিয় সানন্দে গারোদের সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদান করে। নেমন্তন্ন করলে ধর্মনির্বিশেষে সব অনুষ্ঠানে যায়। সব সময় যে ভাল লাগে, তা নয়। তবু সুপ্রিয় কিছুক্ষণ কাটিয়ে আসে ওদের মাঝে।

এই যেমন মাসখানেক আগে জনৈক খৃষ্টান গ্রামবাসী তাঁর মেয়ের বিয়েতে সুপ্রিয়কে নেমন্তন্ন করেছিলেন। সুপ্রিয় গিয়েছিল সে বিয়েতে কিন্তু কোন বৈচিত্র্যের সন্ধান পায় নি। অন্যান্য জায়গাতে যেমন ভাবে খৃষ্টানদের বিয়ে হয়, ঠিক তেমনি। কথাটা সেদিন শেলীকে বলেছিল সুপ্রিয়। শেলী হেসে জবাব দিয়েছিল, "তোমার যখন সংসারী গারোদের বিয়ে এত পছন্দ, তখন আমাদের বিয়েটা সংসারী মতেই হোক।"

"তা কেমন করে হবে।" সুপ্রিয় বলেছিল, "আমরা যে কেউই সংসারী

পারো নই।"

"তাহলে কোন্ মতে আমাদের বিয়ে হবে ?" শেলী প্রশ্ন করেছিল।

"কেন, হিন্দু মতে।" সুপ্রিয় সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়েছে।

"আমি যে খৃষ্টান।" মৃদু স্বরে শেলী বলেছে।

"তাতে কি হয়েছে। আমাদের তো আর মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা নয়। আমাদের সমাজে আমার ধর্মই তোমার ধর্ম। কিন্তু তোমার আবার এ ব্যবস্থায় কোন আপত্তি নেই তো ?"

"না।"

পথ চলতে চলতে স্মৃতির সমুদ্র মন্থন করে চলেছে সুপ্রিয়। এই এক মজার ব্যাপার। যে কোন সময়ে, যে কোন অবস্থায়, যা কিছু চিন্তা করতে শুরু করুক, তা শেষ হয় শেলীতে এসে। শেলী যেমন তার সকল কর্মের উৎস তেমনি তার সব ভাবনার সঙ্গম।

সুপ্রিয় আজ পুজো দেখতে চলেছে। গারো পাহাড়ের পুজো। পাশের গাঁয়ে পুজো হচ্ছে। উদ্যোক্তাদের কয়েকজন কাল এসে নেমন্তন্ন করে গেছে। কেবল তাকেই নয়, নেমন্তন্ন করেছে আরও অনেককে, ডাক্তার সিং ও শ্রীবাস্তবকে! কিন্তু তাঁরা কেউ আসেন নি। ওদের এ-সব নেটিভ ব্যাপার ভাল লাগে না। আনারসের মদ ও স্বাস্থ্যবতী যুবতী ছাড়া গারো পাহাড়ের আর কিছু ওঁরা পছন্দ করেন না। কিন্তু সে দুটো কেবল ওঁদের রাতের রসদ, দিনের দীপ্তি নয়।

সুপ্রিয় একাই চলেছে পুজো দেখতে। সাধারণত সে একাই চলা-ফেরা করে। কোন অসুবিধে হয় না। গাঁয়ের মানুষ পথে ও প্রান্তরে তাকে স্বাগত জানায়। পথ চিনিয়ে কাজের জায়গায় নিয়ে যায়। বৃষ্টি নামলে টোকা বা তালপাতার ছাতা নিয়ে ছুটে আসে। ওরা তাকে পরম সমাদরে ঘরে নিয়ে বসায়। চা করে দিতে চায়। সুপ্রিয় ঠাণ্ডা জল পান করে শ্রান্তি মিটায়। গ্রামবাসীদের কাছ থেকে তার কর্মচারী ও কণ্ট্রাকটারদের দুর্নীতির খোঁজ-খবর করে। অনেক খবর পাওয়া যায়।

আজ কিন্তু সুপ্রিয় একা নয়। একজন খালাসীকে সঙ্গে নিয়েছে। ফিরে আসতে রাত হয়ে যাবে। অচেনা পথ।

নানা কথা ভাবতে ভাবতে পথ চলছে সুপ্রিয়। ভাবছে কাজের কথা, শেলীর কথা, দাদা-বৌদি ও মা-র কথা। অনেক দিন মায়ের চিঠি পায় না। এখানে আসার পরে এমনটি আর হয় নি। গত চিঠিতে সে শেলীর কথা

লিখেছে। সবই লিখেছে। লিখেছে—সে শেলীকে বিয়ে করতে চায়। না লিখে উপায় ছিল না। শেলী যে আর দেরি করতে চাইছে না।

অনেকদিন হয়ে গেল, কিন্তু মার উত্তর এল না। তবে কি তিনি সুপ্রিয়কে বিশ্বাস করতে পারেন নি ? এ বিয়েতে তাঁর মত নেই ? যদি তাই হয়, তাহলে সুপ্রিয় কি করবে ? সে কি মা-র অমতে সত্যি সত্যি শেলীকে বিয়ে করতে পারবে ?

আর ভাবতে পারে না সুপ্রিয। ঢোল ও শিঙার শব্দে তার ভাবনার ছেদ পড়ে। বুঝতে পারে পুজোমণ্ডপের কাছে পৌঁছে গেছে। আচ্ছা কিসের পুজো। কাল কথাটা জিজ্ঞেস করেছিল উদ্যোক্তাদের। সঠিক উত্তর পায় নি।

হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সব ধর্মেরই মানুষ আছে গারো পাহাড়ে। কিন্তু ধর্মনির্বিশেষে প্রায় সবাই ভগবানে বিশ্বাসী ও জন্মান্তরে আস্থাশীল। ভূত ও প্রেতকে ভক্তি করে এরা। এর মূলে রয়েছে প্রকৃতির প্রভাব। এ প্রভাব ধর্মীয়-প্রত্যয়ের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। গারোদের ধারণা ভূত ও প্রেতরাই জগতের যাবতীয় অমঙ্গল সাধন করে থাকে। তাই প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা যেকোন অঘটন ঘটলে এরা মহাসমারোহে ভূত পুজো করে। সুপ্রিয় জানে না, আজ সে কি পুজো দেখতে চলেছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সে অকুস্থলে হাজির হয়। বাড়ি-ঘরের পাশে একফালি মাঠ। সেখানেই পুজো হচ্ছে। খোলা আকাশের নিচে পুজোর আয়োজন করা হয়েছে। গ্রামের মানুষরা ভিড় করে আছে। তারা সুপ্রিয়কে দেখতে পায়। ভিড় ভেঙে যায়। বাজনা বন্ধ হয়। নকমা তাড়াতাড়ি কাছে আসে। সশ্রদ্ধ নমস্কার করে।

নমস্কার বিনিময়ের পরে সুপ্রিয় জিজ্ঞেস করে, "কখন পুজো আরম্ভ হবে ?"

"এখুনি। আমরা আপনারই অপেক্ষা করছিলাম।"

ভিড়ের ভেতর দিয়ে সুপ্রিয় এগিয়ে চলে। সামনের সারিতে এসে দাঁড়ায়। দড়ি দিয়ে খানিকটা জায়গাকে গোল করে ঘিরে রাখা হয়েছে—পুজো মণ্ডপ। মধ্যস্থলে বিচিত্র মূর্তি অঙ্কিত একখানি পাথর। জায়গাটি জনশূন্য। সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। সবাই দড়ির গণ্ডির বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে আছে মেয়ে, পুরুষ ও শিশুর দল।

নকমা সবাইকে চুপ করতে বলে। মুহূর্তে নীরবতা নেমে আসে। একজন শীর্ণকায় মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি গণ্ডীর ভেতরে প্রবেশ করেন। সেই বিচিত্র মূর্তির পাশে এসে দাঁড়ান। কিসের মূর্তি জানে না সুপ্রিয়। কিন্তু কোন মানুষ বা

জন্তুর মূর্তি যে নয়, তা বেশ বুঝতে পারছে। তবে ভূতের মূর্তি হতে পারে। ভূতের চেহারা সম্পর্কে কোন ধারণাই তার নেই। এতদিন গারো পাহাড়ে বাস করেও ভূত দর্শনের সৌভাগ্য হয় নি তার।

মধ্যবয়স্ক লোকটি বোধহয় মদ খেয়ে নিয়েছেন। মাঝে মাঝে টলছেন। মুখ থেকে লালা গড়াচ্ছে।:কথা জড়িয়ে যাচ্ছে। তবে মাতলামি করছেন না। সুপ্রিয় নকমার দিকে তাকায়। নকমা জানায়—পুরোহিত।

পুরোহিতের পরনে একফালি কাপড়। গায়ে কিছু নেই। হাতে বাঁশ ও বেতের তৈরি ঢালের মত একটা জিনিস। সহসা তিনি কি যেন বলতে আরম্ভ করলেন। মন্ত্র পড়ছেন কি? বুঝতে পারে না সুপ্রিয়: লোকটি বিড়বিড় করছেন। কিন্তু সবাই মনোযোগ সহকারে তাই শুনছে। সুপ্রিয়কেও শুনতে হয়।

বেশ কিছুক্ষণ বিডবিড করার পরে পু'রাহিত শব্দহীন হলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে সভা শব্দময় হযে উঠল। একটু বাদে দুজন যুবক একটা দড়িবাঁধা পাঁঠাকে টানতে টানতে নিযে আসে। ভিড় সরিযে তারা পাঁঠাটিকে নিয়ে এল মণ্ডপে— পুবোহিতের পাশে।

আবার বিডবিড় কবতে শুরু করলেন পুরোহিত। পাঁঠাটির গায়ে হাত দিলেন একবার। তারপরে থামলেন। বোধহয উৎসর্গ করা শেষ হল।

বিডবিড করা বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গেই ঢোল ও শিঙ্গা বেজে উঠল। আরম্ভ হল কোলাহল। ছাগ-শিশু সচকিত হয়ে উঠল। আর সেই সঙ্গে তাঁর প্রতি শুরু হল নির্যাতন।

যুবক দুটি তার গলায় দড়ি ধরে টানছে। বৃত্তাকারে সেই মূর্তি ও পুরোহিতের চারিপাশে ঘুবছে। পাঁঠাটি প্রাণের দায়ে তাদের অনুসরণ করছে —নইলে গলায় ফাঁস পড়বে। প্রতিবা'র প্রদক্ষিণের পরে যুবকদ্বয় পুরোহিতের সামনে একটু থামছে। পুরোহিত ত।ন তার হাতের সেই ঢালখানি দিয়ে পাঁঠাটির মাথায় মৃদু আঘাত করছেন আর খানিকটা আটা ও জল ছিটিয়ে দিচ্ছেন।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলল এই প্রক্রিয়া। তারপরে যুবক দুটি ও পুরোহিত লুটিয়ে পডল পাথরখানির সামনে। ৺।রা উঠে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে হট্টোগোল গেল বেডে। আর তারই মাঝে, সুপ্রিয কিছু বুঝে উঠবার আগেই, সেই অসহায় ছাগশিশুর শিরশ্ছেদ করা হল। পুরোহিত তাড়াতাড়ি একখানি চাল বোঝাই থালা ধরল পাঁঠাটির গলার কাছে। রক্তে থালাখানি ভরে উঠল। একজন যুবক মৃত পাঁঠার লেজটি কেটে সেই থালার ওপরে দিল। পুরোহিত

থালাখানি রাখলেন সেই পাথরখানির সামনে। তারপরে আবার বিড়বিড় শুরু করলেন।

যুবকরা নিহত ছাগশিশুকে নিয়ে চলে গেল নকমার বাড়িতে। সেখানেই হবে ভোজ—গাঁয়ের সবার নেমন্তন্ন।

বিড়বিড শেষ করে পুরোহিত আবার প্রণাম করেন আরাধ্যকে। সঙ্গে সঙ্গে সবাই শুয়ে পড়ে। সুপ্রিয় হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে থাকে। সবাই উঠে দাঁড়ালে, সে হাত নামায়।

নকমা বলে, "আপনার আশীর্বাদে সব ভালভাবে হয়ে গেল। এবারে চলুন, আমার বাড়িতে। সেখানেই খাওয়া-দাওয়া ও নাচ-গান।"

সুপ্রিয় সবিনয়ে সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে। উপস্থিত গ্রামবাসীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে কোয়ার্টার্সে ফিরে চলে।

*　　　*　　　*

চিঠি এসেছে—মার চিঠি। দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হয়েছে। কিন্তু এর চেয়ে যে প্রতীক্ষা প্রিয়তর ছিল। এ তো চিঠি নয়, এ যে শক্তিশেল।

মা-র যে আপত্তি আছে, তা সুপ্রিয় জানত। তাই সে অনেক বুঝিয়ে দীর্ঘ পত্র লিখেছিল। শেলীর রূপ, শেলীর স্বভাব, শেলীর শিক্ষার কথা বার বার উল্লেখ করেছে। লিখেছিল যে তার দৃঢ় বিশ্বাস, শেলীকে দেখলে মা কিছুতেই অপছন্দ করবেন না। বলেছিল, মা যদি সুপ্রিয়র অনুরোধ উপেক্ষা করেন, তাহলে অকারণে দুটি জীবন নষ্ট হয়ে যাবে।

সেই সবিনয় নিবেদনের এ কি উত্তর! তার স্নেহময়ী জননী যে এমন যুক্তিহীনা হতে পারেন, তা সুপ্রিয়র জানা ছিল না। জানা ছিল না, বাবার অকালমৃত্যুর পরে যে মা তাকে এত কষ্ট করে মানুষ করেছেন, তাঁর কাছে স্নেহের চেয়ে সংস্কার বড়, ছেলের চেয়ে ধর্ম বড়। মা তাঁর চিঠিতে শেষকথা জানিয়েছেন—'তুই যদি ঐ খৃষ্টান ডাইনীটাকে বিয়ে করিস, তাহলে আমি তোকে ত্যাজ্যপুত্র করব।'

শুধু মা নয়, দাদাও চিঠি দিয়েছেন। শৈশব থেকে ওরা দু-ভাই একসঙ্গে বড় হয়েছে, ওরা এক জায়গায় থেকেছে। তাই চিঠি লেখার বড় একটা

দরকার পড়ে নি। এখানে আসার পরে সে দাদাকে চিঠি লিখেছে। কিন্তু দাদা উত্তর দেয় নি, বৌদি জবাব দিয়েছে। যতদূর মনে পড়ছে, সুপ্রিয়র কাছে দাদার এই প্রথম চিঠি।

দাদার চিঠির সুর অবশ্য অনেকটা নরম। সুদীর্ঘ পত্রের প্রতি ছত্রে তিনি সুপ্রিয়র 'ভুল' ভাঙাবার চেষ্টা করেছেন। লিখেছেন, 'তোর যে সেই গারো-মেয়েটাকে অপ্সরী বলে হচ্ছে, এটা তোর বয়সের দোষ, চোখের বিভ্রম। তার চেয়ে শিক্ষিতা সুন্দরী ও সদ্‌গুণা শত-সহস্র মেয়ে আছে আমাদের সমাজে। তাদের কাউকে বিয়ে করলে, তুই অনেক বেশি সুখী হবি।'

চিঠির শেষ দিকে দাদা লিখেছেন, 'শেলী যতই সুযোগ্যা হোক, সে গারো। যাদের অনেকে এখনও উলঙ্গ থাকে, বন-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়, জগতের যাবতীয় বস্তু খায়।

'এই তো সেদিন', দাদা লিখেছেন, 'মাত্র শ'খানেক বছর আগে দুজন বাঙালী পথিক যখন গারো পাহাড়ে ভ্রমণ করছিলেন, তখন অতর্কিতে কয়েকজন সশস্ত্র গারো তাঁদের আক্রমণ করে। একজন পথিক আহত হয়ে কোন রকমে পালিয়ে আসেন। আরেকজনকে গারোরা হত্যা করে মাথাটিকে চিহ্ন-রূপে রেখে দেয়।'

এসব ঘটনা সুপ্রিয়র অজানা নয়। সে জানে সেকালে শত্রু নিধনের পরে, তার মাথার খুলিটা রেখে দেবার রেওয়াজ ছিল গারো পাহাড়ে। এগুলি তারা বিজয়ের স্মারক বলে বিবেচনা করত। কখনই হাতছাড়া করত না।

কিন্তু এসব তো সেকালের কথা, যে কালের অবসান হয়েছে ক্যাপ্টেন উইলিয়মসনের সুশাসনে। তিনি তাদের এই ধারণার পরিবর্তন করাতে সমর্থ হন। ১৮৭৫ সালে গারো পাহাড় পরিদর্শনের সময় তিনি শিবির স্থাপন করেছিলেন রংরেনগিরিতে।—শেলীদের গ্রামে। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তিনি অনেক আত্মকলহের অবসান করতে সক্ষম হন। গ্রামবাসীরা তখন দু-শ' খুলি সমর্পণ করেন তাঁকে। সেগুলিকে সবার সামনে পুড়িয়ে ফেলা হয়।

তারপরে প্রায় এক-শ' বছর কেটে গেছে। জগতের পরিবর্তনের সঙ্গে গারো পাহাড়েরও পরিবর্তন হয়েছে। পরিবর্তন হয়েছে সমাজে, শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে—গারো পাহাড়ের মানুষের মনে। আজকের মানুষের সঙ্গে সেকালের সম্পর্ক নেই বললেই চলে। এখন উত্তর-পূর্ব ভারতের পার্বত্য জাতিসমূহের মধ্যে গারোরা সবচেয়ে শান্ত। আর শেলী · ··

আশ্চর্য! বৌদি ও মা-র কাছে অতীতটাই বড় হলো! তাঁরা কেউ

সুপ্রিয়কে বিশ্বাস করলেন না।

এই যে জগতের নিয়ম। আমরা মনুষ্যত্বের চেয়ে ধর্ম, বংশমর্যাদা ও ঐতিহ্যকে বেশি মূল্য দিই। অথচ মানুষের প্রকৃত পরিচয় সে নিজে। সর্বশ্রেষ্ঠ পরিবারেও নিকৃষ্টতম চরিত্রের মানুষ দেখেছে সুপ্রিয়।

দাদাও দেখেছেন নিশ্চয়। কিন্তু এ চিঠি লেখার সময় সে-সব কথা মনে পড়ে নি তাঁর। তাঁর মনে পড়ে নি মহাবীর কর্ণের বাণী—'দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম, মদায়ত্তং হি পৌরুষম্।'

কিন্তু সুপ্রিয় এখন কি করবে? কি লিখবে সে মা ও দাদাকে। তাঁরা সুপ্রিয়র প্রতিশ্রুতি চেয়েছেন। শেলীকে পরিত্যাগ করার প্রতিশ্রুতি।

কেমন করে তা সম্ভব? শেলী তার জীবনের আলো। তাকে না পেলে যে সুপ্রিয়র জীবনটা আঁধারে ছেয়ে যাবে।

আর ভাবতে পারে না সুপ্রিয়। চিঠি দু'খানি পকেটে পুরে সে উঠে দাঁড়ায়।

খালাসী বিস্মিত হয়। এত তাড়াতাড়ি সাহেব বড একটা ওঠেন না। এখনও যে অনেক ফাইল পড়ে আছে। এমন তো কখনও হয় না। তবে কি সাহেবের কোথায় যাবার আছে? কোন সামাজিক কিংবা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে? সেই কথাই সে জিজ্ঞেস করে।

সুপ্রিয় বলে, "না। কোয়ার্টার্সে ফিরব। তুই অফিস বন্ধ করে দে। এ ফাইলগুলো কাল সকালে এসে দেখব।"

"আপনার কি শরীর ভাল নেই স্যার?"

খুবই সঙ্গত প্রশ্ন। কিন্তু যথাযথ উত্তর দিলে খালাসী আবার কি ভাববে কে জানে। তাই সুপ্রিয় বলে, "হ্যাঁ, শরীরটা ভাল লাগছে না।"

"কি হয়েছে স্যার, জ্বর? আমি তাহলে ডাক্তার সাহেবকে একটা খবর দিই।"

মহামুশকিল। ওরা যে বড়ই ভালোবাসে তাকে। লোকটাকে নিরস্ত করতে সুপ্রিয় একটু শুষ্ক হাসি হেসে বলে, "না-রে না। এমনি মাথাটা একটু ধরেছে। ডাক্তার সিং-কে খবর দেবার মতো কিছু নয়। রাতে ঘুমোলেই কমে যাবে।"

রাতে কিন্তু ঘুমোতে পারে না সুপ্রিয়। শেলী তার রাতের ঘুম কেড়ে নেয়। শেলী, শাশ্বতী শেলী। শশিমুখী সুচরিতা শেলী। সুপ্রিয়র শক্তি শেলী।

মানসিক অবস্থা যা-ই হোক, সকালে সুপ্রিয় সময় মতো অফিসে আসে।

কালকের ফাইলগুলো নিয়ে বসে। কিন্তু কাজে মন দিতে পারে না। কি করবে সে ? একদিকে শেলী তার জন্য প্রতীক্ষা করছে, আরেক দিকে মা তার প্রতিশ্রুতি চেয়েছেন। শেলীকে পরিত্যাগ করার প্রতিশ্রুতি।

সুপ্রিয় বেল বাজায়। খালাসী চেম্বারে আসে। সুপ্রিয় বলে, "আমি রংরেনগিরি যাবো, ঘোড়া ঠিক করতে বল।"

খালাসী চলে যায়। একটু বাদে বড়বাবু আসেন। তাঁকেও সুপ্রিয় একই কথা বলে। তিনি জানান, "হ্যাঁ, স্যার! ঘোড়া ঠিক করতে বলে দিয়েছি। কিন্তু কয়েকটা আর্জেন্ট ফাইল রয়ে গেল যে।"

"তাই নাকি", লজ্জা পায় সুপ্রিয়, "বের করুন তো।"

বড়বাবু এক এক করে ফাইলগুলি বের করেন, সুপ্রিয় সই করে দেয়।

কাজ শেষ হলে সে অফিস থেকে বেরিয়ে আসে। বড়বাবু সঙ্গে আসেন। সুপ্রিয় ঘোড়ায় চড়ে। ঘোড়া ছুটে চলে। সুপ্রিয় শেলীর কাছে চলেছে।

কেন চলেছে—সুপ্রিয় ভাবে। কেন সে হঠাৎ চলেছে শেলীর কাছে? তাকে দেখতে ? না। তাহলে ? সে চলেছে শেলীকে তার মা ও দাদার চিঠি দেখাতে।

তাতে কি লাভ হবে ? বরং কাল থেকে সুপ্রিয় যে জ্বালা সইছে, শেলীও সেই জ্বালায় জ্বলবে।

শেলী বুদ্ধিমতী। সে তো সেদিনই বলেছিল—মা এ বিয়েতে মত দেবেন না। বরং সুপ্রিয়ই তখন তাকে আশ্বাস দিয়েছে—তাহলে মার আশীর্বাদ ছাড়াই আমাদের মিলিত জীবন শুরু হবে।

সুপ্রিয় কি শেলীকে সেদিন মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে এসেছে ?

না। সেদিন সে শেলীকে যা বলে এসেছে, তাই করতে হবে তাকে।

তাহলে এখন এভাবে সে রংরেনগিরি চলেছে কেন? বরং সেখানে গেলে চিঠির কথাটা প্রকাশ হয়ে যাবে শেলীর কাছে। শেলী কষ্ট পাবে, চোখের জল ফেলবে।

তার চেয়ে রংগ্রামে ফিরে গিয়ে তার সিদ্ধান্ত মা ও দাদাকে জানিয়ে দেওয়া দরকার। জানিয়ে দেওয়া দরকার যে শেলীকে বিয়ে করলে মা যদি তাকে ত্যাজ্যপুত্র করেন, তবে তা হবে তার প্রেমের পরম পুরস্কার।

সুপ্রিয় লাগামে টান দেয়। সে ফিরে চলে রংগ্রামে। '

ঝড়-বাদলের কোন নিয়ম নেই গারো পাহাড়ে। সমতলের চেয়ে বেশি শীত এখানে। শীতবস্ত্রের অভাব, তবু গারো পাহাড়ের মানুষ শীতকে স্বাগত জানায়। শীত বর্ষার মত সর্বনাশী নয়। বর্ষায় ঢল নামে গারো পাহাড়ে। মরা নদীগুলি প্রাণ পায়। ফুলে ওঠে, ফুসতে থাকে। প্লাবিত হয় গ্রামের পর গ্রাম। ভেসে যায় মানুষ আর গৃহপালিত জন্তু, বাড়ি ও বন।

বন্যার চেয়ে সর্বনাশী ঘূর্ণিঝড়। প্রতিবছর বর্ষাকালে দুয়েকবার ঘূর্ণিঝড় বয়ে যায় গারো পাহাড়ের ওপর দিয়ে। আর্তনাদে আকাশ-বাতাস ভরে ওঠে।

ঝড়-বৃষ্টি ছাড়াও রয়েছে ভূমিকম্প। মাঝে মাঝেই ভূমিকম্প হয় গারো পাহাড়ে। রংগ্রামের বুড়ো মানুষদের কাছে সুপ্রিয় শুনেছে ১৯০০ সালের সেই প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ের কথা। শুনেছে ১৮৯৭, ১৯২৩ ও ১৯৩০ সালের ভূমিকম্পের কথা। প্রত্যেকবারে গারো পাহাড়ের অধিকাংশ গ্রাম ধ্বংস হয়ে গেছে।

না, ভূমিকম্প নয়, আজ সুপ্রিয় ভাবছে ঝড়-বৃষ্টির কথা। হিসেব মতো, বর্ষাকাল শেষ হয়ে গেছে এবারে। এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত বর্ষাকাল এখানে। আর এখন চলেছে অগাস্ট। তাই গারো পাহাড়ের মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল—দুঃখের পালা শেষ হয়ে গেছে। কয়েকটা মাস একটু নিশ্চিন্তে থাকা যাবে।

কিন্তু হায়! প্রকৃতি যে বড়ই নির্দয়া। হঠাৎ পরশু বিকেল থেকে শুরু হয়েছে প্রবল বর্ষণ। আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি নেমেছে। বৃষ্টি তো নয়, অভিশাপ। এখন ধান পাকার সময়। অর্ধাহারে যাদের জীবন কাটে, তারা অনাহারে মারা যাবে।

অপমৃত্যু ছাডা উপায় কি? রুদ্র প্রকৃতিকে বশে আনবে কে? নিজে না থামলে, বৃষ্টি থামানো সম্ভব নয়। কিন্তু বৃষ্টির জলে যখন ঢল নামে, পাহাড়ী নদীতে বান ডাকে, বানের জলে বন্যা দেখা দেয়, তখন তাকে রোখা যায়। অথচ রুখবে কে? তার যে কোনো ব্যবস্থাই কেউ করেন নি এখনও।

দুপুর রাত থেকে বৃষ্টির সঙ্গে বাতাস বইতে আরম্ভ করেছে। মত্তপবনের অসময়ে আবির্ভাব হয়েছে। একেই ঘূর্ণিঝড় বলে কিনা জানে না সুপ্রিয়। তবে টিনের চালটা ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে। মাঝে মাঝে বেশ জোরে দুলে উঠছে। মনে হচ্ছে যেন উড়ে যাবে। অথচ তার কোয়ার্টার্স খুবই মজবুত। এমন শক্ত বাড়ি রংগ্রামে আর নেই। গ্রামের কুঁড়েঘরগুলির অবস্থা কল্পনা করতে চায় সুপ্রিয়। আর কুঁড়েঘরই তো বেশি গারো পাহাড়ে। এতক্ষণে বোধ হয় সব শেষ হয়ে গেল। কিন্তু একা সুপ্রিয় কি সাহায্য করতে পারে

তাদের ? এই আঁধার রাতে ঝড়ের ভেতর সে বাইরে বেরোবে কেমন করে ?' অসহায় সুপ্রিয় ঘরে বন্দী হয়ে আছে। সে দু'চোখের পাতা এক করতে পারে না। অধীর হয়ে প্রভাতের প্রতীক্ষা করতে থাকে।

মা ও দাদার চিঠি পাবার পর থেকে গত কয়েকদিন ধরে তার মানসিক অবস্থাটা ভাল নয়। ইতিমধ্যে সে তাঁদের চিঠির উত্তর দিয়েছে। তার শেষ-কথা জানিয়ে দিয়েছে। সে জানে, তাঁরা রাজী হবেন না, তাঁরা সুপ্রিয়কে পরিত্যাগ করবেন। সারা জীবনের জন্য মার সঙ্গে সুপ্রিয়র সব সম্পর্ক শেষ হয়ে গেল।

এ ছাড়া আর কিই বা উপায় ছিল ? শেলীর সঙ্গে সম্পর্ক শেষ করা সম্ভব নয় তার পক্ষে। শেলীর মূল্য তার কাছে সবার থেকে বেশি। আচ্ছা, শেলীদের গ্রামেও কি এই ঝড় হচ্ছে?

হতে পারে। এখান থেকে কতই বা দূর। তাহলে শেলী কেমন আছে ?

ভালই আছে। সুপ্রিয়র মন বলছে—শেলী ভাল আছে। তাদের বাড়ি সুপ্রিয়র কোয়ার্টার্সের চেয়ে মজবুত। বেশ উঁচুতে অবস্থিত। বন্যা কিংবা ঝড়ে ওদের ক্ষতি হবার আশঙ্কা নেই। তবে তার গ্রামের মানুষরা হয়তো চরম দুর্দশার সম্মুখীন হয়েছে। তা হোক গে, শেলী তো ভাল আছে।

আচ্ছা, সুপ্রিয় কি স্বার্থপরের মতো চিন্তা করছে ? হ্যাঁ, তা একটু করছে বৈকি। কিন্তু সে যে নিরুপায়। শেলীর স্বার্থের প্রশ্নে সে স্বার্থপর না হয়ে পারে না। শেলীর ভাবনার সঙ্গে সে আর কোনো ভাবনাকে যুক্ত করতে চায় না। শেলীর বিনিময়ে সে তার সকল ঐশ্বর্যকে বিলিয়ে দিতে পারে।

সকালের দিকে ঝড় থেমে গেল। কিন্তু বৃষ্টি বন্ধ হল না। অবশ্য বৃষ্টির বেগ অনেক কমে গেছে। সুপ্রিয় বাইরে বেরিয়ে পড়ল।

গ্রামের চেহারা পালটে গেছে। গ্রাম তো নয়, এ যেন একটা বিল। অধিকাংশ বাড়ি-ঘর ভেঙ্গে গেছে। পথ ও প্রান্তর জলমগ্ন। পথের ওপরে প্রবল স্রোত। সেই স্রোত ঠেলে অতিকষ্টে সুপ্রিয় এগিয়ে চলেছে। ক্ষেতের ফসল সব নষ্ট হয়ে গেছে। দুর্ভিক্ষ এবার অবশ্যম্ভাবী।

বিপন্ন মানুষ তাকে দেখে ছুটে আসে। তারা দুর্দশার কথা বলে আর কাঁদে। সুপ্রিয়র চোখে জল আসে। সে তাদের সান্ত্বনা দেয়, আশ্বাস দেয়, আশা দেয়। তারপরেই ভাবে কতটুকু সাধ্য তার, কতটা সাহায্য সে করতে পারে, এদের ?

সুপ্রিয় ফিরে আসে অফিসে। খালাসীদের বলে কোয়ার্টার্স থেকে তার জিনিসপত্র অফিসে নিয়ে আসতে। যে ক'দিন জল না নামে, ঘর-বাড়ি না

পাঠানো হয়, সে ক'দিন গ্রামের নিরাশ্রয় মানুষ তার কোয়ার্টার্সে থাকবে।

কথাটা শুনে বড়বাবু বলেন, "কিন্তু স্যার, আপনার কষ্ট হবে।"

"ওদের কষ্টের তুলনায় সে কষ্ট কিছুই নয় বড়বাবু! আপনি ব্যবস্থা করুন।" সুপ্রিয় বলে।

বড়বাবু সুপ্রিয়কে জানেন। জানেন যে কোনোমতেই তার মতের পরিবর্তন করা যাবে না। অগত্যা তিনি সেই ব্যবস্থাই করেন। রংগ্রামের নিরাশ্রয় মানুষ এসে আশ্রয় নেয় সুপ্রিয়র কোয়ার্টার্সে। আর সুপ্রিয় বাসা বাঁধে অফিসে।

কোয়ার্টার্স ভরে যায় কিন্তু বিপন্ন মানুষের মিছিল শেষ হয় না। ডাক্তার সিং ও শ্রীবাস্তব এগিয়ে আসেন তার সাহায্যে। সরকারী গুদাম থেকে টিন ও কাঠ নিয়ে সুপ্রিয়র কোয়ার্টার্সের সামনে অস্থায়ী ছাউনী তোলা হল। ডাক্তার সিং আহত ও অসুস্থদের চিকিৎসায় লেগে যান। সুপ্রিয় লোঙ্গরখানা চালু করে। শ্রীবাস্তবকে দেখাশোনা করতে বলে নিজে ফিরে আসে অফিসে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। রংগ্রামের মানুষের মোটামুটি একটা ব্যবস্থা হল।

কিন্তু রংগ্রামকে নিয়েই তো গারো পাহাড় নয়। সমস্যা তো সারা গারো পাহাড়কে নিয়েই। অথচ সে সমস্যার সমাধান করার সাধ্য কোথায় তার। সুপ্রিয় তার পরিকল্পনায় বন্যা প্রতিরোধের পথনির্দেশ করেছে। কিন্তু সে পরিকল্পনা কবে কার্যকর হবে কে জানে! তার আগেই হয়তো গোটা গারো পাহাড়টা ভেসে যাবে।

সুপ্রিয় রিপোর্ট লিখতে বসে। তুরাতে রিপোর্ট পাঠাতে হবে। কাল শ্রীবাস্তব তুরা যাচ্ছেন। তাড়াতাড়ি সরকারী সাহায্য না এসে পৌছলে খাদ্য-বস্ত্রহীন এই নিরাশ্রয় মানুষগুলিকে বাঁচানো যাবে না।

বিপন্ন মানুষ দু-হাত তুলে আশীর্বাদ করে সুপ্রিয় ও তার সহযোগীদের। অফিসের সমস্ত কর্মচারীরাও সাহায্য করছে তাদের। সরকারী কাজ সীমাবদ্ধ হয়েছে আর্তত্রাণে। সুপ্রিয়র অফিসের মজুর ও মিস্ত্রিরা গ্রামবাসীদের বাড়ি-ঘর মেরামত করে দিচ্ছে। শ্রীবাস্তব খবর পাঠিয়েছেন, সরকারী সাহায্য মঞ্জুর হয়েছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এই সময়োচিত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়েছেন। ডেপুটি কমিশনার রংগ্রামে আসছেন।

খবর এসেছে—এবার ঘূর্ণিঝড় কেবল রংগ্রাম ও চারিদিকের কয়েকখানি গ্রামেই সীমাবদ্ধ ছিল। এতে গারো পাহাড়ের অন্যান্য অঞ্চলের তেমন ক্ষতি হয় নি। কোনো ক্ষতি হয় নি রংরেনগিরির। ক্ষতি হয় নি শেলীর। সুপ্রিয় ভগবানকে ধন্যবাদ দেয়। সুপ্রিয় স্বার্থপর।

*　　*　　*

ডাক্তার সিং ও শ্রীবাস্তব এসে ঢুকলেন সুপ্রিয়র চেম্বারে। সুপ্রিয় কাজ বন্ধ করে তাঁদের স্বাগত জানায়। সহাস্যে বলে, "বসুন।"

ওরা আসন গ্রহণ করেন। সুপ্রিয় বেল বাজায়। খালাসী আসে। সুপ্রিয় চা আনতে বলে ওদের সঙ্গে গল্প শুরু করে।

মাঝে মাঝেই ওরা এমন আসেন। সুপ্রিয়র সময় হয় না, তাই সে বড় একটা যেতে পারে না শ্রীবাস্তবের অফিসে কিংবা ডাক্তারের হেল্‌থ সেণ্টারে। ওরাই আসেন তার কাছে। কাজের ক্ষতি হয়, কিন্তু খারাপ লাগে না। সে অবকাশ যাপনের আনন্দ লাভ করে।

স্বাভাবিক ভাবেই ওদের গল্পে গারো পাহাড় প্রাধান্য লাভ করে। কথায় কথায় শ্রীবাস্তব বলেন, "আপনি যাই বলুন মিস্টার বোস, এরা এখনও তেমনি অশিক্ষিত ও অসভ্যই রয়ে গেছে।"

"আমি আপনার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না মিস্টার শ্রীবাস্তব! গারো পাহাড়ে শিক্ষিতের সংখ্যা কম হলেও গারোরা অসভ্য নয়।"

ডাক্তার সিং হেসে বলেন, "শিক্ষার সঙ্গে সভ্যতার সম্পর্কটা যে অত্যন্ত নিকট মিস্টার বোস! আমারও কিন্তু বিশ্বাস, এরা এখনও তেমনি অসভ্য আর নিষ্ঠুরই রয়ে গেছে। নেহাত থানা ও ফাঁড়ি আছে বলে, নইলে এখনও থ্রডিং-য়ের মতো ঘটনা গারো পাহাড়ে হামেশাই ঘটত।"

"এ আপনার ভুল ধারণা ডাক্তার সিং।" সুপ্রিয় প্রতিবাদ করে, "পুলিসের ভয়ে নয়, প্রকৃতিগত ভাবেই গারোরা এখন সৎ ও শান্তিপ্রিয় জাতি।"

"আপনার এ সিদ্ধান্ত সত্য নয়।" শ্রীবাস্তব বলেন, "কিন্তু থ্রডিং-য়ের ঘটনাটা কি?" তিনি ডাক্তারের দিকে তাকান।

ডাক্তার হাসেন। সুপ্রিয়র দিকে তাকিয়ে বলেন, "সে যেমনি ইন্টারেষ্টিং, তেমনি ব্রুট্যাল ব্যাপার। আপনিই বলুন না মিস্টার বোস!"

"প্রসঙ্গটা যখন আপনি উত্থাপন করলেন, আপনিই বলুন। তবে আমি আগেই বলে রাখি, থ্র ডিং-রা বিদায় নিয়েছে গারো পাহাড় থেকে।"

"এ আপনার অন্ধ-বিশ্বাস।" ডাক্তার সুপ্রিয়কে বলেন।

বিরক্ত হন শ্রীবাস্তব, "আপনাদের মন্তব্য পরে শুনব, এখন ঘটনাটা বলুন।"

ডাক্তার শুরু করেন, "থ্রডিং আর কেংকুল রাকমনপাড়া গ্রামের দুই প্রতিবেশী বন্ধু।" একদিন নাকি কেংকুল থ্রডিং-কে অপমান করে। কি রকম রকম অপমান কেউ জানে না। তবে সম্ভবত কথা কাটাকাটি থেকে গালাগালি পর্যন্ত।

"অপমানিত হয়ে অপমানকারীকে মার-ধোর করা, এমনকি খুন করাও বিস্ময়কর নয়। এমন ঘটনা সর্বত্রই ঘটে, আজও ঘটেছে।

"কিন্তু শুনে বিস্মিত হবেন যে অপমানিত থ্রডিং সেই চিরাচরিত নিয়মে তার অপমানের প্রতিশোধ নিল না। কেংকুলের অপরাধের বোঝা সে চাপিয়ে দিল রাক্‌মনপাড়া গ্রামের কয়েকটি নিরপরাধ পরিবারের ওপরে। বলা বাহুল্য তারা থ্রডিং-য়েরও প্রতিবেশী হলেও কলহের কথা কিছুই জানত না।

"প্রতিহিংসাপরায়ণ থ্রডিং হঠাৎ রাক্‌মনপাড়া গ্রামের দুটি বস্তীতে আগুন ধরিয়ে দিল। দ্বিতীয় বস্তীতে সে যখন আগুন ধরায়, তখন সেখানে কোনো পুরুষমানুষ ছিল না। আগুনের কবল থেকে উদ্ধার পাবার জন্য অসহায়া স্ত্রীলোকেরা শিশুদের নিয়ে ঘরের বাইরে এলো, আর থ্রডিং তখন ধারালো অস্ত্র হাতে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ছ'জন নারী ও শিশুকে সে নৃশংসভাবে হত্যা করল। আরও ছ'জন তার অতর্কিত আক্রমণে আহত হল। কিন্তু তারা কোনমতে পালিয়ে যেতে পারল।" থামলেন ডাক্তার।

বিস্মিত শ্রীবাস্তব বলে উঠলেন, "সে কি, বন্ধু কেংকুলের ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্য তার সঙ্গে সম্পর্কহীন নারী ও শিশুদের হত্যা করল লোকটা, প্রতিবেশীদের বাড়ি পুড়িয়ে দিল!"

"হ্যাঁ।" ডাক্তার বলেন, "এমনি নিষ্ঠুর নিপীড়ক হচ্ছে গারোরা। আর এমন নৃশংস ঘটনা আজও ঘটতে পারে গারো পাহাড়ে।"

"না।" সুপ্রিয় প্রতিবাদ করে এতক্ষণ পরে। বলে, "কারণ এ ঘটনার পরে প্রায় একশ' বছর কেটে গেছে কিন্তু এমন আর একটিও ঘটনা ঘটে নি গারো পাহাড়ে। বরং হিসেব নিয়ে দেখা গেছে, উত্তর-পূর্ব ভারতের পার্বত্য জেলা-গুলির মধ্যে সবচেয়ে কম ফৌজদারী মামলা হয় এ জেলায়।"

খালাসী চা নিয়ে আসে। তিন জনের সামনে তিন কাপ চা রেখে সে চলে যায়। চা-য়ে চুমুক দিয়ে শ্রীবাস্তব বলেন, "কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই খুনীটার কি কোনো শাস্তি হয়েছিল?"

"হ্যাঁ।" সুপ্রিয় উত্তর দেয়।

"কি শাস্তি?"

"তিন সপ্তাহ পরে পলাতক খ্‌ডিং ধরা পড়ে। সে কিন্তু মোটেই অনুতপ্ত ছিল না। বরং সোচ্চার কণ্ঠে পুলিসকে বলেছিল—সে যা করেছে, সজ্ঞানেই করেছে। সুযোগ পেলে সে আরও অনেককে খুন করবে। তার এই উক্তি থেকে প্রমাণিত হয় যে লোকটার মাথার ঠিক ছিল না। কাজেই একটা পাগলের কুকীর্তিকে জাতীয় চরিত্র বলে বিবেচনা করা ঠিক নয়।"

অসহিষ্ণু কণ্ঠে শ্রীবাস্তব বলেন, "আরে মশাই, লোকটার কি শাস্তি হল তাই বলুন না।"

"১৮৭৫ সালের মে মাসে তুরাতে তার বিচার হয়। বিচারে তার ফাঁসি হয়। ১৮৬৬ সালে গারো পাহাড়কে পৃথক জেলায় পরিণত করার পরে, সেই প্রথম ফাঁসির আসামী।........."

সুপ্রিয় হয়তো আরও কিছু বলত। কিন্তু তাকে থামতে হয়। হন্তদন্ত হয়ে জনৈক ওভারসিয়ার ঘরে ঢোকে। তাকে অফিসের কাজে তুরা পাঠিয়েছিল সুপ্রিয়। কোনো জরুরী খবর না থাকলে, এভাবে সে ঘরে ঢুকতো না তাই তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করে সুপ্রিয়, "কি খবর?"

"স্যার, কলকাতা থেকে আপনার মা ও দাদা এসেছেন।"

"কোথায়?" সুপ্রিয় উঠে দাঁড়ায়।

"আজ্ঞে, আপনার কোয়ার্টার্সে। আমার সঙ্গেই তাঁরা তুরা থেকে এসেছেন। আমি তাঁদের কোয়ার্টারে পৌঁছে দিয়ে, এখানে এসেছি।"

মনে মনে বিচলিত হয়ে ওঠে সুপ্রিয়। কোন খবর না দিয়ে তাঁদের এই আকস্মিক আগমনের কারণ বুঝতে পারছে সুপ্রিয়। বুঝতে পারছে সে জীবনের কঠিনতম সমস্যার সম্মুখীন। কিন্তু সে-কথা প্রকাশ করা যাবে না এদের কাছে। তাই মুখে তাকে বলতে হয়, "ভালই করেছ। কিন্তু আমার কোয়ার্টার্সের যা অবস্থা। বন্যার্তরা চলে যাবার পরে ঠিক মতো পরিষ্কার পর্যন্ত করানো হয় নি। জিনিসপত্র সব এলোমেলো হয়ে চারিদিকে পড়ে আছে।"

"সেজন্য আপনি কোন চিন্তা করবেন না স্যার, আমরা সব ঠিক করে দিচ্ছি। তাছাড়া আপনার বৌদিও এসেছেন।"

সুপ্রিয় বেরিয়ে আসে চেম্বার থেকে। শ্রীবাস্তব ও ডাক্তার তাকে অনুসরণ করেন।

তাড়াতাড়ি পথ চলে সুপ্রিয়। নানা চিন্তা এসে ভিড় করে মনে। মাকে সে চিঠি লিখেছিল। লিখেছিল যে আর্যসমাজের সাহায্যে হিন্দু ধর্মে দীক্ষা দিয়ে শেলীকে সে বিয়ে করবে। মা যে মত দেবেন না, তা সুপ্রিয়র অজানা

নয়। কিন্তু মা যে দাদা আর বৌদকে নিয়ে একেবারে এখানে চলে আসবেন, তা ভাবতেই পারে নি। মনে মনে নিজেকে তৈরি করতে থাকে সে। প্রবল বাধার সম্মুখীন হতে হবে তাকে।

তিনজনে বসেছিল সামনের ঘরে। এই ঘরটাই সে আজ ক'দিন ধরে ব্যবহার করছে। বাকি ঘর দুটো নোংরা হয়ে আছে। মা, দাদা ও বৌদি কথাবার্তা বলছিল। সুপ্রিয়রা ঘরে ঢুকতেই তাদের কথা থেমে যায়। সুপ্রিয় মা ও দাদাকে প্রণাম করে। তাঁরা কোনো কথা বলেন না।

সুপ্রিয় ডাক্তার ও শ্রীবাস্তবের সঙ্গে সবার পরিচয় করিয়ে দেয়।

কথা বলে বৌদি, "কি ক'টা হাতি মারলে? এরাও তো তোমার সঙ্গে হাতি শিকারে গিয়েছিলেন?"

মৃদু হেসে সুপ্রিয় বলে, "হ্যাঁ, কিন্তু হাতি আর মারতে পারলাম কোথায়? ভয় পেয়ে হাতিগুলো পালিয়ে গেল যে।"

"হ্যাঁ, এত বড় বীরপুরুষরা গেছেন, হাতি কি আর বনে থাকতে পারে? যাকগে এখন হাত মুখ ধুয়ে জামা-কাপড় পাল্টাও। ওদেরও বসতে বলো। আমি চা নিয়ে আসছি।"

অনিচ্ছা সত্ত্বেও দাদাকে কথা বলতে হয় ডাক্তার ও শ্রীবাস্তবের সঙ্গে। কিন্তু আলাপ করে ভালই লাগে তাঁর। বিচক্ষণ দাদা বুঝতে পারেন, গারো পাহাড়ে চাকরি করলেও গারোদের ঘৃণা করেন তাঁরা। খানিকক্ষণ কথাবার্তার পরে তাঁরা চলে যান।

মা বসে আছেন এখানেই। কিন্তু কোনো কথা বলছেন না তিনি। দাদা ডাক্তার ও শ্রীবাস্তবের সঙ্গে ইংরাজীতে কথা বলেছেন। কাজেই তাঁদের সঙ্গে কথা বলা সম্ভব নয় মা-র পক্ষে। কিন্তু তিনি যে সুপ্রিয়র সঙ্গেও কথা বলছেন না। কতদিন পরে মা-র সঙ্গে দেখা! অথচ মা কথা বলছেন না। সুপ্রিয়র কান্না পায়। কিন্তু সে কাঁদতে পারে না।

জনকয়েক খালাসী নিয়ে বড়বাবু হাজির হন। বেঁচে যায় সুপ্রিয়। সে অকারণে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। খালাসীরা ঘরদোর পরিষ্কার করতে থাকে। সুপ্রিয় তাদের তদারকী করে। আর বড়বাবু বিব্রত হয়ে পড়েন।

ঘর-দোর পরিষ্কার হয়ে গেলে বৌদি গোছগাছ শুরু করে। তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে সুপ্রিয়। বৌদি বাধা দেয়, সুপ্রিয় মানে না। তার মনে পড়ে—আরও একদিন এমনি গোছগাছ করতে হয়েছিল। যেদিন প্রথম সে এই কোয়ার্টার্সে আসে। সেদিনও শেলীকে সাহায্য করতে গিয়ে ধমক খেতে

হয়েছিল তাকে। শেলী একাই সব গুছিয়ে দিয়েছিল—তার সংসার পেতে দিয়েছিল। আর আজ? আজ শেলী কোথায়?

রাতে খাবার টেবিলে বসেই দাদা শুরু করলেন অভিযোগ। সুপ্রিয় কেবল শুনে যায়।

দাদা বলেন, "ছিঃ ছিঃ, তোর মতো ছেলের এই অধঃপতন। শেষকালে কি না একটা পাহাড়ী খৃষ্টান মেয়েকে বিয়ে করতে চাইছিস।"

"তুমি তাকে দেখলে, একথা বলতে না দাদা।" সুপ্রিয় আর চুপ করে থাকতে পারে না।

"দরকার নেই। আমি তাকে দেখতে চাই না। আমি সত্যি অবাক হয়ে যাচ্ছি তোর রুচি দেখে। বিয়ে করবি, এ তো ভালো কথা, আনন্দের কথা, আমাদের সমাজে কি সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়ের অভাব যে, ঐ জংলীটাকে তোর বিয়ে করতে হবে।"

কি বলবে সুপ্রিয়? শেলী জংলী নয়। সুন্দরী শিক্ষিতা একটি মেয়ে হলেই শেলীর স্থান পূর্ণ হবে না। সে চুপ করে থাকে।

দাদা আরও অনেক কথা বলে যান। সুপ্রিয় শুনে যায়। যুক্তি যেখানে নিরর্থক, সেখানে নীরব শ্রোতা হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

এমনি অভিযোগ আর উপদেশের পালা চলল দু'দিন। দাদার সঙ্গে পোঁ ধরলেন সিং ও শ্রীবাস্তব। ওদের যে কি স্বার্থ বুঝে উঠতে পারে না সুপ্রিয়। দাদার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য যতটা সম্ভব অফিসে সময় কাটাতে চাইছিল সুপ্রিয়, কিন্তু সিং ও শ্রীবাস্তব এসে হানা দিল অফিসেও। পরামর্শের অবসরে সিং বললেন, "আই কান্ট্ আণ্ডারস্ট্যাণ্ড মিঃ বোস, হোয়াই ইউ আর সো সীরিয়াস অ্যাবাউট দ্যাট গারো গার্ল। ইউ হ্যাভ এনজয়েড হার? দ্যাট্স্ নাথিং। দীজ্ পিপল আর আনসিভিলাইজড্, দে হ্যাভ নো মরালিটি। মোস্ট অব দি গার্লস্ হিয়ার গিভ বার্থ টু ইললিগ্যাল চাইল্ড বিফোর দেয়ার ম্যারেজ। হাউ ডু ইউ নো দ্যাট শেলী হ্যাজ নট ডান সো"?

"শাট আপ্।" বজ্রকণ্ঠে ফেটে পড়ে সুপ্রিয়। "আই সে ইউ গেট আউট।" রাগে তার সর্ব শরীর কাঁপছে।

বেগতিক বুঝে ডাক্তার সিং সরে পড়েন।

কেটে গেল আরও একটা দিন। দু'ভাই কোনো মীমাংসায় উপনীত হল না। তবে দাদা বুঝতে পারলেন, সুপ্রিয় মত পাল্টাবে না।

দাদাও তার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিলেন। বাড়িতে বৌদি ছাড়া আর

কথা বলার জন নেই। কোয়ার্টার্স কারাগারে পরিণত হল। তবু দিনান্তে আসতে হয় ফিরে।

অফিসেও ভাল লাগে না। কি ভাবে এ সমস্যার সমাধান হবে? শেলীর চিন্তায়, মা ও দাদার চিন্তায়, সারাক্ষণ অস্থির হয়ে থাকে মন। কেবল কাজে ভুল হয়।

আজ একটু সকালেই কোয়ার্টার্সে ফিরে এসেছে সুপ্রিয়। অফিসের পোশাক পালটে হাত-মুখ ধুয়ে বারান্দায় বসে সে। একটু বাদে বৌদি চা ও জল-খাবার নিয়ে আসে। আশ্চর্য তার বৌদি। এই যে এতবড় একটা পারিবারিক ঝড় বইছে, বৌদির যেন ভ্রূক্ষেপ নেই। অবিচলিত ভাবে সে তার কাজ করে যাচ্ছে। স্বামীর পক্ষ নিয়ে সে কখনও কোনো কথা বলে নি সুপ্রিয়কে। বিবাহিতা মেয়েদের পক্ষে এতটা নিরপেক্ষতা বিস্ময়কর।

আজ সুযোগ পেয়ে সুপ্রিয় বলে, "বৌদি, তুমিও কি আমাকে বিশ্বাস করো না?"

বৌদি সুপ্রিয়র দিকে তাকায়। কিন্তু কোনো জবাব দেয় না।

সুপ্রিয় আবার বলে, "তুমি বিশ্বাস করো বৌদি, আমি ভুল করি নি।"

"আমি তা জানি ঠাকুরপো।"

"তাহলে তুমি আমার হয়ে কিছু বলছো না কেন?"

"কি হবে বলে, আমার কথা কে শুনবে?" বৌদির স্বরে যেন কান্না ঝরে।

আনন্দে উদ্‌বেলিত হয়ে ওঠে সুপ্রিয়। অনেকদিন এমন আনন্দের স্বাদ পায় নি সে।

"বৌমা!"

চমকে পেছন ফেরে ওরা। মা দাঁড়িয়ে আছেন দরজার কাছে। মুহূর্তের মাঝে বৌদির মুখখানি ম্লান হয়ে ওঠে। মা কখন ওখানে এসেছেন, টের পায় নি। হয়তো সবই শুনেছেন। কিন্তু সে কথা ভাবার সময় নেই। কোনমতে বৌদি উত্তর দেয়, "মা!"

"তুমি ভেতরে যাও। ছোটখোকার সঙ্গে আমি কয়েকটা কথা বলব।"

বৌদি ত্রস্ত পায়ে ভেতরে চলে যায়। এগিয়ে এলেন মা। এ ক-দিন মা কথা বলেন নি। এমনটি আর হয় নি সুপ্রিয়র জীবনে। শৈশবে পিতৃবিয়োগ হয়েছে তার। বাপ-মায়ের যৌথ স্নেহে মা মানুষ করেছেন তাকে। সেই মা তার সঙ্গে কথা বলেন না। এ ক'দিন সুপ্রিয়র বুকের ভেতর একটা দুঃসহ জ্বালা গুমরে মরছিল। তাই মা-র মুখে নিজের নাম শুনে আনন্দে তার মন ভরে উঠল।

কিন্তু পরক্ষণেই সে আনন্দ মিলিয়ে গেল। মা বললেন, "বৌমার ছেলে-পুলে হল না। আমার কত আশা তোর সন্তান আমার শ্বশুরের বংশ রক্ষা করবে। আর তুই কি না একটা জংলী খৃষ্টানকে বিয়ে করতে চাইছিস। তোর মতো ছেলের কেন এ মতিভ্রম ?"

সুপ্রিয় কোনো উত্তর দেয় না। তার নীরবতা মা-কে আঘাত করে। তিনি কেঁদে ফেলেন।

সুপ্রিয় তবু চুপ করে থাকে। বলার কি আছে তার ?

মা মরীয়া হয়ে বলেন, "এ আমি আগেই জানতাম। কামাক্ষ্যা-কামরূপের মেয়েমানুষরা বশীকরণ জানে। এও তো সেই দেশেরই অংশ। তাই আমি তোকে আসতে দিতে চাই নি। তবু সেখানকার মেয়েরা হিন্দু, এ যে খৃষ্টানী। হায় ভগবান! এই তোমার মনে ছিল। আমার সোনার ছেলেকেই যদি ডাইনীর বশ করালে, তখন আমাকেও তুমি নাও ঠাকুর। আমি বেঁচে থেকে এ অধর্ম দেখতে পারব না।"

"সে খৃষ্টান হলেও জংলী নয় মা। সে ডাইনী নয়। একবীরটি গিয়ে তাকে দেখে এসো। তার পরে তুমি যে আদেশ করবে, আমি মাথা পেতে নেবো।"

"আমি গিয়ে দেখে আসব! আমি যাবো সেই ম্লেচ্ছ মেয়েমানুষটার বাড়িতে। এ কথা তুই বলতে পারলি আমাকে ?

সুপ্রিয় অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে মা-র ভাষা ও কণ্ঠস্বরে। সে কোনো কথা বলতে পারে না। নত মস্তকে দাঁড়িয়ে থাকে।

মা আবার বলে ওঠেন, "আমি তো কারও কোন ক্ষতি করি নি ঠাকুর! তাহলে তুমি আমার এ সর্বনাশ করলে কেন ? আর যদিই বা করলে, এর আগে আমাকে তোমার পায়ে ঠাঁই দিলে না কেন ?" তিনি কাঁদতে কাঁদতে গিয়ে নিজের ঘরে ঢুকলেন। সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

আর সুপ্রিয় ?

আশাহত সুপ্রিয় তখন অবসন্ন ?

শ্রান্ত ক্লান্ত বিষণ্ণ সুপ্রিয় বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে। বাইরে সন্ধ্যার অন্ধকার। আঁধারে ছেয়ে গেছে গারো পাহাড়। সেই সঙ্গে সুপ্রিয়র সারা জীবন।

পরদিন সকাল। খালাসী চা দিয়ে গেছে। সুপ্রিয় ঘরে বসে চা-য়ে চুমুক দিচ্ছে। আর ভাবছে। ভাবছে মা ও দাদার কথা, নিজের জীবন ও শেলীর ভালবাসার কথা, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা। কি ছিল, কি হল? যে দাদা ছিলেন তার শ্রেষ্ঠ বন্ধু, যে মা ছিলেন তার সব কাজের উৎসাহদাত্রী, সেই দাদা ও মা আজ পর হয়ে গেছেন। কারণ শেলী। সুপ্রিয় শেলীকে বিয়ে করতে চায়—শেলী খৃষ্টান, শেলী গারো। ভালোবাসার কি কোনো মূল্য নেই! এতদিন যাকে তাঁরা এতখানি ভালোবাসতেন, যে ছিল তাঁদের চোখের মণি, তাকে তাঁরা এভাবে দূরে সরিয়ে দিলেন! সংসার বড়ই স্বার্থপর।

স্বার্থপর, না স্বার্থপর বলা ঠিক হবে না। মা ও দাদার কোন স্বার্থ নেই। তাঁরা কিছুই আশা করেন না সুপ্রিয়র কাছ থেকে। তবু তাঁরা বাধার প্রাচীর গড়ে তুলেছেন। এর মূলে রয়েছে তাঁদের সংস্কার। তাঁরা কিছুতেই নিজেদের সংস্কারকে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত নন। তাঁদের বিশ্বাস শেলীকে বিয়ে করলে পারিবারিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে। শুধু তাই নয়, তাঁদের ধারণা শেলীকে বিয়ে করলে সুপ্রিয় সুখী হবে না—শেলী খৃষ্টান, শেলী গারো। যে সুখের জন্য সুপ্রিয় শেলীকে বিয়ে করতে চাইছে, সেই সুখের জন্যই মা ও দাদা শেলীকে ত্যাগ করতে বলছেন। আশ্চর্য এই সংসার।

ব্যস্ত হয়ে বৌদি ঘরে ঢোকে। তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নেয় সুপ্রিয়। বলে, "কি খবর, মেঘ না চাইতেই যে জল?" সুপ্রিয় একটু হাসে। কাল বিকেলের পর থেকে বৌদিও আর কথা বলে নি তার সঙ্গে। হয়তো বা সুযোগ পায় নি।

ব্যস্তভাবেই বৌদি বলে, "ঠাকুরপো, মা দরজা খুলছেন না।"

"সেকি?" সুপ্রিয় তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায়। তার মুখখানি মুহূর্তে ম্লান হয়ে যায়।

বৌদি তাড়াতাড়ি ভরসা দেয়, "না না, সে-সব কিছু নয়, মা ভাল আছেন। তবে দরজা খুলছেন না। বলছেন, দরজা খুলবেন না।"

যাক্ নিশ্চিন্ত, মা কথা বলছেন। সুপ্রিয় স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। সে আবার চেয়ারে বসে। চা-য়ে চুমুক দিয়ে শান্ত স্বরে বলে, "দাদাকে বলেছো?"

"হ্যাঁ।" বৌদি উত্তর দেয়। "সে কিছু করবে না।"

"তা আমাকে কি করতে বলছ?" সুপ্রিয় বিরক্ত।

কিন্তু বৌদি সে বিরক্তিতে বিচলিতা না হয়ে অনুনয় করে, তুমি একবার মা-র কাছে চল ঠাকুরপো, তাঁকে মুখ-হাত ধুয়ে চা খেতে বলো।"

"আমি বললেই মা দরজা খুলবে, চা খাবে, এমন ধারণা তোমার হল কেন? তাছাড়া সে যখন দরজা বন্ধ করে রেখেছে, আমি তাকে বলবই বা কেমন করে?"

"বারান্দার দিকে জানলাটা খোলা আছে। সেখানেই দাঁড়িয়েই তুমি তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারবে।"

"কিন্তু বলেই বা কি হবে?" সুপ্রিয় আবার বলে, "আমার ওপর রাগ করে যে দোর বন্ধ করেছে, সে কি আমার কথায় দরজা খুলবে বৌদি!" সুপ্রিয় হাসে। বড়ই করুণ হাসি।

বৌদি করুণ কণ্ঠে বলে, "চলই না একবার, আমার মনে হচ্ছে, তুমি বললে মা দরজা খুলবেন।"

"তোমার ঠিকই মনে হচ্ছে বৌদি", সুপ্রিয় একবার থামে। "কিন্তু যে-কথা বললে, মা দরজা খুলবে, সে-কথা তো আমি বলতে পারব না বৌদি!"

"সে-কথা তোমাকে আমি বলতে বলছি না ঠাকুরপো!" সে সুপ্রিয়র একখানি হাত ধরে বলে, "তবু তুমি আমার একটা কথা রাখো, একবার চলো। মা কিছু মুখে না দিলে, আমিও যে কিছু খেতে পারছি না। কাল রাতে মা খান নি, আমিও কাল থেকে কিছু খেতে পারি নি ঠাকুরপো!"

নিজেকে অপরাধী বলে মনে হয় সুপ্রিয়র। তার জন্যই বৌদি উপোস করে আছে। কিন্তু সে-ই বা কি করবে? সে-ও যে নিরুপায়।

বৌদির সঙ্গে সুপ্রিয় মায়ের ঘরের সামনে আসে। সে জানলার সামনে দাঁড়ায়। বৌদি সরে যায়। সুপ্রিয় ডাক দেয়, "মা, মা!"

সাড়া মেলে না।

সুপ্রিয় আবার ডাকে, "মা দরজা খোল।"

মা নীরব।

সুপ্রিয় দরজায় ধাক্কা দেয়।

মা কথা বলেন, "তোকে পেটে ধরে আমি কত পাপ করেছি, বলতে পারিস। তুই কি আমাকে শান্তিতে মরতেও দিবি নে?"

"তুমি কেন অবুঝ হচ্ছ মা?"

"অবুঝ আমি, না অবুঝ তুই? তুই যখন তোর জেদ রাখবি, তখন আমার ব্যবস্থাও আমি করছি। আমি আত্মঘাতী হবো।"

সুপ্রিয় চমকে ওঠে।

মা আবার বলেন, "আমি জলগ্রহণ করব না! আমি না-খেয়ে মরব।"

সুপ্রিয় যথাসাধ্য চেষ্টা করে। চেষ্টা বিফল হয়। মা দরজা খোলেন না। বাধ্য হয়ে সে রণে ভঙ্গ দেয়। তবে মা-র আচরণে সে খুব একটা বিচলিত হয় না। বরং সমস্ত ব্যাপারটাকে অত্যন্ত বিরক্তিকর বলে মনে হতে থাকে। আর থেকে থেকে মনে পড়ে বৌদির কথা। সে বেচারী নিরপেক্ষ হয়েও কাল থেকে না-খেয়ে আছে।

বৌদি রান্নাঘরে। সুপ্রিয়র অফিসের রান্না করছে। সে রান্নাঘরে আসে। বৌদি জিজ্ঞেস করে, "কোনো ফল হলো? মা দরজা খুলেছেন?"

"না, তোমার অনুমান মিথ্যে হল।"

"এখন উপায়?"

"উপায় আবার কি? তুমি কাপ দু'য়েক চা আর জলখাবার বানিয়ে ফেলো।"

"কেন?"

"আমি এখুনি বেরিয়ে যাবো, কখন ফিরে আসব ঠিক নেই।"

"ভাত খেয়ে বেরুবে না, রান্না তো প্রায় হয়ে এলো।"

"না, এখন ভাত খাবো না।"

সুপ্রিয় ঘরে আসে। দাদার ঘরের ভেতর দিয়ে আসতে হয়। দাদা নির্বিকার। একখানা বই পড়ছেন।

চা ও খাবার নিয়ে বৌদি ঘরে আসে। অফিসের পোশাক পরে প্রস্তুত হয়ে বসেছিল সুপ্রিয়। বৌদিকে বলে, "বসো।"

"কিছু বলবে?"

"হ্যাঁ। কিন্তু তার আগে তোমাকে কথা দিতে হবে, তুমি আমার অনুরোধ রাখবে! আমি তোমার অনুরোধ রেখেছি।"

বৌদি বুঝতে পারে সুপ্রিয় কি অনুরোধ করবে। সে বলে "কিন্তু মা যে কিছু খায় নি ঠাকুরপো।"

"তুমি না খেলে কি মা-র খাওয়া হবে বৌদি?"

বৌদি উত্তর দিতে পারে না।

সুপ্রিয় আবার বলে, "সবাই সমান অবুঝ হয়ো না। তাছাড়া তুমি যদি না খাও, আমিও না-খেয়ে বেরিয়ে যাবো। মা বাড়িতে রয়েছে, আমাকে সারাদিন পথে-প্রান্তরে ঘুরে বেড়াতে হবে।"

বৌদি বিপদে পড়ে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে সুপ্রিয়র অনুরোধ রাখতে হয়। বৌদিকে খাইয়ে সুপ্রিয় বেরিয়ে আসে কোয়ার্টার্স থেকে—কারাগার থেকে। সে মুক্তির আনন্দ অনুভব করে।

সুপ্রিয় অফিসে আসে। ভাল লাগে না। কাজে মন দিতে পারে না। বেরিয়ে আসে অফিস থেকে। হাঁটতে থাকে। কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে? কিছুই জানে না। তবু সে পথ চলে আর ভাবে—বড়ই দুর্গম এই জীবনের পথ।

* * *

কাজে অ-কাজে অফিসে ও পথে সারাদিন কাটিয়ে সন্ধ্যায় সুপ্রিয় কোয়ার্টার্সে ফিরে আসে। যা আশা করেছিল, তাই হয়েছে। মা দরজা খুলেছেন। সে খুশী হয়। তবু সে মা-র কাছে যায় না, নিজের ঘরে আসে।

"তুমি কি দুপুরে কিছু খেয়েছো?" বৌদি ঘরে ঢোকে।

"হ্যাঁ।" সুপ্রিয় মিথ্যে কথা বলে, "তোমরা?"

"তোমার দাদা খেয়েছে।"

"আমি তোমার কথা জিজ্ঞেস করছি।"

বৌদি চুপ করে থাকে।

সুপ্রিয় আবার বলে, "তাহলে যাও, আমার ঘরে তোমাব খাবার নিযে এসো।"

"এখন আর ও-সব হাঙ্গামা করো না। আমি কথা দিচ্ছি, রাতে তোমাদের সঙ্গে খাবো। আমি তোমার জলখাবার পাঠিযে দিচ্ছি।" একবার থামে বৌদি। তারপরে করুণ কণ্ঠে বলে, "তোমার দাদা অনেক বলার পরে মা দরজা খুলেছেন,কিন্তু বহু চেষ্টা করেও তাঁকে কিছু খাওয়াতে পারিনি—জল পর্যন্ত মুখে দেন নি। এমনিতেই কিছুদিন ধরে শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। ক'দিন আগেও জ্বরে ভুগে উঠেছেন। মা যে বড়ই দুর্বল হযে পড়েছেন ঠাকুরপো।"

"সবই বুঝতে পারছি বৌদি। কিন্তু আমিই বা কি করতে পারি বলো? যা সম্ভব নয়, তা কেমন করে করব?"

বৌদি আর কিছু বলতে পারে না। কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপরে ধীরে ধীরে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

ঘণ্টাখানেক বাদে সুপ্রিয় দাদার কাছে আসে। দাদা চুপচাপ বসে-

ছিলেন। সুপ্রিয়কে দেখে তিনি তার দিকে তাকান। নতমস্তকে দাঁড়িয়ে থাকে সুপ্রিয়।

দাদা জিজ্ঞেস করেন, "কিছু বলবি?"

"তুমি মাকে একটু বুঝিয়ে বলো না।"

"আমার যা বলার, বলেছি। মা মত বদলাবে না।" দাদা সঙ্গে সঙ্গে বলেন।

"তোমার চোখের সামনে, মা না-খেয়ে মারা যাবে।"

"তাই তো বলছে। তবে কেবল আমার একার নয়, তোরও চোখের সামনে। আর তা হবে তোরই জন্য।"

কি জবাব দেবে সুপ্রিয়? কেবল দাদার কাছে নয, সমস্ত জগৎ-সংসার তাকে এই একই কথা বলবে। সবাই এই দুর্ভাগ্যজনিত পরিস্থিতির জন্য তাকেই দায়ী করবে।

সুপ্রিয় নিঃশব্দে নিষ্ক্রান্ত হয় দাদার ঘর থেকে। নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়ে। ভাবে—মা সারাদিন না খেয়ে আছেন। রোজগার শুরু করার পরে মা এই প্রথম তার কাছে এসেছেন।

তাই ভাল—সুপ্রিয় ভাবে। সে নিজেও সারাদিন প্রায অভুক্ত। সে-ও কিছু খাবে না। সুপ্রিয় খাট থেকে নেমে আসে, দরজা বন্ধ করে দিতে চায়।

না। তার মনে পড়ে—সে না খেলে, বৌদিও কিছু খাবে না। দুপুরেও সে কিছু খায় নি। তার জন্য কেন কষ্ট পাবে বৌদি! সুপ্রিয় ফিরে এসে খাটে বসে। দরজা খোলাই থাকে।

পরদিনও অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় না। কি-ই বা পরিবর্তন হবে। তবে কালরাতে মা একা ছিলেন না। বৌদি তাঁর কাছে শুয়েছে। অনেক চেষ্টা করেছে সে। কিন্তু মা জলস্পর্শ করেন নি।

খাওয়া-দাওয়া সেবে সুপ্রিয় অফিসে আসে। ক'দিন থেকেই, মা আসার পর থেকেই, সে কাজে মন দিতে পারে নি। বেশ কিছু কাজ জমে গেছে। পারিবারিক অশান্তি কিংবা মানসিক অশান্তির জন্য কর্তব্যে অবহেলা করা ঠিক নয়। সে সরকারী অফিসার—জনসাধারণের সেবক।

তাছাড়া কাজ না করার জন্য তাকে আরও বেশি মনঃকষ্ট সইতে হচ্ছে। কাজের মাঝে ব্যস্ত থাকলে, হয়তো এই মানসিক অশান্তি তার কাছে কম কষ্টকর হবে। সুপ্রিয় কাজে মন দেয়।

অফিসে সাড়া পড়ে যায়। সবাই ব্যস্ত হয়ে ওঠে। এ ক'দিন অধঃস্তন কর্মচারীরা প্রায় বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করছিলেন! কি করবেন তাঁরা—ফাইল সাহেবের ঘরে। কাজের মানুষ বলে যে সুপ্রিয়র এত সুখ্যাতি, সেই কর্মপ্রিয় মানুষটি যে কেন কাজ করছেন না, তা কিন্তু তাঁদের অজানা নয়। এ নিয়ে ক'দিন তাঁদের আলোচনার অন্ত ছিল না। শেলীর সঙ্গে সুপ্রিয়র সম্পর্ক থেকে শুরু করে' মায়ের অনশন পর্যন্ত কোন ঘটনাই তাদের জানতে বাকি নেই।

তাই আজ ওরা বিস্মিত হয়—আনন্দিত হয়। তাহলে নিশ্চয় মা ও ছেলের মাঝে মিটমাট হয়ে গেছে। হোক্। বড ভাল মানুষ তাদের সাহেব। তিনি তাদের ভালবাসেন। ভালবাসেন গারো পাহাড়কে। উইলিয়ম মোমিনের মেয়ে শেলীকে তিনি ভালবাসেন। বড় ভাল মেয়ে শেলী। তাঁরা সবাই তাকে দেখেছেন। আগে তুরা যাওয়া-আসার পথে আর ইদানীং সুপ্রিয়র কোয়ার্টার্সে। কয়েকবার এসে সে থেকে গেছে সুপ্রিয়র কাছে। বেশ দেখায় দুজনকে—ভারী সুন্দর মানাবে। শেলীর সঙ্গে বিয়ে হলে, সাহেব আর চলে যাবেন না তাঁদের ছেড়ে। থেকে যাবেন এ দেশে। গারো পাহাডের ভাল করবেন। সাবাস শেলী, সাহেবের মতো মানুষের মন জয় করেছে।

সাহেবের মা বোধহয় রাজী হয়েছেন। নইলে সাহেব আজ কাজ করছেন কেন? ভাবতেও ভাল লাগছে ওদের। ওরাও কাজে মন দেন। সুপ্রিয়র ফরমাস তামিল করে।

কেটে যায় আরও একটা দিন। অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয় না।

অফিস থেকে ফিরে এলে বৌদি বলে, "মা বড়ই দুর্বল হয়ে পড়েছেন। যা হয় কিছু কর, নইলে একটা বিপর্যয় ঘটবে।"

সুপ্রিয় মা-র ঘরে আসে। তাঁর দুর্বল শরীরটা যেন বিছানায় মিশে আছে। তিনি চোখ বুজে আছেন।

সুপ্রিয় ডাকে, "মা।"

মা চোখ খোলেন। একবার তাকে দেখে নিয়ে চোখ বোজেন। তারপরে পাশ ফিরে শুয়ে, মুখটা ঘুরিয়ে নিলেন।

সুপ্রিয় বলে, "তাকে তুমি দেখ নি মা। সে বড় ভাল মেয়ে। আমি তাকে হিন্দু করে নেব।"

মা নির্বাক। তার নিথর দেহে যেন প্রাণ নেই।

সুপ্রিয় আবার বলে, "সে বড় ভাল, তাকে দেখলে তুমিও ভালোবাসবে।"

কিন্তু বৃথাই চেষ্টা, মা কথা বলেন না।

একদিকে জন্মদাত্রী জননী, অন্যদিকে প্রিয়তমা মানসী। মা মৃত্যুপথযাত্রী, তবু সুপ্রিয় তাঁর শর্ত মেনে নিতে পারে না।

রাতটা কেটে যায়। সকালে মা-র অবস্থা আরও খারাপ হয়ে পড়ে। সুপ্রিয় ডাক্তার সিং-কে ডেকে পাঠায়।

সেদিনকার সেই ঘটনার পরে ডাক্তার আর আসেন নি তার কাছে। হযতো অসন্তুষ্ট হযেছেন। কিন্তু তিনি যে শেলীকে অপমান করেছিলেন, তাই সেদিন সুপ্রিয় শান্ত থাকতে পারে নি। আজ তার মা মৃত্যুর মুখোমুখি। আজ যদি ডাক্তার তার চিঠি পেয়ে না আসেন, সুপ্রিযকে যেতে হবে তাঁর কাছে।

তার দরকার পড়ে না। ডাক্তার আসেন। কিন্তু এসেও কোন লাভ হয় না। মা তাঁকে পরীক্ষা করতে দেন না, পাশ ফিরেই শুযে থাকেন। মৃত্যুকেই তিনি চাইছেন, রোগমুক্তি তো তিনি চান না। ডাক্তারের ওষুধও তাই তিনি গলাধঃকরণ করেন না।

ডাক্তার সুপ্রিযকে বলেন, "ওষুধ পথ্য না খেলে, যে কোনো সময হার্টফেল করতে পারেন। যদি বলেন,আমি জোর করে খাওযাবার ব্যবস্থা করতে পারি।"

সুপ্রিয দাদার দিকে তাকায।

দাদা সম্মত হন না। বলেন, "তাতে কি লাভ হবে ডাক্তার, আজ জোর করে খাইযে বাঁচিযে রাখবেন, কাল গলায দড়ি দিযে মারা যাবে।"

সুপ্রিয কি মাতৃহন্তা হবে? কি করবে সে?

মা-র প্রাণ বাঁচানো তার কর্তব্য। কিন্তু শেলী—আর ভাবতে পারে না সুপ্রিয। সে নিজের ঘরে চলে আসে।

বৌদি ছুটে আসে, "ঠাকুরপো শীগ্‌গীর এস, মা কেমন করছেন।" কেঁদে ফেলে বৌদি, বলে, "ঠাকুরপো মাকে তুমি বাঁচাও। মা যে নিজের প্রাণের চেয়েও তোমাকে বেশি ভালবাসেন।"

"বৌদি," সুপ্রিয়র গলা ধরে আসে।

"ঠাকুরপো! নিজের সর্বস্ব ত্যাগ করেও আজ মা-কে তোমার বাঁচাতে হবে।" বৌদি আঁচলে চোখ মোছে।

"হ্যাঁ বৌদি, "আমি তাই করব। মা-র কথাই শুনব।" কেঁদে ফেলে মায়ের আদরের ছোটখোকা।

"তাহলে চল।" বৌদি সুপ্রিয়কে হাত ধরে নিয়ে চলে।

মায়ের পায়ে উপুড় হয়ে পড়ে সুপ্রিয়। কান্নায় ভেঙে পড়ে সে। তার অশ্রু-ধারায় মা-র পা ভেসে যায়। দীর্ঘদিনের দ্বৈত-মানসিক উত্তেজনায় সুপ্রিয়ও দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তাই আজ সে কেঁদে কেঁদে নিজেকে ভারমুক্ত করতে চাইছে।

"কে?" ক্ষীণকণ্ঠে মা বলেন। আজ তিনদিন মাত্র তিনি শয্যাশায়ী। কিন্তু রুগ্না বর্ষীয়সী মহিলা এতেই মৃত্যু পথযাত্রিণী।

"মা গো! তুমি আমাকে ক্ষমা কর।" উচ্চকণ্ঠে কেঁদে উঠে সুপ্রিয়।

"ছোটখোকা!"

"হ্যাঁ মা, আমি। আমি তোমার কথাই শুনব। তুমি ভাল হয়ে ওঠ।"

মা-র চোখের কোল বেয়েও নেমে আসে কয়েক ফোঁটা অশ্রু। দাদা বৌদি ও ডাক্তারের চোখ সজল হয়ে ওঠে।

দুর্বল শরীর তবু মৃদু হেসে মা বলেন, 'উঠে বোস।" বৌদিকে বলেন, "বৌমা! ওদের দু'ভাইকে খেতে দিযে তুমি কিছু মুখে দাও। আজ তো সারাদিন তোমাদের কিছু খাওয়া হয নি।"

"আগে আপনি এই ফলের রসটুকু খান। গ্লাসটা ধর ঠাকুরপো, আস্তে আস্তে মাকে খাইয়ে দাও।"

বৌদির হাত থেকে গ্লাসটা নিয়ে মা-কে খাওয়ায সুপ্রিয়।

তৃপ্তি সহকারে মা রসটুকু নিঃশেষ করেন।

সুপ্রিয় উঠে এসে গ্লাসটা বৌদিকে দেয।

ডাক্তার সিং তার একখানা হাত ধরে বলেন, "কনগ্রাচুলেশান ফর দি ভেরী ওয়াইজ অ্যাণ্ড টাইমলি ডিসিশান। ইউ হ্যাভ সেভড ইয়োর মাদার।"

ডাক্তার এগিয়ে যান মাকে দেখতে।

দাদা, বৌদিও মাকে নিয়েই ব্যস্ত।

সুপ্রিয় আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসে কোয়ার্টার থেকে। সে পথে নামে। গারো পাহাড়ের পথ। ক্লান্ত পায়ে পথ চলে।

সুপ্রিয় পৌছয় অফিসের সামনে। আজ রবিবার—স্যাবাথ ডে। ইহুদিরা বলেন, সপ্তাহের শেষ দিন। বিশ্বস্রষ্টা বিশ্রাম নিয়েছিলেন, তাই কর্মক্লান্ত মানুষ বিশ্রাম নিচ্ছে আজ।

খৃষ্টানরা বলেন, লর্ডস ডে। সপ্তাহের প্রথম দিন। আজকের দিনেই যীশু নবজন্ম লাভ করেছিলেন। তাই আজ খৃষ্টানদের কাছে উপাসনার পরম পবিত্র দিন।

শেলীও হয়তো এখন গীর্জায় উপাসনা করছে। পরমেশ্বরের কাছে সুপ্রিয়র

মঙ্গল কামনা করছে।

মঙ্গলই তো হয়েছে। তার মায়ের জীবনরক্ষা পেয়েছে।

কিন্তু সে যে শেলীর বিনিময়ে। প্রেমময়ীকে হারিয়ে স্নেহময়ীকে পেল সুপ্রিয়।

অজ্ঞাতে চোখ বেয়ে জল নামে। চোখ মুছে সে অফিসের তালা খোলে। কয়েকজন খালাসী বসে গল্প করছিল অফিসের সামনে। তারা সুপ্রিয়কে দেখে অবাক হয়।

ড্রয়ার থেকে কলম বার করে সুপ্রিয়। পদত্যাগ-পত্র লেখে একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারকে। অনুরোধ করে, তিনি যেন তার পদত্যাগ মঞ্জুর করে, পত্রপাঠ কাউকে এখানে পাঠিয়ে দেন। তিনি সুপ্রিয়র কাছ থেকে সব কাজ বুঝে নেবেন।

খাম বন্ধ করে একজন খালাসীকে ডেকে চিঠিটা দেয়। পাঁচটা টাকা তাকে দিয়ে বলে,"এখনই তুরা রওনা হয়ে যা। বড় সাহেবকে এই চিঠিটা দিয়ে আয়।"

"কিসের চিঠি স্যার?"

"পদত্যাগ-পত্র। আমি চাকরি ছেড়ে দিচ্ছি।"

"চাকরি ছেড়ে দিচ্ছেন! আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন?"

"হ্যাঁ।"

"কেন স্যার?"

"সে অনেক কারণ। তুই তাড়াতাড়ি রওনা হয়ে যা। আমার শরীর ভাল নয়, কথা বলতে ইচ্ছে করছে না!" সুপ্রিয় টেবিলের ওপর মাথা রেখে চোখ বোজে। দারুণ মানসিক উত্তেজনা ও উদ্বেগে সত্যই সুপ্রিয় অসুস্থ বোধ করতে থাকে। চোখ বুজে ভাবতে থাকে এ প্রবঞ্চনার কি জবাব দেবে সে শেলীর কাছে, নিজের কাছে, পরমেশ্বরের কাছে?

কথাটা কিছুক্ষণের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত গ্রামে। সুপ্রিয় কাজ ছেড়ে চলে যাচ্ছে দেশে। শেলীকে সে বিয়ে করছে না।

কেউ বলে, এ অন্যায়।

কেউ বলে, এ তো জানা কথা।

পথে-প্রান্তরে সর্বত্র এক আলোচনা।

ওরা ক্ষুব্ধ হয়।

ওরা অনুন্নত, ওরা অশিক্ষিত, ওরা দরিদ্র।

কিন্তু ওরা বিশ্বাসঘাতক নয়, ওরা প্রবঞ্চক নয়। ওরা বেইমান নয়।

*　　　*　　　*

তিনদিন বাদে একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার নিজেই এলেন। মা এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। যাবার আযোজন সমাপ্ত। সুপ্রিয অফিস থেকে ছাড়া পেলেই মা রওনা হবেন। এমন চাকরি মাথায থাক। অনেক পুণ্যে ম্লেচ্ছ মেযের কবল থেকে ছেলেকে উদ্ধাব করে নিযে চলেছেন।

ইঞ্জিনীযার কিন্তু অন্য কথা বললেন "বোস, তোমার এ চাকবি ছাডার প্রকৃত কারণ আমি জানি। কিন্তু ঐ মেযেটাকে বিযে না করলেই, তোমাকে চাকরি ছেড়ে দিতে হবে, এখান থেকে চলে যেতে হবে? ওরা কি করবে তোমার? তোমার পদমর্যাদা অনেক ওপরে। এমন ঘটনা তো হামেশাই ঘটছে। বেশ, তুমি যদি এখানে থাকতে না চাও, আমি তোমাকে অন্য কোথাও বদলী করে দিচ্ছি।" থামেন ইঞ্জিনীযার। কিন্তু সুপ্রিযকে নির্বাক দেখে, তিনি আবার বলতে শুরু করেন, "তোমার সেই পরিকল্পনা বিশেষ-ভাবে বিবেচিত হচ্ছে। মনে হয, সবকার তা গ্রহণ করবেন। আর তুমি চলে যাচ্ছ গারো পাহাড ছেড়ে। তাছাডা তোমার কাজ দেখে আমি খুশি হযেছি। তোমার পদোন্নতির সুপারিশ করেছি। অথচ হঠাৎ তুমি চাকরি ছেড়ে দিচ্ছ?"

সুপ্রিয চুপ করেই থাকে।

ইঞ্জিনীযার সাহেব আবার বলেন, "তাই বলছিলাম তুমি ছুটি নাও। আমি তোমার লম্বা ছুটি মঞ্জুর করছি। দেশে যাও। অন্য কোথাও যদি ভাল কাজ না পাও, তবে আবার ফিরে এস"

প্রস্তাবটা সুপ্রিযর পছন্দ হয। কিন্তু মুখে তা প্রকাশ করতে পারে না। কারণ মা বা দাদা রাজী হবেন না। তাঁরা চাইছেন সুপ্রিয চিরদিনের মত এ দেশ ছেড়ে চলে যায। তাই সে চুপ করে থাকে। আর তার মৌনতাকে সম্মতি ভেবে নিযে ইঞ্জিনীযার সাহেব সুপ্রিযর পদত্যাগ-পত্রখানি ছিঁড়ে ফেলেন।

দু'দিন লাগল কাজ বুঝিযে দিতে। কথাটা সুপ্রিয়র অনুরোধে অনুক্তই রয়ে গেছে। সবাই জানে পদত্যাগ-পত্র গৃহীত হযেছে। আর সুপ্রিয়ও জানে পদত্যাগ-পত্র ছিঁড়ে ফেলা আর লম্বা ছুটি মঞ্জুর করা একই কথা। সে আর

ফিরে আসছে না এখানে।

একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার তুরা রওনা হয়ে গেলেন। নতুন অফিসার আসতে দেরি হবে। ততদিন সিনিয়র ওভারসিয়ার কাজ চালাবেন। মনের অবস্থা যাই হোক, মুখে হাসি ফুটিয়ে কোয়ার্টার্সে ফিরল সে। দাদা ও মা বারান্দায় বসেছিলেন। তাঁরা তাকে ফিরতে দেখে উল্লসিত হয়ে উঠলেন।

মা বললেন, "তাহলে কাল সকালেই আমরা রওনা হচ্ছি তো?"

"হ্যাঁ মা। ঘোড়াওয়ালারা খুব সকালে এসে যাবে। গোছাবার যা কিছু আজ রাতেই সেরে নাও।"

ওপরের দিকে তাকিয়ে হাত জোড় করে চোখ বোজেন মা! আর প্রাণের ঠাকুরকে ধন্যবাদ জানান। এতদিনে তিনি মুখ তুলে তাকিয়েছেন।

হঠাৎ সুপ্রিয়র ঘুমটা ভেঙে যায়। বাইরে কোনো শব্দ, কারুর কথাবার্তা।

না, সবই মনের ভুল। এমনিই ঘুম ভেঙেছে তার। প্রেয়সীকে প্রবঞ্চনা করতে গিয়ে যে বেদনা তার মনে লেগেছে, স্বভাবতই তাতে তার মানসিক স্থৈর্য গেছে হারিয়ে। সুখে নিদ্রা যাওয়া তার পক্ষে কি সম্ভব!

রংগ্রামের শেষ রাত অতিবাহিত। বালিশের তলা থেকে ঘড়ি বার করে। পাঁচটা বাজে। সময় তো হয়ে এল। একটু বাদেই সূর্য উঠবে—সুপ্রিয়র জীবনে রংগ্রামের শেষ সূর্য।

শুয়ে শুয়ে ভাবতে থাকে বিগত দিনের কথা। কথা নয়, পাঁচালি—গারো পাহাড়ের পাঁচালি। তার যৌবনের গীতিকাব্য।

মনে পড়ে সেই প্রথম দিনের কথা। তুরা ডাকবাংলোর সেই রাত। এমনি সকালে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। কাঁচের জানালা দিয়ে উষার আলো এসে লুটিয়ে পড়েছিল ঘরে। আলো আর আঁধারের সেই অস্পষ্টতার মধ্যে সুপ্রিয় দেখেছিল শেলীকে। শান্ত সুন্দর শাশ্বতী মানবীকে। সে আকৃষ্ট হয়েছিল, তার মনে জেগেছিল অবারিত ভালোবাসা।

মিথ্যে কথা। সুপ্রিয় প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে।

কোনো মতে সামলে নেয় নিজেকে। ভাবে সেদিনকার সুপ্রিয়র সঙ্গে আজকের সুপ্রিয়র কত তফাৎ।

তবু সুপ্রিয় ভেবে চলে সেই কথা। পরদিন রাতের আঁধারে শেলী এসেছিল তার কাছে। ওর জীবনের আলো দিয়ে তার জীবনকে প্রেমোজ্জ্বল করতে।

শার উত্তপ্ত বুকে মুখ লুকিয়েছিল। তারপর সেদিন তুরা ডাকবাংলোর, তার এই ঘরে আর [illegible]পিরিতে—শেলী তার যৌবনের সব দাবি স্বেচ্ছায় মেনে নিয়েছে।

আর সুপ্রিয় ? সে তার সব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে, শেলীকে না জানিয়ে, চিরকালের মতো চলে যাচ্ছে এ দেশ ছেড়ে।...

'ইউ হ্যাভ এনজয়েড হার ? ত্যাটস নাথিং।' মনে পড়ে ডাক্তার সিং-য়ের উক্তি। সেদিন 'শাট আপ্' বলে চিৎকার করে উঠেছিল সুপ্রিয়। আর আজ ?

আর ভাবতে পারে না সুপ্রিয়। সে উঠে বসে। জানালাটা খুলে দেওয়া যাক। বাইরে ফর্সা হয়ে গেছে। দিনের আলো হয়তো তাকে মুক্ত করতে পারবে দুঃসহ এই মানসিক পীড়ন থেকে।

জানালা খুলতেই ওদের দেখতে পায় সুপ্রিয়। দু-একজন নয়, দশ-বিশ জনও নয়, শত শত মানুষ। গারো পাহাড়ের মানুষ দরিদ্র ও অশিক্ষিত মানুষ। পেছিয়ে পড়া দুর্বল মানুষ।

তবে এখন তারা দুর্বল নয়। সবার হাতে ঢাল বল্লম অথবা তীর-ধনুক। এভাবে এ-সময় ওরা তারই বাড়ির দিকে তাকিয়ে বসে আছে কেন ? আর সে জানালা খুলতেই কেন সবাই উঠে দাঁড়িয়েছে। ব্যাপার কি ? কি চায় ওরা ?

যারা তাকে দেখতে পেয়েছে তারা তো নমস্কার করছে না। অথচ ওরা সবাই তাকে চেনে। শ্রদ্ধা করে। ভক্তি করে। সুপ্রিয় ওদের অধিকাংশকে চিনতে পারছে। এমন কি তার কয়েকজন খালাসী পর্যন্ত আছে ওদের মাঝে। ওরা কি তাকে বিদায় জানাতে এসেছে ? কিন্তু বিদায় জানাবার জন্য তো ঢাল-বল্লম সঙ্গে আনার দরকার ছিল না। তাহলে এই সশস্ত্র সমাবেশের কারণ কি ? কিছুই বুঝতে পারে না সুপ্রিয়।

সে দরজা খুলে বারান্দায় বেরিয়ে আসে। দাদা মা এবং বৌদিও তাঁদের ঘর থেকে দেখেছেন ওদের। কিন্তু এতক্ষণ বের হতে সাহস পান নি। এবারে সুপ্রিয়র সাড়া পেয়ে তাঁরাও বেরিয়ে আসেন বারান্দায়। আর তাঁদের বের হতে দেখে ওরা সবাই একসঙ্গে উঠে দাঁড়ায়। বাড়ির চারদিকেই ওরা। যেন ঘেরাও করেছে। আর আশ্চর্য! ওদের পুরোভাগে রংগ্রামের নকমা, যে লোকটি তাকে এতো ভক্তি-শ্রদ্ধা করে।

নকমাকে কাছে ডাকে সুপ্রিয়। একা আসে না নকমা। দু'জন যুবককে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে আসে। সুপ্রিয় জিজ্ঞেস করে, "তোমরা এখানে কেন ? কি চাও ?"

"চাই আপনাকে!"

"মানে?"

"আমরা আপনাকে যেতে দেব না।" এ যেন সেই শান্ত শিষ্ট শ্রদ্ধাশীল নকমা নয়, অন্য কোনো মানুষ।

"কেন?"

"আমাদের দেশে এসে, আমাদের মেয়ের ইজ্জৎ নষ্ট করে চলে যাবেন। তা হবে না সাহেব। আমাদের প্রাণ থাকতে আপনি এখান থেকে যেতে পারবেন না।"

"এমন কথা আমার মুখের ওপর তুমি বলতে পারলে নকমা!"

"বেয়াদবি মাফ করবেন স্যার, আপনার ব্যবহারই আমাদের এ কাজ করতে বাধ্য করিয়েছে।"

"আশ্চর্য! এখানে আসার পর থেকে আমি তোমাদের জন্য কি না করেছি, আর আজ তোমরা আমাকে এভাবে ঘেরাও করলে! তোমরা এত অকৃতজ্ঞ!"

"না সাহেব, গারো পাহাড়ের মানুষ অকৃতজ্ঞ নয়। তাই আমরা আপনাকে এতদিন দেবতার মতো ভক্তি করেছি। কিন্তু যখন জানতে পারলাম, বিয়ে করা তো দূরের কথা, এমন কি শেলীমাকে না জানিয়ে, চোরের মতো পালিয়ে যাচ্ছেন, তখন আমাদের জ্ঞান হলো—বুঝতে পারলাম আপনি নরকের কীট।"

"নকমা · " সুপ্রিয় গর্জে ওঠে।

কিন্তু তাতে ভয় পায় না নকমা। সে উপেক্ষার হাসি হাসে। তার সঙ্গীরাও হেসে ওঠে। হাসির বন্যা দেখা দেয়। হেসে ওঠে গারো পাহাড়ের পেছিয়ে পড়া মানুষের দল— উপেক্ষার হাসি।

আভিজাত্যে আঘাত লাগে সুপ্রিয়র। সে জ্বলে ওঠে।

"কিন্তু তোমার তো অজানা নয় নকমা, আমার একটা রাইফেল আছে।"

"আপনিও তো জানেন হুজুর, রংগ্রামে হাজার মানুষের বাস। তাছাড়া রংরেনগিরি থেকেও ওরা এসে পড়বে।"

"তোমরা কি চাও?"

"শেলীমাকে বিয়ে করতে হবে আপনার।"

"শেলী বুঝি আমার চলে যাবার খবর পেয়ে, তোমাদের এইভাবে লেলিয়ে দিয়েছে?"

"খবর সে পেয়ে গেছে। কিন্তু সে আমাদের কিছুই বলে নি।

"তাহলে তোমরা এভাবে আমাকে ঘেরাও করলে কেন ?"

"সমাজের জন্য।"

"কিন্তু শেলী তো তোমাদের সমাজের কেউ নয়। সে খৃষ্টান, তোমরা সংসারী। ওরা তোমাদের ঘৃণা করে।"

"সে-সব আমাদের নিজেদের ব্যাপার সাহেব। আমরা সবাই গারো।"

আর কিছু বলে না সুপ্রিয়। মুখে নকমা যাই বলুক, শেলী নিশ্চয়ই তাদের নিযুক্ত করেছে, উত্তেজিত করেছে এ কাজে। নইলে যে-সব মানুষ তার ভয়ে সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকত, দূর থেকে দেখতে পেলে সেলাম করে পথ ছেড়ে দিত, তারাই আজ হাতিয়ার হাতে পথ আগলে দাঁড়িয়েছে। এ যে অবিশ্বাস্য। সবচেয়ে বিস্ময়কর শেলী ! সে এমন কাজ করল !

আর ভাবতে পারে না সুপ্রিয়। সে ভেতরে চলে আসে। দাদা বৌদি ও মা তার পেছনে ঘরে ঢোকেন। বৌদি দরজা বন্ধ করে দেয়।

দাদা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েন।

মা বলেন, "হায় ঠাকুর ! এই ছিল তোমার মনে ?

নিজের বাড়িতে বন্দী থাকতে হবে সুপ্রিয়কে। তুরাতে দূরের কথা সিং আর শ্রীবাস্তবকে পর্যন্ত একটা খবর দেবার উপায় নেই। যে খালাসীটা কাল রাত পর্যন্ত ওর বাড়িতে কাজ করেছে, তাকেও সুপ্রিয় দেখল ওদের মাঝে। ঘোড়াওয়ালারা পর্যন্ত যোগ দিয়েছে দলে। ওদের একতাবোধ বিস্ময়কর।

কিন্তু বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে বসে থাকলে তো চলবে না। রংরেনগিরি থেকে যারা আসছে, তারা তাকে ধরে নিয়ে যাবে। যেমন করে ধরে নিয়ে গিয়েছিল খালাসী যোগেশকে।

না, না। তা কিছুতেই হতে পারে না। সে রাইফেল নামাতে যায়।

মা ছুটে আসেন, বৌদি আঁতকে ওঠে, দাদা বাধা দেন।

সুপ্রিয় বলে, "এছাড়া যে আর কোন উপায় নেই দাদা। আমি ওদের জানি, জীবন থাকতে ওরা পথ ছেড়ে দেবে না।"

"তাই বলে খুন-খারাপি করবি ?"

"না হলে ওরা আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে তোমাদের কাছ থেকে। সে আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারব না।"

তবু দাদা তাকে বন্দুক বের করতে দেন না। বিভ্রান্ত ও অসহায় সুপ্রিয় বন্দী সিংহের মতো পায়চারি করতে থাকে। সময় বয়ে চলে কিন্তু সমস্যার কোনো সমাধান হয় না।

কে যেন দরজায় কড়া নাড়ছে। রংরেনগিরির মানুষরা কি এসে গেছে?

না, তারা নয়। কেউ তাকে নাম ধরে ডাকছে। নারী কণ্ঠ! কে? চমকে ওঠে সুপ্রিয়! সে তাড়াতাড়ি দরজা খোলে।

শেলী! দরজার চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে, সে হাঁপাচ্ছে। বোধহয় ছুটতে ছুটতে এসেছে। দু'জনে একবার চোখাচোখি হয়। তারপরে সুপ্রিয় চোখ নামিয়ে নেয়। তার সব কথা হারিয়ে যায়। কি বলবে সে?

বৌদি এগিয়ে আসে সামনে। বলে, "এসো ভাই, ভেতরে এসো।"

"না দিদি, তাতে আপনাদের আবার হাঙ্গামা হবে, আমি খৃষ্টান।" একবার থামে শেলী। তারপরে উৎকণ্ঠিত স্বরে সুপ্রিয়কে প্রশ্ন করে, "ওরা তোমাদের গায়ে হাত দেয় নি তো?"

"না।" সুপ্রিয় কোনমতে জবাব দেয়।

"যাক্। বাঁচলাম।" একটু ম্লান হাসে শেলী।

"তবে বলেছে ওরা আমাকে যেতে দেবে না। বলেছে তোমার গাঁয়ের মানুষরা আমাকে ধরে নিয়ে যাবে।" সুপ্রিয় অভিযোগ করে।

"বলেছে বুঝি," আবার হাসে শেলী, "ওরা অবুঝ। ভাবে মানুষটাকে ধরে নিয়ে যেতে পারলেই বুঝি তার মনটাকে পাওয়া যায়। তাই তো ওদের বোঝাতে অসুস্থ শরীরেও আমাকে আসতে হল ছুটে। আর তোমার কোনো ভয় নেই। আমি ওদের বলেছি, তোমার উপর আমার কোনো দাবি নেই। ওরা তোমাকে ছেড়ে দেবে। ঘোড়াওয়ালারা ঘোড়া আনতে চলে গেছে। ওরা এলেই তোমরা রওনা হও। আর দেরী করলে তুরা পৌঁছতে রাত হয়ে যাবে।" শেলী থামে। তার চোখ দু'টি ঝাপসা হয়ে এসেছিল। সে মুখ ঘুরিয়ে চোখ মুছে নেয়। প্রেয়সী চোখের জলে পিচ্ছিল করতে চায় না তার প্রিয়ের যাত্রাপথ।

সুপ্রিয় কিছুই বলতে পারে না। বলার তো কোনো মুখই নেই তার। সে কেবল শেলীর দিকে তাকিয়ে থাকে অপলকে। ভাবে এই ভারতীয় নারী বঞ্চনাতেও এদের মুখের হাসি মিলায় না, হৃদয়ের প্রেমরস শুকায় না।

শেলী আবার হেসে বলে, "আমাকে দেখছ কি? এবারে বেরিয়ে পড়, নইলে রাত হয়ে যাবে।"

দাদা বলেন, "হ্যাঁ, আর দেরি করা ঠিক নয়।"

তাঁর বোধহয় খেয়াল নেই যে এখনও প্রাতরাশ সারা হয় নি। কেউ তাঁকে সে-কথা মনে করিয়ে দিলেও হয়তো কোনো লাভ হতো না। এখান থেকে

পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর যে কোনো কাজ এ-সংসারে আছে, তা তিনি এখন ভুলে গেছেন।

দাদা কথা বললেও সুপ্রিয় সাড়া দেয় না। সে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে। দাঁড়িয়ে থাকে বৌদি। সে তাকিয়ে আছে শেলীর দিকে। মা-ও তাকেই দেখছেন। কি ভাবছেন কে জানে!

কেটে যায় কয়েকটি নীরব মুহূর্ত। তারপরে সহসা শেলী সে নীরবতার অবসান করে। বৌদিকে বলে, "দিদি!"

"কি বলছ ভাই?" স্নিগ্ধ স্বরে বৌদি উত্তর দেয়।

শেলী বাইরের দিকে তাকিয়ে বলে, ঐ যে ঘোড়াওয়ালারা এসে গেছে, আপনারা বেরিয়ে পড়ুন। দেরী করলে অসুবিধেয় পড়বেন।"

"মা।" বৌদি মার দিকে তাকায়।

"হ্যাঁ, বৌমা। চলো।" মা নিজের ঘরের দিকে পা বাড়ান।

"তুমি একবার এ ঘরে এসো।" বৌদি বলে।

"আমাকে বলছ?" সুপ্রিয় জিজ্ঞেস করে।

"না। তোমার দাদাকে।" বৌদি মা-র পেছনে ঘরে ঢোকে। দাদা তাদের অনুসরণ করেন। আর সুপ্রিয় নতমস্তকে সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে। এ যেন নিজের কোয়ার্টার নয়, আসামীর কাঠগড়া।

কি বলবে সুপ্রিয়? কি বলার আছে তার? শেলী তো সবই জানে। তবু সুপ্রিয় বলে, "তুমি বিশ্বাস করো, আমি অসহায় মা-র প্রাণ বাঁচাতে এ কাজ করতে হচ্ছে। তুমি আমাকে ক্ষমা করো।"

শেলী হাসে, শব্দহীন করুণ হাসি। সুপ্রিয়র দিকে একবার তাকায় সে। তারপরে চোখ নামিয়ে নিয়ে শান্তস্বরে বলে, "তুমি কেন ক্ষমা চাইছো, ক্ষমা তো চাইব আমি। আমারই ভুল হয়েছিল। আমি ভুলে গিয়েছিলাম, তুমি কেবল যুবক নও, তুমি মাতৃভক্ত সন্তান, তুমি আদর্শ ভাই।"

শেলী থামে কিন্তু সুপ্রিয় নীরব।

শেলী আবার বলে, "তুমি ঠিকই করেছো। আমার কথা ভেবো না। তোমার কাছ থেকে আমি যা পেয়েছি, তাই আমার যথেষ্ট। এও তো অনেকে পায় না। শুধু আশীর্বাদ করো, আমি যেন সেই সম্পদকে রক্ষা করতে পারি আর চিরদিন তোমাকে মনে রাখতে পারি।"

সুপ্রিয় কিছু বলতে পারার আগেই ঘোড়াওয়ালারা উঠে আসে বারান্দায়। অবিচলিত স্বরে শেলী তাদের বলে, "ভেতরে গিয়ে মালপত্র সব বুঝে নাও।

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়, সন্ধ্যের আগেই তুরা পৌছতে হবে।"

মা ও দাদা বেরিয়ে আসেন বাইরে। বৌদি সব বুঝিয়ে দেয় ঘোড়া-ওয়ালাদের। তারপরে মা-র সঙ্গে সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করে। দাদার সঙ্গে সুপ্রিয় নেমে আসে পথে। শেলী একপাশে দাঁড়িয়ে থাকে। কেউ কথা বলে না তার সঙ্গে। বোধহয় বলতে পারে না।

যারা এতক্ষণ তাদের ঘেরাও করে রেখেছিল, তারা এবার মাথা নত করে, নীরবে ঘেরাও তুলে নেয়। পথ ছেড়ে দেয় অশিক্ষিত মানুষ। শিক্ষিতরা মুক্তি পায়।

কিন্তু কিসের বিনিময়ে এই মুক্তি? সুপ্রিয় ভাবে। শেলীর করুণায়। যে শেলীর সঙ্গে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে সে। আজ শেলীকে তার রহস্যময়ী মনে হচ্ছে না? মনে হচ্ছে ত্যাগের মহিমাময়ী মূর্তি। ধৈর্যের প্রকৃত রূপ সে দেখতে পেল আজ। কিন্তু এই ত্যাগ ও ধৈর্যের বিনিময়ে শেলী-যে পেল শুধু সীমাহীন বঞ্চনা!

আশ্চর্য স্বার্থপর সুপ্রিয়, যার করুণায় সে আজ মুক্তি পেল, নির্দ্বিতায় তাকে বঞ্চিতা করে ঘরে ফিরে চলেছে সে। কিন্তু সুপ্রিয় যে নিরুপায়। সে শিক্ষিত, সে হিন্দু। তার সমাজ আছে, ধর্ম আছে। সর্বোপরি তার মা রয়েছেন। মা-র চেয়ে তো শেলীর স্থান উঁচুতে হওয়া উচিত নয়। তাই সে মায়ের সঙ্গে ফিরে যাচ্ছে।

"একটু দাঁড়াও। মিস্টার বোস……"

থমকে দাঁড়ায় ওরা। কে? শেলী? না, শেলী নয়। শেলীর বাবা ও মা। তাঁরাও তাহলে শেলীর পেছনে ছুটে এসেছেন। উইলিয়ম চিৎকার করছেন। তবে শেলী আসছে তাঁদের সঙ্গে। মায়ের হাত ধরে সে টলতে টলতে এগিয়ে আসছে। বলছিল অসুস্থ। কিসের অসুখ?

ওরা কাছে আসে। হাঁপাতে হাঁপাতে উইলিয়ম বলেন, "সেদিন জিজ্ঞেস করেছিলে, শেলীর ডাক্তারী পড়ার কি হলো, পাশ করেও কেন সে গৌহাটি যাচ্ছে না। কেন বাড়িতে বসে আছে?"

"হ্যাঁ' আপনি সে কথা জানান নি আমাকে।" সুপ্রিয় বলে।

"জানাই নি লজ্জায়। কিন্তু আজ যে আর না জানালে নয়। তুমি চির-কালের মতো চলে যাচ্ছ। যাবার আগে বলে যাও, শেলী তার কি পরিচয় দেবে?"

"কার ?" চিৎকার করে ওঠে সুপ্রিয়।

"তোমার সন্তানের।" একবার থামেন তিনি। তারপর কোনো মতে বলেন, "শেলী যে তোমার সন্তানের মা হতে চলেছে সুপ্রিয় !"

শেলীর দু'গাল বেয়ে নেমে এসেছে অশ্রু-ধারা।

"মা।" সুপ্রিয় চিৎকার করে ওঠে।

মা চুপ করে থাকেন !

সুপ্রিয় আবার বলে, "মা শেলী আমার সন্তানের জননী। জানতে চাইছে আমাদের সেই বংশধরের, সে কি পরিচয় দেবে জগতের কাছে ?"

স্থির ও অচঞ্চল নয়নে মা চেয়ে থাকেন শেলীর দিকে। শেলী মাথা নত করে। কেউ কোনো কথা বলে না। যারা এতক্ষণ পথ আগলে ছিল, তারাও দূর থেকে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে। কি বুঝছে ওরা, কে জানে! তবে ওরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছে না যে তারা ঘেরাও তুলে নিলেও আরেকজন ঘেরাও করেছে সুপ্রিয়র মা-কে।

মা-র যেন চমক ভাঙে। হাতের থলিটা বড়খোকার হাতে দিয়ে আস্তে আস্তে শেলীর কাছে এগিযে আসেন। তার একখানি হাত নিজের হাতে তুলে নেন।

শেলী আর নিজেকে সামলাতে পারে না। উচ্চৈস্বরে কেঁদে উঠে মা-র পায়ের কাছে বসে পড়ে। মা-র দু'চোখ হয়ে ওঠে অশ্রুসজল। দু'হাতে শেলীকে টেনে তোলার চেষ্টা করেন। পারেন না। তাঁর দুর্বলতা এখনও কাটে নি।

তাড়াতাড়ি বড়-বউ এগিয়ে আসে। সে শেলীকে টেনে তোলে।

মা বলেন, "পায়ে নয় মা, তোর স্থান আমার বুকে।" তিনি ওকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরেন।

মায়ের বুকে মুখ রাখে শেলী। এতদিনকার সঞ্চিত ক্ষোভ অশ্রু হয়ে ঝরতে থাকে।

মা-র চোখেও জল। বোধহয় আনন্দাশ্রু।

দাদা সুপ্রিয়র দিকে তাকান। নিজের সজল চোখ দু'টি মুছে একটু হেসে সুপ্রিয়র চোখ দুটিও মুছিয়ে দেন। বলেন, "চল, এভাবে দাঁড়িয়ে না থেকে যাওয়া যাক। শেলীর শরীর ভাল নয়।"

"কোথায় যাবো আমরা, তুরা ?"

"না, তোর কোয়ার্টারে।"

"আমরা কি ফিরে চলেছি ?"

"হ্যাঁ!" দাদার কথা কেড়ে নিয়ে হাসতে হাসতে বৌদি বলে, "আর যাচ্ছি শেলী ও তোমাদের ভাবী বংশধরকে সঙ্গে নিয়ে।" সে শেলীর মা ও বাবার দিকে তাকায়। তাঁরাও হাসেন।

অবশেষে শেলীকে নিয়ে সবাই ফিরে আসে ঘরে। কাল রাত থেকে যারা সুপ্রিয়কে ঘেরাও করে রেখেছিল, তারা আজ সসম্মানে পথ ছেড়ে দেয়। সুপ্রিয়র জয়ধ্বনিতে ভরিয়ে তোলে গারো পাহাড়ের আকাশ-বাতাস। ওরা কি বুঝতে পেরেছে, শেলী আজ ঘরনী হয়ে এসেছে সুপ্রিয়র ঘরে! বুঝতে পেরেছে, আর কখনও তাকে ঘেরাও করার প্রয়োজন হবে না।

সূর্যের সোনালী রোদ ছড়িয়ে পড়েছে গারো পাহাড়ের পথে ও প্রান্তরে। আনন্দের আলো ছড়িয়ে গেছে ঘরে ঘরে আর সবার অন্তরে।

—